সমর সেন

বার বৃত্তান্ত

বাবু বৃত্তান্ত

সমর সেন

দে' জ পা ব লি শি ং ॥ ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩

BABU BRITTANTO

(An autobiography and other writings of Samar Sen)

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮
প্রথম দে'জ সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৮১ : বৈশাখ ১৩৮৮
দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৮৮ : পৌষ ১৩৯৪
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৯১ : বৈশাখ ১৩৯৮

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

© সুলেখা সেন : 1988

দাম : ৩৫ টাকা
Rupees Thirty-five only

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রক : দিলীপ দে, দে প্রিন্টার্স, ১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৬

লেখকের নিবেদন

এই [দে'জ] সংস্করণে আরও দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে, 'বাবু বৃত্তান্তে' কিছুটা বেড়েছে। প্রবন্ধগুলি—'ইন্দিরা চরিত' বাদে সত্তর দশকের। পরিশিষ্টের প্রথম চারটি কবিতা একটি বান্ধবীর সঙ্গে বাজি রেখে লিখি ২৫-২৬ বছর আগে। সর্বশেষ কবিতাটি মৃণালিনী এমার্সনের অনুরোধে বা আদেশ ১৯৬১তে লেখা বেথুন কলেজের পত্রিকার জন্য।

'বাবু বৃত্তান্ত' লিখি ১৯৭৮ সালে। তারপর সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে অনেক কিছু ঘটেছে, সে-বিষয়ে লিখতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু পারিনি, তার কারণ শারীরিক ও মানসিক অবসাদ।

১৯৮৭ সমর সেন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এ-বছরের এপ্রিল থেকে শরীর খারাপ হওয়াতে প্রায়-গৃহবন্দী ছিলাম বেশ কিছুদিন। অলস মস্তিষ্ক লেখার কারখানা। 'বাবু বৃত্তান্ত' তখন শুরু করি। এটা প্রাথমিক খসড়া, ভেবেছিলাম কয়েকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ক'রে, পুরনো চিঠিপত্র ঘেঁটে প্রুফে আরও কিছু যোগ করবো। কিন্তু যুগপৎ অন্যান্য কাজের চাপ ও অনীহা, এবং কল্লোলিনী কলকাতা'র সন্ধ্যায় গর্তে প'ড়ে জখম-পা, ইত্যাদি কারণে হয়ে উঠলো না। সেজন্য কয়েকজনের নাম বৃত্তান্তে বাদ পড়েছে—যেমন 'নাও'-এর কয়েক সপ্তাহের জন্য সহকারী সম্পাদক পুসি সেন ও বিগত লোকেশ ঘটক (ঋত্বিকের ভাই), এবং যথাক্রমে শ্যামলেন্দু ব্যানার্জি ও নিত্যপ্রিয় ঘোষ। ভবিষ্যতে সংযোজনের সদিচ্ছা আছে। 'নাও' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এ নিয়মিতভাবে এককালে সম্পাদকীয় লিখেছেন নিরঞ্জন মজুমদার, শঙ্কর ঘোষ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, অশোক মিত্র (অর্থনীতিবিদ) ইত্যাদিরা।

প্রবন্ধগুলি সত্তর দশকে বেরোয় 'এক্ষণ', 'বুদ্ধিজীবী ও 'নানা প্রশ্ন' সঙ্কলন, 'প্রস্তুতিপর্ব', 'আগামীকাল', 'দর্পণ, এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়।

সমর সেন

২৪. ৯. ১৯৭৮

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

দে'জ তৃতীয় সংস্করণ সম্পর্কে বিশদভাবে আমার বক্তব্য 'সংযোজন' অংশে বলেছি। সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তি করলাম না। 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার সৌজন্যে কয়েকটি নতুন আলোকচিত্র মুদ্রিত হ'ল।

এপ্রিল, ১৯৯১ সুধাংশুশেখর দে

প্রকাশকের নিবেদন

দে'জ পার্বলিশিং তথা আমার পক্ষে নতুন সংস্করণ 'বাবু বৃত্তান্তে'র জন্য সমর সেনের সঙ্গে সুবীর ভট্টাচার্যের আলোচনাকালে কিছু সংশোধন বা পরিমার্জনা করবার কথা হয়েছিল। কথা ছিলো—প্রকাশনীর তরফে সুবীর ভট্টাচার্য প্রাথমিক সূত্রগুলি প্রুফ-এ তৃতীয় বন্ধনীতে দিলে তিনি তাঁর মন্তব্য বা বক্তব্য প্রুফেই লিখে দেবেন। লেখকের আকস্মিক প্রয়াণে তা' সম্ভবপর হলো না। ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য [ ]-তৃতীয় বন্ধনীতে প্রকাশকের পক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুন কিছু আলোকচিত্রও মুদ্রিত হলো এই সংস্করণে, শ্রীমোনা চৌধুরী ও সুবীর ভট্টাচার্যের সৌজন্যে।

'সংযোজনে' সমর সেনের বাবু বৃত্তান্ত' কবিতাটি মুদ্রিত হলো।

জানুয়ারী, ১৯৮৮ সুধাংশুশেখর দে

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

সূচি

১. বাবু বৃত্তান্ত ... ৯
২. চন্দ্রবিন্দু বাদে ৭৩
৩. বন্দে মাতরম্ ... ৭৫
৪. ট্র্যাম থেকে থানায় ... ৭৮
৫. 'প্রস্তুতি পর্ব' ... ৮২
৬. নির্বাচন মার্চ, ১৯৭৭ ... ৮৪
৭. জরুরী অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ... ৮৭
৮. শত্রুমিত্র ... ৮৯
৯. দেখা ছবি ... ৯১
১০. ইন্দিরা চরিত ... ৯৪
১১. উড়ো খৈ ... ৯৯

পরিশিষ্ট

উড়ো খৈ ১২৭
স্মৃতিতে ... ১২৮

সংযোজন

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা প্রসঙ্গে
১. ক্রন্দসী ... ১৩১
২. উত্তর ফাল্গুনী ... ১৩২
৩. মস্কোর জীবন ... ১৩৫
৪. In Defence of the 'Decadents' ১৪২
৫ অতি আধুনিক ব্যংলা কবিতা
সরোজকুমার দত্ত ১৩৬
৬. অতি আধুনিক বাংলা কবিতা
সমর সেন ... ১৫১
৭. সরোজকুমার দত্তর প্রত্যুত্তর ... ১৫৫
৮. বাবু বৃত্তান্ত ... ১৬৪

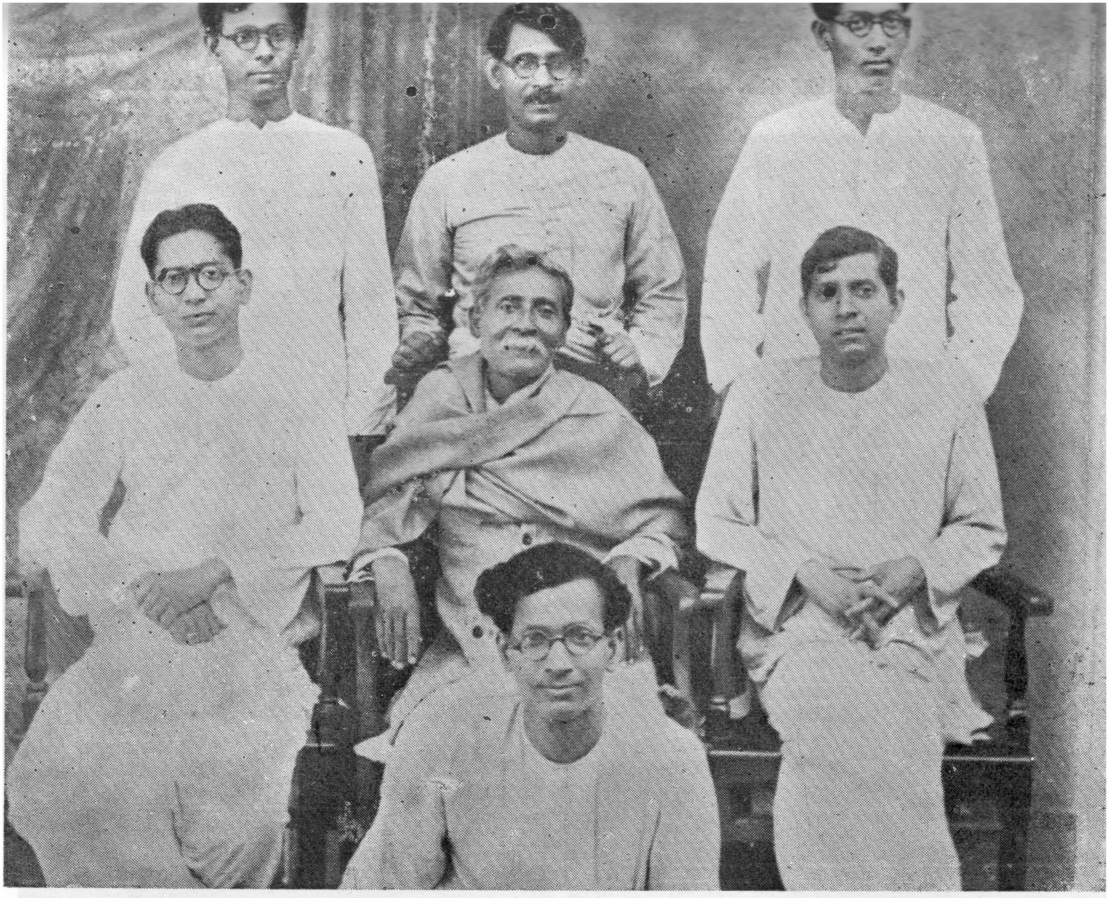

বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে : শ্রীচন্দ্র, কিরণচন্দ্র, সুধীন্দ্রচন্দ্র।

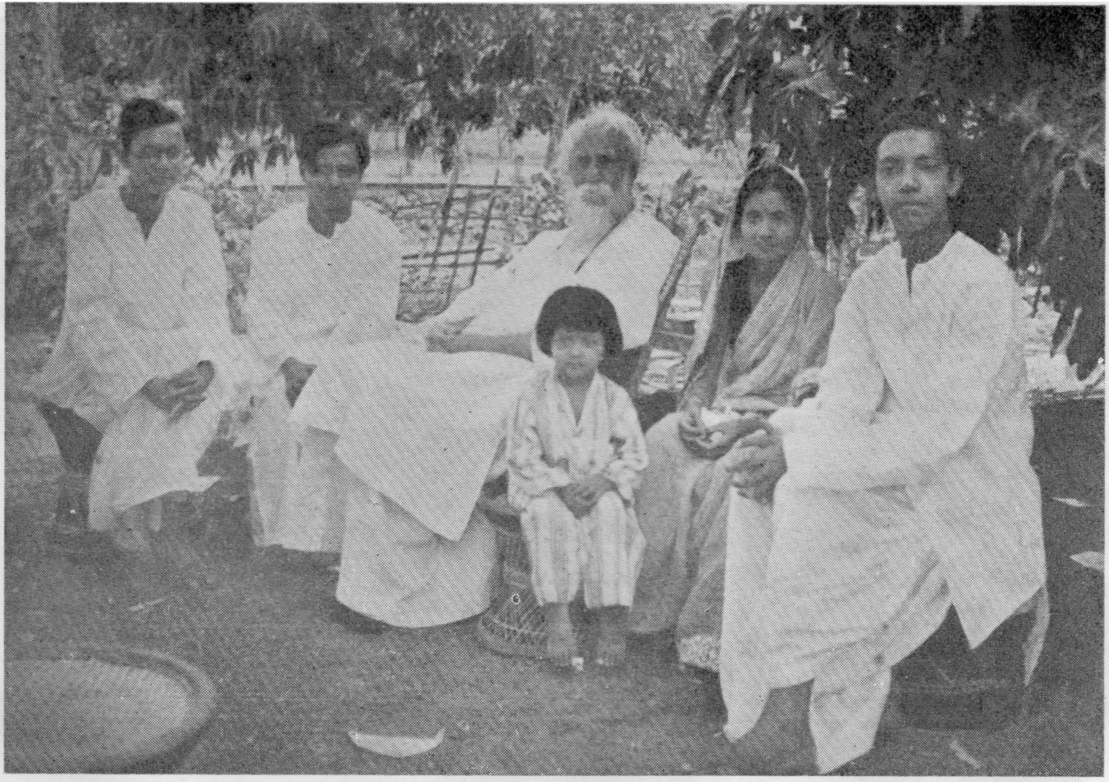

বাঁ দিক থেকে সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ, প্রতিভা বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং মিমি (মীনাক্ষী)।

সুলেখা সেন, লেখক ও সবশেষে স্নেহাংশু আচার্য।

কৃষ্ণসাগর উপকূলের একটি শহরে—১৯৫৮। ছবিতে কামাক্ষীপ্রসাদ ও লেখক সপরিবারে আছে

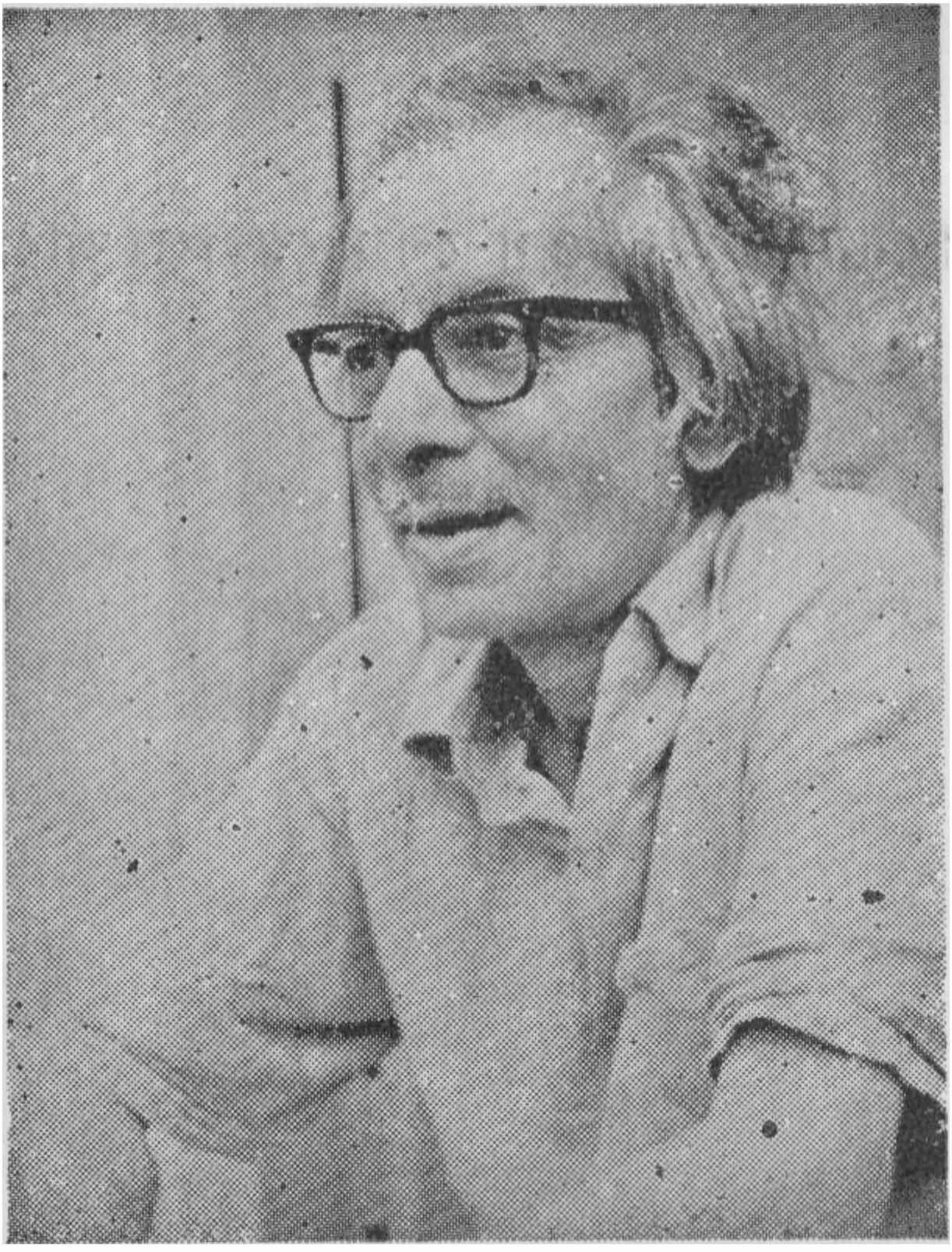

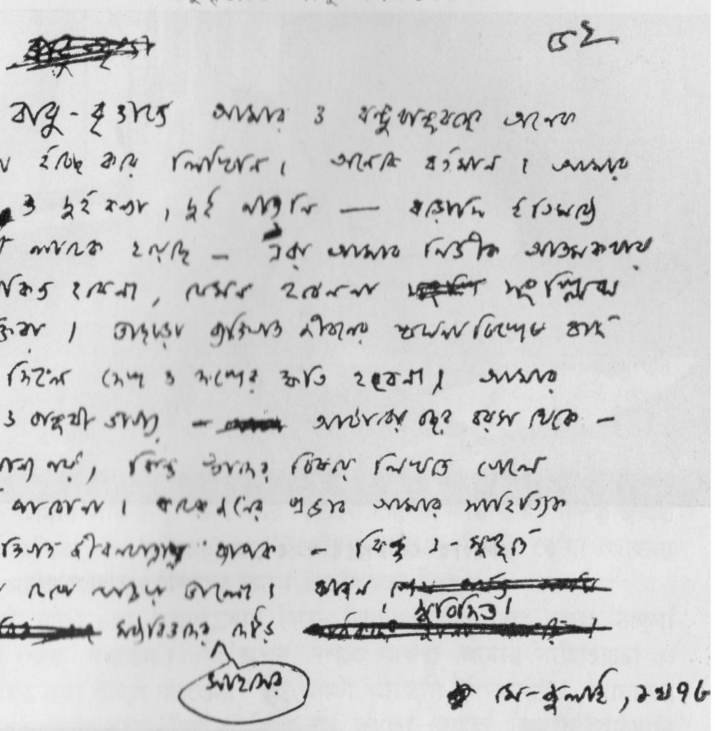

সৌজন্য : সুধীর ভট্টাচার্য

মস্কোতে : কামাক্ষীপ্রসাদ, রেখা, সমর, সেন, সুলেখা সেন, শুভময় ঘোষ, সুপ্রিয়া ঘোষ ও জনৈক রুশ বন্ধু।

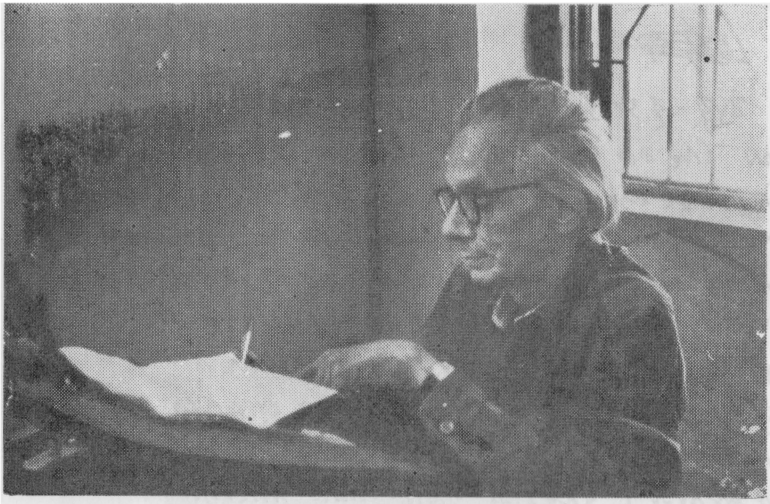

ফ্রন্টিয়ার-এর দপ্তরে সমর সেন

ছবি : মোনা চৌধুরী

মস্কো : রাস্তায় কোন একটি উৎসবের দিনে
কামাক্ষীপ্রসাদ, রেখা ও শুভময় ঘোষ একেবারে ডানদিকে।

ঠাকুর্দা দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসেন গত শতাব্দীর শেষ দিকে। তাঁর স্বচ্ছ আত্মজীবনী আছে 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত অনুরাগ ও গবেষণায় অসাধারণ (অনেক সময় পাগলাটে) পরিশ্রমের কথা, তাঁর পথিকৃতের ভূমিকা বিস্মৃতির অতলে প্রায় তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর তথ্যগত ভুলভ্রান্তি পণ্ডিতেরা খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, কিন্তু তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগের ছিটেফোঁটা এঁদের থাকলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হতো। সসংকোচে স্বীকার করি, যৌবনে দীনেশচন্দ্র সম্বন্ধে আমার নাক উঁচু ভাব তাঁর কাছেও গোপন করিনি। কিন্তু উদ্ধত যৌবনে 'কবিতা' ও 'পরিচয়'-এর ইয়েট্‌স্‌-পাউণ্ড-এলিয়ট ঘেঁষা আড্ডার প্রভাবে আরো অনেকের সম্বন্ধে সমান উন্নাসিকতা ছিল।

একটু বেশি রকম পড়াশুনোর দিকে আমার ঝোঁক ছিল বলে ঠাকুর্দা আমাকে স্নেহ করতেন। তিরিশের দশকে অবশ্য আমার সাহিত্যচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা উঠলে বলতেন, "তুই একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান"। আমাদের আলাপআলোচনা সরস ছিল। বি.এ.-তে ভালো করলে বিলেত পাঠাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়ে দেওয়াতে বললেন যে অর্ধেক খরচ দেবেন, বাকিটা বিয়ে করে যোগাড় করতে। বললাম—"দাদু, পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে বিলেত যাব না।" উনি অট্টহাসি হেসেছিলেন।

শৈশবের প্রথম স্মৃতি বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনের একান্নবর্তী পরিবার —'বিশ্বকোষ' রচয়িতা প্রখ্যাত নগেন বসুর বাড়ির লাগোয়া তিনতলা বাড়ি। জন্ম ১৯[illegible] সালে। আমার বাবা অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ এবং অন্য একটি কলেজে পড়িয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। বাবার চেয়ে মা মাত্র দু বছরের ছোট ছিলেন. পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে, নাগপুরে চার বোন (কোন ভাই ছিলনা) অনেক দিন ছিলেন। দাদামশাইকে দেখিনি। তিন মাসির বিয়ে হয় পূর্ববঙ্গীয় পরিবারে। বিয়ের সময় বাবার বয়স ১৮, মা'র ১৬। মা'র দাদামশাই ছিলেন জগদীশনাথ রায়, যাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উৎসর্গ করেন। [উৎসর্গ পত্রের উদ্ধৃতি "কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায় সুহৃদরকে এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।"] দীনেশচন্দ্রের পূর্বপুরুষের একজন বোধহয় তান্ত্রিক কারণ বারি সেবন করতেন (শ্মশানে সাধনার সময় শবের 'চপেটাঘাতে' মারা যান),

কিন্তু সেটাকে পানদোষ বলা চলে না। আমার স্বভাবের কিছুটা খুব সম্ভব মা'র দাদামশায়ের ধারা থেকে আসে।

বাবা আদি শান্তিনিকেতনের ছাত্র (দাদাও—অমল সেন—কিছুদিন পড়েছিলেন ওখানে)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মা-বাবার ঘনিষ্ঠতা, পত্রালাপ অনেকদিন ছিল। কিন্তু শ্রীনিকেতনের কোন ব্যাপার নিয়ে শুনেছি বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতভেদ হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ পুত্রের পক্ষ নেন, ফলে বাবা বিশেষ সম্পর্ক রাখেন নি। শুনতাম বিশ্বভারতীর আর একটা নাম বিশ্ব-বা-রথী। রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠিপত্র, স্বাক্ষরিত বই, দু-একটা পাণ্ডুলিপি মা'র মৃত্যুর পর বাবা একে-ওকে দিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ একবার দুপুরের নিমন্ত্রণে এসেছিলেন বিশ্বকোষ লেনে। ঘরদোর সাফ করার ভার ছিল ছোটদের ওপর। সকাল থেকে বালতি-বালতি জল খরচ হয়। কবি এসে ষোড়শ ব্যঞ্জনের কয়েকটা মাত্র স্পর্শ করলেন—তখনো মনে হয়েছিল আমরা বাঙালিরা কতো অপচয় করি। আহারের পর চীনফেরৎ কবিকে দীনেশচন্দ্র কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—"চীনেরা না কি আরশোলা খায়?" কবি বিরক্ত হয়ে বলেন, "Dineshbabu, you lack a sense of perspective"। মন্তব্যটি ছোটকাকার কাছে শোনা।

ছোটবেলায় দু'একবার জোড়াসাঁকোয় গিয়েছি। তখন চেহারাটা গোলগাল ফর্সা ছিল বলে সবাই আমাকে আদর করতেন। কবি কখনো না। জোড়াসাঁকোয় শেষবার যাই বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে। ছোট একটা ঘরে বসে ধূমপান করছি, অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় আবির্ভাব, সিগারেট নিয়ে মহামুস্কিলে পড়েছিলাম। শিশির ভাদুড়ীর 'তপতী' বুদ্ধদেববাবুর ভালো লাগেনি শুনে মৃদু হেসে রবীন্দ্রনাথ বললেন বোধহয় শিশির সেদিন একটু 'বিচলিত ছিল'।

ঠাকুর্দার বাড়িতে এক-একটি ঘরে এক-একটি পুত্র সপরিবারে থাকতেন। সব ছেলের তখনো বিয়ে হয়নি। আঁতুর ঘর একটা ছিল—খালি থাকতো কদাচিৎ। ছোটকাকা অনেক পরে বিয়ে করে পরিবার পরিকল্পনায় ছিলেন অগ্রগামী—দুই ছেলে, এক মেয়ে। এ-বিষয়ে আমরা সহোদররাও—একজন ব্যতিরেকে—ইন্দিরা-সঞ্জয়ের সার্টিফিকেট যোগ্য।

ছয় ছেলে পাঁচ মেয়ের মধ্যে তৃতীয়পুত্রের (বিনয়চন্দ্র সেন) প্রতি ঠাকুর্দার পক্ষপাত আমাদের নজর এড়ায়নি। সেজকাকা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন—এম.এ, পি.আর.এস., পি-এইচ.ডি. (লন্ডন) ইত্যাদি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। ছোটকাকা (শ্রীচন্দ্র সেন) ইংরেজির ছাত্র ও অধ্যাপক। সপরিবারে কেমব্রিজ যান ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর, বেহালার বাগানবাড়ির একটা অংশ বেচে। জ্যেঠামশাই (কিরণচন্দ্র সেন) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগে ছিলেন, ন-কাকা (বিনোদচন্দ্র সেন) কাস্টমস্-এ এবং রাঙাকাকা (সুধীরচন্দ্র সেন) ম্যাকমিলান-এ। সবচেয়ে হিসেবী ছিলেন জ্যেঠামশাই, সবচেয়ে বেহিসেবী রাঙাকাকা।

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি মারা যান। ছেলেদের ডাকনাম বিচিত্র রেখেছিলেন ঠাকুর্দা—যেমন ছোট্‌কা, নশু, টিটিঙ্গি, লিয়াকাত, জিকি।

জেঠা-কাকাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গুরুগম্ভীর ছিলনা, হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি চলতো। বারবার ছেলের আশায় একটির পর একটি মেয়ে হবার ব্যাপার তোলাতে এক কাকা বলেন, 'ওটা ভগবানের হাত'। আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ভগবানের হাত এতো ছোট?'

ত্রিপুরার নবীন মহারাজ [রাধাকিশোর মাণিক্য] কানে হীরের কুণ্ডল লাগিয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডের বাড়িতে এলে ঠাকুর্দা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। মহারাজার প্রস্থানের পর আমি বিস্ময় ও উষ্মা প্রকাশ করতে শুনলাম যে ঠাকুর্দার চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও বিখ্যাত দু-একজন ব্যক্তিও মহারাজার পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করেন—ওটাই রেওয়াজ ছিল। ত্রিপুরার মহারাজা দীনেশচন্দ্রকে ১০,০০০ টাকা দেন 'বৃহৎ বঙ্গ' প্রকাশের জন্য। বিনিময়ে ঠাকুর্দা তাঁদের প্রাচীন পুঁথিপত্র, কাঁথা ইত্যাদির সংগ্রহ থেকে বেশ কিছু দিয়েছিলেন।

বীণা দাস গভর্নরের প্রতি যে গুলি ছোঁড়েন (হত্যা করার উদ্দেশ্যে নয়) সেটা ঠাকুরদার কান ঘেঁষে যাওয়াতে তিনি অতিশয় সন্ত্রস্ত হন, কিন্তু বীণা দাসের প্রতি রায়বাহাদুরের একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য করি।

বাগবাজারে ঠাকুর্দা লেখাপড়া করতেন একতলার একটি ছোট ঘরে মেঝেতে বসে। চেয়ার টেবিলের বালাই কখনো ছিল না। অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি আসতেন। মাঝে মাঝে মেধাবী ছাত্রদের আশ্রয় দিতেন ঠাকুরদা। কীর্তনে ঝোঁক ছিল। গৌরদাস বাবাজী আসর জমাতেন উঠোনে। কীর্তনে বিশেষ মোহ হয়নি শৈশবে। আবেগপ্রধান পুনরাবৃত্তিতে কেন জানিনা বিদ্রুপের একটা ভাব জেগে উঠত।

ঠাকুর্দা বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু আমাদের ও-ভাষা ব্যবহার বাবা-মা'র বারণ ছিল।

ঠাকুমাকে দেখলে ঠাকুর্দা কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকতেন, বাক্যালাপ বন্ধ ছিল বহু বছর।

সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুর্দা থাকতেন খোশমেজাজে, আফিম সেবনের গুণে। ডায়াবিটিস্ ছিল, কিন্তু ডাক্তারি নিষেধের তোয়াক্কা করতেন না, মিষ্টি খেতেন খুব, মায় কাঁচা চিনি পর্যন্ত। ঠাকুর্দা নাকি ২২ বছর স্নান করেননি। সর্দিগর্মি'তে অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন শুনে বাগানবাড়ির পুকুরে এসে একবার সাঁতার কাটেন। পুকুরটির সঙ্গে অবশ্য ইয়াংসে নদীর তুলনা হয় না। [illegible]-এ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়াতে বিধানচন্দ্র রায়কে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি প্রথমেই তাঁর 'ফি'র উল্লেখ করাতে বাড়ির লোক বিরক্ত হয়ে নীলরতন সরকারকে ডাকেন। নীলরতনবাবু অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, কিছু করার নেই। 'ফি' দিতে গেলে নেন নি—দীনেশচন্দ্রের নাম তাঁর অজানা ছিলনা। সে-সময় আমি কলকাতায় ছিলাম না।

একান্নবর্তী পরিবারে নানা কাণ্ড ঘটে। বাড়ির বাইরে ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা তখন অভাবনীয় ছিল বলে পরিবারের গণ্ডির মধ্যে কিছুটা আদি-রসাত্মক সম্পর্ক গড়ে উঠতো, গুরুজনদের 'অজ্ঞাতসারে'। মা আমাদের কড়া শাসনে রাখতেন। পূর্ববঙ্গীয় সেন পরিবারে চায়ের প্রবর্তন তিনি করেন বটে কিন্তু বড়োদের সঙ্গে লুকিয়ে বিড়ি খেয়ে ধরা পড়ে তাঁর কাছে হাতপাখার আঘাত খেয়েছি অনেকবার। বাবা গায়ে পড়ে শাসন করতেন না। চরম শাস্তি ছিল কাপড়চোপড় খুলে নেওয়া। দ্বিপদের বস্ত্র-হরণ হ'লে খাটের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকতো না।

নগেন বসুর রকে সকাল-বিকেলে উঠতি-বয়সীদের ভিড় জমতো। আমিও বসতাম। কলতলায় দিনে-ঝি রাতে-বারবধূদের জমায়েত হতো। অনেকের চেহারা ও স্বাস্থ্য খাসা ছিল, রসালাপে কলতলা মুখর হয়ে উঠত। কলকাতার রকে যুবা-সমাবেশের কারণ সে-বয়সে ঠিক ধরতে পারিনি।

বাড়ির দু'একটা রসালো 'গোপন' কথা মা'কে জানিয়ে মার খেতাম, 'ওদের' সঙ্গে মিশি ব'লে। ক্রমশ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন এবং খুব সম্ভব সেজন্য বাবা-মা দীনেশচন্দ্রের যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যান। ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, বাড়ি বদলানো হয় অনেকবার। দু-তিনটি বাড়ি বদলের পর বিশ্বকোষ লেনের একটি চারতলা বাড়িতে থাকি বেশ কিছুদিন।

নভেম্বর ১৯২৮-এ মা মারা যান সূতিকা রোগে, ৩৪ বা ৩৬ বছর বয়সে। তিন তলার ঘরে মশারির নিচে ঘুমোচ্ছি, বেশ রাতে আমাদের দোতলার ঘরে ডাকা হ'ল। মা'র তখন নাভিশ্বাস, কথাবার্তা বন্ধ, এক-একবার চোখ মেলে ছেলেমেয়েদের দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। বিছানায় শুয়ে প্রার্থনা করলাম—'ভগবান, তুমি থাকলে মা বেঁচে যাবেন।' ভোরবেলায় মা মারা গেলেন। ভগবান নিয়ে অতঃপর মাথা ঘামাই নি। জীবনে একবার নেড়া হলাম।

বাবা-মা'র দাম্পত্য জীবন শেষের দিকে খুব সম্ভব সুমধুর ছিলনা। ক্রমাগত রোগে ভুগে মা'র মেজাজ হয়ে গিয়েছিল খিটখিটে, আমাদের ধমকাতেন কারণে-অকারণে, সংসারে কেমন যেন তিতি-বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বামুন ঠাকুর থাকা সত্ত্বেও রান্না করতেন নিজে, একেবারে শয্যাশায়ী না হ'লে। উনুনের সামনে বসে থাকতেন মাথায় হাত দিয়ে—অসহ্য মাথা ব্যথা, তবু রান্না করা চাই। মা'র মৃত্যুকালে ভাইবোনে মিলিয়ে আমরা ন-জন, ছ-ভাই, তিন বোন। আমি তৃতীয় সন্তান, আমার উপরে দু ভাই। মা'র মৃত্যুকালে সবচেয়ে ছোট বোন ছিল তিন মাসের।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত আড্ডাপ্রিয় ও বন্ধুবৎসল। মা'র মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে এবং পরে তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল শিশির ভাদুড়ীর ওখানে। বাড়ি ফিরতেন অনেক রাত্রে। পানদোষ ছিল না। গভীর রাত পর্যন্ত নেবুবাগানের

দোতলার বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় মা'র সঙ্গে বসে থাকতাম বাবার প্রতীক্ষায়। মা গুনগুন করে রবিঠাকুরের গান গাইতেন—'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে' ইত্যাদি। রাত ক'রে ফেরার জন্য কিন্তু বাবা-মা'র ঝগড়া হতে দেখিনি। শিশির ভাদুড়ীর অনেক নাটক বিনা পয়সায় আমরা তখন এবং পরে দেখেছি। শিশিরবাবুকে আমরা অসম্ভব শ্রদ্ধা করতাম। থিয়েটারে গিয়ে বাবার নাম করলে পয়সা লাগত না। কিছু আপত্তি উঠলে সোজা সাজঘরে শিশিরবাবুকে খবর পাঠাতাম।

ছেলেবেলায় স্মরণশক্তি প্রখর ছিল। বাংলা বা ইংরেজি কবিতা দু'একবার শুনে মুখস্থ হয়ে যেতো। ঠাকুর্দা অভ্যাগতদের সামনে আবৃত্তি করাতেন। (পরে নিজের কবিতা কিন্তু প্রকাশ্যে দু'একবারের বেশি আবৃত্তি করিনি)। 'হাতে-খড়ি' হয় আট বছর বয়সে। সেজমাসিমার বাড়ি গিয়ে দেখি আমার চেয়ে এক বছরের ছোট মাসতুতো বোন পড়াশুনো দিব্যি শিখেছে। পৌরুষে আঘাত লাগলো, বাড়ি ফিরে মা'কে বলে অ-আ-ক-খ, এ-বি-সি-ডি শুরু করি। দেরিতে আরম্ভ করাতে চটপট এগিয়ে যাই, দু-তিন বছরের মধ্যে সন্ধেবেলায় মা গা ধুতে গেল খাটের নিচে টর্চ জ্বালিয়ে অনেক নিষিদ্ধ বই পড়ে ফেলি। তার আগে গীতার শ্লোক শুনে মুখস্থ করতে পারলে কয়েকটি শ্লোক পিছু মা'র কাছে পয়সা পেতাম, যেমন পেতাম তাঁর পাকা চুল বেছে।

বেনুবাগানে একটা সময় বাবার বন্ধু শান্তিনিকেতনের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র একটি স্কুল বসান। বেশি দিন চলেনি। তারপর একটা বাংলা পত্রিকা 'অনাগত'—বের হ'ল। মা গয়না বাঁধা দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের একদা-সচিব ক্ষীরোদ রায় দেখাশোনা করতেন। প্রবন্ধ, কবিতা, কার্টুনে সিদ্ধহস্ত, সুপুরুষ, খড়্গনাসা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রসিক ক্ষীরোদবাবু অনেক পরে অতিরিক্ত 'বাংলা' খাওয়ার ফলে অকালে বিগত হন। 'অনাগত' খালপারে বিক্রির চেষ্টা করতাম, অনেকে কৌতূহলবশে ডেকে দেখতেন; কিন্তু কিনতেন না। অল্প দিন পরে পত্রিকাটি উঠে যায়।

মা'র জীবদ্দশায় শ্যাম পার্কের ভাড়া বাড়িতে মাঝে মাঝে আবির্ভাব হতো কাজী নজরুল ইসলামের। আরও কিছুদিন পরে, অন্য বাড়িতে আসতেন জসীমউদ্দীন, আব্বাসউদ্দীন এবং আরো অনেকে। এদের সঙ্গে আলাপ হয় ঠাকুর্দার সূত্রে, জসীমউদ্দীনকে সাহিত্য জগতে পরিচিত করান তিনি। আধুনিকদের প্রথম সমঝদারদের একজন ছিলেন ঠাকুর্দা।

ছুটিতে প্রায়ই কলকাতার বাইরে যাওয়া হতো। মনে আছে একবার ভুবনেশ্বর থেকে সারারাত গরুর গাড়িতে শুয়ে-বসে গিয়েছিলাম পুরী বা কোনারকে। ভুবনেশ্বরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দেখি। ছোটবেলায় দার্জিলিঙে যাই একবার। একবার রাঁচীতে। সেখানে সন্ধেবেলায় কুয়োর ধারে জমাদারের ছেলের দেশী কুকুরকে ক্রমাগত লাঠি দিয়ে খোঁচাতে পায়ের দুটো জায়গায় বেশ

ভালো করে দাঁত বসায়। ডাক্তারের পরামর্শে কলকাতা হয়ে যেতে হ'ল শিলঙে। তখনকার দিনে শুধু কসৌলি ও শিলঙে 'জলাতঙ্কে'র চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। শিলঙে পেটে দুটো করে বড়ো ইনজেক্শন নিতে হয়েছিল চোদ্দ দিন। প্রথম দিন খুব চেঁচামেচি করেছিলাম। দ্বিতীয় দিন থেকে নিয়ে যেতেন বিখ্যাত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। একই কুকুরের কামড় খেয়ে রাঁচী থেকে শিলঙে আসেন কয়েকজন। আমার মেজভাই বলতেন আমাকে কামড়ে কুকুরটা পাগল হয়ে যায় এবং আমার কবিতা লেখার মূলে কুকুরের কামড়।

যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে আসা এবং পুত্র কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খরচ বাড়াতে বাইরে যাওয়াটা ক্রমশ কমে আসে।

স্মৃতিচারণে জাতীয় আন্দোলনের উল্লেখ করা অবশ্যকর্তব্য। জালিওয়ানালাবাগের সময় নিতান্ত ছোট ছিলাম। আরো বড়ো হয়ে শুনেছিলাম দেশবন্ধুর শোক মিছিলে অসম্ভব ভিড়ের কথা—১৯২৫-এ। কলকাতার একটা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষ বোস ইউনিফর্ম পরে ঘোড়ায় চড়ে মিছিল পরিচালনা করেছেন শুনে দেশের জঙ্গী ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহ হই।

*

মা'র মৃত্যুর পর বিশ্বকোষ লেনের বাড়িতে নিয়মশৃঙ্খলার কোন বালাই রইল না। দিদিমা কিছুদিন চেষ্টা করে সেজমাসির ওখানে ফিরে গেলেন। আমাদের সামলানো তাঁর সাধ্যাতীত। বাবার দিন কাটতো কলেজে ও আড্ডায়। বিচিত্র স্বভাবের এতোগুলো পুত্রকন্যার তদারক করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ফলে আমরা আমাদের ইচ্ছামতো মানুষ বা অমানুষ হতে লাগলাম। বাড়িতে সমাগম হতো নানা ধরনের ব্যক্তিদের। মাঝে মাঝে দোতলা বা তিনতলা (বিশ্বকোষ লেনের বাড়িতে) ভাড়া দেওয়া হতো। কিছুদিন ছিলেন সপরিবারে হেমচন্দ্র বাগচী। দোহারা স্নিগ্ধ চেহারা, টানা টানা চোখ, কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন—আমার বোধশক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল। কবিতা শুনে তাঁর এক বন্ধু সুবলবাবুর ঘন ঘন মাথা নড়তো, নাক দিয়ে নস্যি গড়াতো। হেমবাবুর আমার বয়সী একটি বোন ছিল, কিন্তু আমি তখন নারীবিদ্বেষী। কিসের প্রভাবে মনে পড়ছে না। শারীরিক কসরতে আগ্রহ ছিল। সংলগ্ন বাড়িতে দু-একজন বন্ধুর কাছে যেতাম তিনতলার কার্নিশ বেয়ে, পা ফস্কালে অবধারিত মৃত্যু, কিন্তু তখন অন্তত ভারসাম্য ছিল।

শান্তিনিকেতন থেকে একজন আমেরিকান, উইলিয়ম এ্যালেন এসে কিছুদিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে দ্বারিক ঘোষের দোকানের লুচি, মিষ্টি ছোলার ডাল ও ছেঁচকি খেতে যেতেন আমাদের সঙ্গে (মাথা পিছু বড়জোর দু'আনা লাগতো। ম্লেচ্ছ হ'লেও দোকানে আপত্তি করতো না। সন্ধে হ'লে এ্যালেন দরজা বন্ধ করে একা থাকতেন, শুনেছিলাম গাঁজা-চরস জাতীয় কিছু-একটা সেবন করতেন। আমাকে পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়ে

বলতেন হাতের কাছে যা পাবে পড়ে ফেলবে। ইংরেজি হোক, বাংলা হোক অভিধান দেখার দরকার নেই। প্রথম প্রথম কিছু না বুঝে ইংরেজি পড়ে যেতাম পরে লেখার মানে আস্তে আস্তে মাথায় ঢুকতো। তখন আমার প্রিয় লেখক ছিলেন শেলি ও বার্নাড শ। ভান লুনের Ancient Man অনুবাদ করতে বলেন এ্যালেন, টাকা ও যশের লোভে কাজ শুরু করি।

এ্যালেন মেয়েদের পছন্দ করতেন। ঠিকে-ঝি সুখদার আঁচল ধরে টানতেন, সুখদা মিষ্টি গলায় ন্যাকামি মিশিয়ে আপত্তি জানাতো। শ্বেতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণাঙ্গী রাধিকার লীলাখেলা মনে হতো। আমাদের বাড়িতে দুজন ভদ্রমহিলা আসতেন, মা ও মেয়ে, দুজনেই স্বামীর ঘর করতেন না। মেয়ের সঙ্গে এ্যালেনের ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন মেয়ের বাবা···পণ্ডিত এসে চারতলার ছোট ঘরে বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মহা হৈচৈ বাধালেন। তিনতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মনোযোগ সহকারে শুনছি। এ্যালেন এসে জিজ্ঞাসা করাতে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললাম—তোমাকে মারবে বলছে, কোর্টে নালিশ ঠুকবে। কোর্টের কথা শুনে তিনদিনের মধ্যে এ্যালেন উধাও, প্রথমে এলাহাবাদ, তার-পর চীনে। চীনে পৌঁছিয়ে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। Ancient Man-এর অনুবাদ বাবদ দশ টাকা পাঠিয়েছিলেন এলাহাবাদ থেকে। এরপর গোর্কির Mother অনুবাদ করবো ঠিক করলাম, কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সে ভার নিয়েছেন শোনাতে পিছিয়ে আসা সঙ্গত মনে হ'ল। তখন কে জানতো বহু বছর পরে মস্কোয় গিয়ে রুশ বই-এর অনুবাদ করতে হবে।

বিশ্বকোষ লেনের বাড়িতে বাবার এক বাল্যবন্ধু বেশ কিছুদিন ছিলেন। ব্রহ্মবিহারী সরকার যৌবনে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph. B. ক'রে একটা বড়ো মোটরগাড়ি কোম্পানির এজেন্ট হয়ে বহুদিন পর দেশে ফেরেন। আমেরিকান স্ত্রীকে সঙ্গে আনেন নি। আমেরিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠনী শক্তি সম্পর্কে অশেষ আস্থা ছিল ব্রহ্মবিহারীবাবুর। শরীরচর্চায় বিশ্বাস করতেন। সূর্যোদয়ের আগে ওঁর সঙ্গে আমরা যেতাম গঙ্গা-স্নানে, সাঁতার শিখিয়েছিলেন আমাদের। বাড়িতে বক্সিং, কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদির আয়োজন করেন। ভোরবেলায় চিরতার জল ও আদা ছোলা খেয়ে শরীরচর্চা করতাম। এখন শুনলে সবাই হাসে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। ব্রহ্মবিহারীবাবু উচ্চ ধনী ব্রাহ্মপরিবারের একটি অসাধারণ সুন্দরী শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার প্রেমে পড়েন। ভদ্রমহিলা যখন আমাদের বাড়িতে আসতেন তখন আমার নারীবিদ্বেষ একেবারে উবে যেতো। এমন মার্জিতরুচি, গুণী, নম্র মহিলা জীবনে কম দেখেছি। তাঁর বাবা-মা-ভাইদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তিনি ব্রহ্মবিহারীবাবুকে বিয়ে করেন, সরকারমশাই ডিভোর্স পাবার পর। কিন্তু নানা কারণে বিয়ের পর থেকে তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা শুরু হয়। মোটর-গাড়ি কম্পানির চাকরি যায়। ব্রহ্মবিহারীবাবু নানা ব্যবসায় হাত দেন, যেমন দমদম জেলে মাছ সরবরাহ। (তখন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় জেলে, রাজবন্দীদের

মেসের ভার ছিল তাঁর হাতে)। কিছুতে সুবিধে হয়নি, কিন্তু জীবনে বিশ্বাস কখনো হারান নি তিনি। Log Cabin to White House-এ আস্থা আমরণ পোষণ করেন। পয়সার অভাবে কাপড়কাচা সাবান গায়ে মেখে বলতেন চামড়ার পক্ষে ওটা অনেক উপকারী। চরম দুরবস্থার মধ্যে মরিশ শিভেলিয়রের গান গুনগুন করে গাইতেন। তাঁর স্ত্রী এখনো বর্তমান, যদিও দেখাসাক্ষাৎ হয় না।

আরো একটা ব্যাপার মনে আছে। উত্তরদিকে অস্বচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি মেয়েকে দেখার জন্য সন্ধেবেলায় আমাদের চারতলার নেড়া ছাদে ভিড় হতো। মেয়েটির নাম 'ইতি', পাকা সোনার মত রং, দেহের গড়ন দেখার মতো, বিশেষ করে সাঁঝের বেলায় গা ধোয়ার পর যখন শাড়ি মেলে দিতে আসতো। দাদার বন্ধু বড়লোক ব্রাহ্মণ যুবক বিয়ের প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু কৌলিন্যের দাপটে কন্যাপক্ষ রাজি হননি। পশ্চিম দিকের বাড়িতে তেতলা ঘরে রাত্রে নীল আবছা আলোয় একজন এ্যাটর্নী তার নধর স্ত্রীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রীয় রতিরঙ্গে মত্ত হতেন, বড়রা বলতো—rolling stone gathers no moss। দৃশ্যগুলি দেখে আমার শারীরিক উত্তেজনার বয়স তখনো হয়নি। গলি ছাড়িয়ে সামনের একতলা বাড়িতে নিঃসঙ্গ অবস্থাপন্ন ভুলো পাগলা ছেলেছোকরাদের ডেকে অশ্রাব্য খিস্তিখেউর, গান কবিতা শোনাতেন।

বারো বছর বয়সে অর্থাৎ মা'র মৃত্যুর পর স্কুলে ভর্তি হই। বাবা স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াতেন বটে, কিন্তু স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল আমাকে নিল না অনুপযুক্ত ব'লে। গেলাম কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক স্কুলে। শাজাহান কা'র বাবা গোছের প্রশ্ন ও দু'একটা ইংরেজি সেন্টেন্স রচনা পরীক্ষার পর চতুর্থ ক্লাসে (এখন ক্লাশ VII) নেওয়া হ'ল। ইংরেজি, ইতিহাস, বাংলায় অসুবিধে হতো না, অঙ্ক, ভূগোল ও সংস্কৃতে কাঁচা ছিলাম। ফলে স্কুল কামাই করতাম দিনের পর দিন। সকালে ক্লাস থাকলে চলে যেত ম গঙ্গাতীরে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টীমার, গাধাবোট, খড়বোঝাই নৌকো ইত্যাদি দৃশ্য দেখে বাড়ি ফিরতাম।

মাস্টার-ছাত্রদের মধ্যে লড়াকু পরিস্থিতি তখন ছিল না। ক্লাসে গল্প করার অপরাধে কয়েকবার বেঞ্চে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু লজ্জায় মাথা কাটা যায়নি, মাস্টারমশাইকে ল্যাং মারার চেষ্টা করিনি। 'পলিটেক্‌নিক' ব'লে স্কুলে সপ্তাহে তিনদিন হাতের কাজ শিখতে হতো। বেশ কয়েকজন ছাত্র এতে দক্ষতার পরিচয় দেয়, কিন্তু আমার হাত খুলত না। তখন মানসিক ও কায়িক শ্রমের বিষয়ে মাও সে-তুঙের লেখা পড়িনি। স্কুলে টিফিনের সময় বাইরে যাওয়া নিষেধ, মাসে আট আনার পরিবর্তে আটার রুটি, ছোলার ডাল স্কুল থেকে দিত। সে-যুগে ভিটামিন প্রোটিন ইত্যাদির কথা ওঠেনি বলে বাড়িতে বা বাইরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে হাঙ্গামা বিশেষ ছিল না। আমাদের বড়ো সংসারে আহার্য নিয়ে আদিখ্যেতা হতো না। মাসে একবার মাংস (আট আনায়

সের) হলে ছেলেমেয়েরা দারুন খুশি হতো। এক টুকরো মাছ (ছ আনায় সের) বোধকরি দুবেলায় পাতে পড়তো। ডিমের বালাই ছিল না। চিরতার জল খাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পেট খারাপ হলে উপোস বা বেলের মোরব্বা। খোস-পাঁচড়া হতো ছোটদের। পরে আমার মেজ ভাই বলতেন, কারণটা ভিটামিনের অভাব নয়, ঘাম। বিজলিপাখা সেকালে মধ্যবিত্ত সংসারে বিরল ছিল। বিশ্বকোষ লেনের বাড়িতে (এবং পরে বেহালাতে) গরু ও গোয়াল ছিল। দুধ পেতো সবচেয়ে ছোটরা।

মা'র মৃত্যুকালে যে বোন তিন মাসের সে যখন তিন বছরের (আমার ঠিক পরের বোন তার দেখাশুনো করতো) তখন একদিন দেখলাম বাবা বেশ সেজে-গুজে সন্ধেবেলায় বেরচ্ছেন। পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞেস করলাম—বরের মতো দেখাচ্ছে, বিয়ে করতে যাচ্ছো না কি? পরদিন এলেন নতুন বধূ, বয়সে অনেক কম, সুন্দরী বিধবা। প্রথমে ভাব ছিল, কিন্তু পরে কী একটা কারণে সেই যে কথা বন্ধ হলো, এখনো দেখলে মুখ ফোটে না। আমরা প্রথম পক্ষে, আগেই লিখেছি, ন জন, দ্বিতীয় পক্ষে সাত জন। বাবার দ্বিতীয় পক্ষ হবার কিছুদিন পর দাদা অন্যত্র চলে যান, কষ্ট করে হোমিওপ্যাথি শেখেন ডাক্তার জিতেন মজুমদার তত্ত্বাবধানে।

বিশ্বকোষ লেন ছেড়ে কাশিমবাজার স্কুলের পাশে নন্দলাল বোস লেনের একটি বাড়িতে চলে আসি। ফলে স্কুল কামাই করা কঠিন হয়ে পড়লো। বাবা'র আড্ডার লোক তখন কিছু বদলেছে। বাড়িতে সন্ত্রাসবাদীরা আসতেন, দেখে বেশ উত্তেজনা হতো, বিশেষ করে খানাতল্লাশির পর পুলিশ যখন খালি হাতে ফিরে যেতো। অনেক দিন একটা লম্বা সরু কাঠের বাকসে পুতুল জমাবার শখ ছিল। কৃচ্ছ্রসাধন ও স্থানাভাবে বাকসটা বা কোনো টেবিলের শুতাম। বাকসতে সন্ত্রাসবাদী পত্রপত্রিকা পুলিশের নজরে পড়েনি।

রাজনীতিতে, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিতে উৎসাহ ও আগ্রহ তখন তীব্র। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা ইত্যাদি আলোড়ন এনেছিল। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে আস্থা ছিল না। এ-সময় বোধ করি মার্কস-বাদী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও রাধারমণ মিত্রকে প্রথম দেখি। রাধারমণবাবু মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়েন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আসতেন।

বাগবাজারের পাট তুলে দেবার সময় এল। বোধহয় বাড়িভাড়া খরচায় কুলোচ্ছিল না। নানা কারণে বাগবাজারের খ্যাতি ছিল। শিবমন্দিরে গাঁজার আড্ডা, অনেক ব্যায়াম সমিতি, বোস বাড়ির বিরাট মাঠে বারোয়ারী দুর্গা পুজো, প্রদর্শনী মেলা ও ব্যায়ামবীরদের কসরৎ; পাড়ায় পাড়ায় সিদ্ধির কুলপি, প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের দোকান; সন্ধেবেলায় বিকটবেশে বহুরূপীদের আবির্ভাব; অমৃতবাজার পত্রিকা, কাছেই যামিনী রায়ের বাড়ি। সকালে গঙ্গাতীরে নানা বিচিত্র দৃশ্য—নিতম্বিনীদের মুক্তকেশ লঘুবেশ স্নান ও ঢলানি, স্নানের পর ভক্তিভরে উড়িয়া পুরোহিতের হাতে কপালে তিলক

অঙ্কন। আবহাওয়া ভালো থাকলে আকাশ ভরে যেতো ঘুড়ি ও পায়রাতে। ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া রীতিমতো আর্ট ছিল। এলাকাটিকে আরও বড়ো করে দেখলে উত্তর কলকাতার অনেক থিয়েটার (সে জগতে মধ্যাহ্ন-সূর্য তখন শিশির ভাদুড়ী) তিন-চারটে সিনেমা হল, অনেক স্কুল ও কয়েকটি কলেজ, নানান পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আড্ডা। চৌরঙ্গীতে যাওয়া নিরাপদ ছিল না, গোরাদের অত্যাচারে। দক্ষিণ কলকাতা তখনো গজিয়ে ওঠেনি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বসতি হিসেবে। কালীপ্রসন্ন সিংহের কলকাতার কিছুটা রেশ ছিল বাগ-বাজারে। চিৎপুর বেশি দূরে ছিল না। বেড়াতে যেতাম দেশবন্ধু পার্কে, কখনো গঙ্গায়—স্টীমারে; বিশেষ করে জন্মদিনে। ঘটা করে জন্মদিন হতোনা, বাড়িতে পায়েস হলে যথেষ্ট। ওয়ালফোর্ড বাসের ছাদহীন দোতলায় চড়ে বেশ ফুর্তি হতো, ভিড় ছিল না ট্র্যামেবাসে। আমরা অবশ্য পায়দলে বিশ্বাস করতাম, দূরত্বের হিসেব ছিল না। স্কুলে 'লাল ছেলে'র প্রসঙ্গ উঠলে ব্যাপারটা বুঝতাম না, স্কুলের পরে একা একা থাকতাম কিন্তু একটা বাগবাজারি বখাটে ভাব কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

*

১৯৩২-এ ম্যাট্রিক পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হতে বেগ পেতে হয়নি। স্কটিশে মেয়েরা পড়তো ব'লে ওখানে ভর্তি হবার আগ্রহ ছিল। অবশ্য প্রফেসরের পেছনে সার বেঁধে আসা-যাওয়া মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দেখলাম বেশি নেই। প্রথম কয়েকমাস বাগবাজার থেকে ক্লাস করি, তারপর যাই বেহালায়, ট্র্যাম লাইন থেকে মিনিট বারোর পথ, ঠাকুর্দার বাগানবাড়িতে। ঠাকুর্দা তখন বাগবাজারের বাড়ি ভাড়া দিয়ে উঠে গিয়েছিলেন বেহালার সদর রাস্তা ডায়মণ্ডহারবার রোডে। বাগানবাড়িটা তিনতলা, প্রায় ছ বিঘে জমি, পুকুর, ফল-মূল-ফুলের ছড়াছড়ি। দেবদারু, সুপুরি, নারকেল গাছ ছিল অনেক। আম, জাম, কাঁঠাল, সফেদা, লিচু, এমন কি এলাচ গাছ। আলু, কপি ও অন্যান্য শাকসবজির চাষে বাবার ঝোঁক ছিল। হাজার খানেক কপি হতো। দেখাশুনো করতো একা হাতে গৌর মালি—দীর্ঘ সুঠাম দেহ, শান্তিপ্রিয়, অক্লান্ত পরিশ্রমী। বেহালায় থাকি ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯-র শুরু পর্যন্ত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম বেহালা থেকে। বাগানবাড়িতে আসতেন রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক এবং অন্যান্য অনেকে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাধারমণবাবু বহু বছর আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ছিলেন বঙ্কিমবাবু। লোক-শিল্পের গবেষক অজিত মুখোপাধ্যায় থাকতেন, ঠাকুর্দার সূত্রে আলাপ। বেড়াতে আসতেন বিষ্ণুবাবু, অশোক মিত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। একবার বাচ্চাদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে বেশ চোট লাগাতে (১৯৩৭-এ) মাস-তিনেক বেরোতে পারিনি। তখন একদিন ঠাকুর্দার ওখান থেকে তারাশঙ্কর

আমাকে দেখতে এসেছিলেন। অসুস্থতার দীর্ঘ অবসরে কালীপ্রসাদ সিংহ সম্পাদিত মহাভারত শেষ করি। বদহজমের প্রমাণ আছে নিজের কয়েকটি কবিতায়, যাদের বক্তব্য এখন ঠিক বুঝতে পারি না।

যতোদূর মনে আছে, সাহিত্যিক-বন্ধুদের সমাগম হতো ১৯৩৫-৩৬-এর পর। বেহালায় প্রথম দু'বছর কাটে ছাত্রজীবন যেমনভাবে কাটা উচিত সেভাবে, অর্থাৎ কলেজ থেকে ফিরে আর শহরে যেতাম না; পড়াশুনো যে বিশেষ করতাম তা নয়। আশেপাশে ঘুরতাম, কখনো দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে, হয় হেঁটে নয় সাইকেলে। কখনো মাঠ ভেঙে যেতাম বজবজ-খিদিরপুর ডকের দিকে। সাহাপুরের ফাঁকা মাঠে মেজভাইয়ের দুই তিন বন্ধুর সঙ্গে বসে থাকতাম, তাঁদের একজন সুধীন চট্টোপাধ্যায় সুগায়ক ছিলেন। কখনো বা ঠাকুর্দার ঘোড়ার গাড়িটা ধার নিতাম। ঠাকুর্দা ঘোড়ার গাড়িতে বেহালা যেতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঘোড়াটা ছিল শীর্ণ, মেজাজী। আমরা বলাবলি করতাম সে ঠাকুর্দাকে নিয়ে মাঝেরহাট ব্রিজে ওঠার আগে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে যেতো, জিলিপী না খাওয়ালে এক পা এগোত না।

বেহালা জায়গাটা ভালো লাগতো। একটু বেরিয়ে পরলে আদিগন্ত মাঠ, সবুজের সম্ভার, কৃষ্ণচূড়ার লালচে আভা। নিজেদের বাগানে সময় কাটতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পুকুরে সাঁতার, ফলমূল কুড়িয়ে খাওয়া। মুসলমান প্রতিবেশীরা পরবের পর নিষিদ্ধ মাংস পাঠালে অন্তত কিছুটা খেতাম। আপদের মধ্যে ছিল সাপ আর ম্যালেরিয়া। বেহালায় একবার গিয়ে পূর্ববঙ্গের কথা মনে পড়াতে ঠাকুর্দা বাড়িটা কেনেন।

১৯৩৩-এর শেষাশেষি জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো। আমার সেজমাসিমা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার আগে কলকাতায় গিয়ে রাত জেগে তাঁর সেবা করতাম। সেই বয়সে রোগটা ছোঁয়াচে বলে বাবা আপত্তি করাতে রাগ ক'রে একটা হস্টেলে উঠি মাস তিনেকের জন্য। তারপর ফিরে আসি। হস্টেলে আবাসিকদের অনেকে ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। একজনকে বলে পটাসিয়াম সায়নাইড যোগাড় করি। একটি 'অন্তিম' রাত্রে কিছুটা মুখে দিয়ে সৃষ্টির আগে ব্রহ্মার মতো অবর্ণনীয় অবস্থায় থাকি—কিছু হলোনা—জিনিসটা সুগার অফ্ মিল্ক। আর একজন আবাসিক—বীরবাহু ভাদুড়ী যিনি একদা সন্ত্রাসবাদী ছিলেন—আমার বানানো গল্পে বিশ্বাস ক'রে একটা শিশি এনে দেন। একবার ঠকেছি যাচাই করা দরকার। মাছের মুড়োয় কিছুটা মাখিয়ে একটা ঘুরঘুর করা বেড়ালকে খাওয়াবার চেষ্টা করলাম। বেড়াল এগিয়ে আসতে অজস্র কাক দল বেঁধে এতো চিৎকার শুরু করলো যে বেড়ালটা চলে গেল। হতাশ হয়ে ঘরে ঢুকেছি, কিছুক্ষণ পর আবার কাকের কর্ণভেদী আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে দেখলাম বেড়ালটা চিৎ হয়ে থাবা দিয়ে শূন্য আঁচড়াচ্ছে, কষ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এটা খেলে শেষের সে-মুহূর্ত সুন্দর দেখতে হবেনা, তাই শিশিটা সার্টের ভেতরের বুকপকেটে রেখেছিলাম অনেক

বছর, ১৯৩১ পর্যন্ত। সে বছর লখ্‌নৌতে গিয়ে গোমতী নদীতে বিসর্জন দিই। ভয় ছিল নদীর মাছগুলো মারা যাবে।

প্রসঙ্গত, আমাদের রাজনীতিকরা কাককে এত অশ্রদ্ধা কেন করেন? দু-পক্ষই উভচর এবং প্রাণীদের মধ্যে সর্বভুক কাকের মতো সেয়ানা সতর্ক জীব বোধকরি নেই। তাছাড়া মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র, পুরাণ ও সাহিত্য গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে কাকের উল্লেখ কম নেই।

প্রথমে ঠিক করেছিলাম আই. এ. পরীক্ষা দেব না। পরীক্ষার দিন-বারো আগে প্রস্তুতি শুরু করি। দিনে ছ ঘণ্টা, শেষের তিনদিন আট ঘণ্টা। ছাত্র-জীবনে পরীক্ষা আসন্ন—শিরে সংক্রান্তি হওয়া না পর্যন্ত বইতে হাত দিতাম না। দিনে দশ ঘণ্টা পড়াশুনো জীবনে তিন চারদিনের বেশি হয়নি। বই কিনতাম নামমাত্র, ধার ক'রে, পরীক্ষার আগে লাইব্রেরিতে বা কোনো বন্ধুর মেসে গিয়ে প'ড়ে নিতাম। স্কলারশিপের টাকাটা খরচ হতো অন্যান্য খাতে, যেমন চাঁদা ক'রে সুরাপানে।

আমাদের বেহালার বাড়িতে রাধারমণবাবু ও বঙ্কিমবাবু খুব সম্ভব ১৯৩২ নাগাদ আসেন। বঙ্কিমবাবু ছিলেন অত্যন্ত মন্থরগতি, দীর্ঘ ভারিক্কি চেহারা, কথাবার্তা বলতেন ধীরেসুস্থে, আত্মপ্রত্যয় ছিল প্রখর। বাগানে খাটা পায়খানায় গেলে ঘণ্টা দেড়েকের আগে বেরোতেন না, সঙ্গে যে বই নিয়ে যেতেন পরে প্রায়ই পাওয়া যেত না। আমরা বলতাম বিপ্লব আপনার জন্য পিছিয়ে যাবে, ক্রান্তি মুহূর্তে হয় পায়খানায় কিংবা জর্দা পানের জন্য বসে থাকবেন। রাধারমণবাবু ছিলেন আলাদা ধরনের মানুষ। এমন কোন বিষয় ছিলনা যাতে তাঁর আগ্রহের অভাব দেখেছি। প্রতি সকালে খবরের কাগজ প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়তেন। পড়াশুনো স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। কলকাতা বা বাইরে যেখানে যেতেন পায়ে হেঁটে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখতেন বয়সের পার্থক্য তাঁর কাছে কিছু নয়। অনেকদিন গভীর রাত পর্যন্ত আমার মেজভাই ও আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করতেন। তখন বিদেশে হিটলার ও মুসোলিনির দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে, স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, প্রথম পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবার পর রাশিয়া যুক্তফ্রন্টের আহ্বান অক্লান্তভাবে ক'রে চলেছে। দেশে গান্ধীজীর আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর অবসাদ, নেহরু সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন সভাসমিতিতে, গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষবাবুর মতভেদ হ'ল। এক কথায়, আলোচনার বিষয়ের অন্ত ছিল না। জীবনের নানা বিচিত্র দিকে রাধারমণবাবু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর কাছে শিক্ষা নিয়েছেন অনেক। আশি পেরিয়েছেন, এখনো প্রায় সোজা হয়ে হাঁটেন, লিখে যাচ্ছেন অক্লান্তভাবে।

বি. এ. পড়ার কালে পাঁচমিশেলি আড্ডায় জড়িয়ে পড়লাম। কলেজে প্রথম দু বছর বাড়ি-যাতায়াতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলনা। তারপর বন্ধুত্বের পরিধি ক্রমশ বেড়ে চলে।

তখন বেহালা থেকে সকালে বেরিয়ে ফিরতাম অনেক রাতে। বাবা কোন খবর রাখতেন না। এমনও হয়েছে যে কলকাতার বাইরে বেশ কিছুদিন ঘুরে এসেছি, বাবা জানতে পারেন নি। রাত বেশি হলে মমিনপুর থেকে হেঁটে ফিরতাম ; রাস্তাঘাট জনহীন, মাঝেরহাট ব্রিজ পেরিয়ে ডাকাতের আস্তানা, ছিল সাপখোপ, কিন্তু বাড়ি পৌঁছিয়ে যেতাম ঠিক। তখন যৌবনের নানা অভিজ্ঞতার ফলে কবিত্বভাব প্রখর হয়েছে। কলকাতায় যাতায়াতের সময় ট্র্যামের গতিছন্দে কবিতার অনেক লাইন মনে দানা বাঁধতো—ট্র্যামের গতিছন্দ হয়তো গদ্যছন্দের মূলে ছিল।

*

১৯৩৪-এ গ্রীষ্মকালে দারুণ মর্মবেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য একবার সাহস ক'রে গেলাম বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে, ভবানীপুরে। 'বন্দীর বন্দনা'র কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি কবিতা লিখি কিনা। কয়েকটা লেখা দিন কয়েক পরে দেখাতে, বললেন নিয়মিত ছন্দের চেষ্টা ছেড়ে গদ্যছন্দে যেতে। 'বন্দীর বন্দনা'র লেখক সম্বন্ধে ধারণা ছিল বলিষ্ঠ দীর্ঘ, দৃপ্তকন্ঠ মানুষ হবেন। বুদ্ধদেববাবুকে প্রথম দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। পরে দেখেছি নাতিদীর্ঘ লেখকদের একটা 'আক্রমণাত্মক' ঝোঁক থাকে। যেমন নীরদ চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মজুমদার, অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যবহারে নয়।

বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আলাপ গভীর হতে সময় লাগেনি, শেষ পর্যন্ত তাঁর আড্ডার কেন্দ্রস্থল হ'ল কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এ্যাভেনিউ। ত্রৈমাসিক 'কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫-এ। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বাবু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, আমি সহকারী সম্পাদক। পাঁচজন পাঁচটাকা ক'রে চাঁদা দিয়ে 'কবিতা'র সূত্রপাত। যতোদূর মনে পড়ে পাঁচজন ছিলেন বুদ্ধদেববাবু, প্রেমেনবাবু, বিষ্ণুবাবু, অজিত দত্ত ও আমি। প্রেমেনবাবু অলস প্রকৃতির লোক, দ্বিতীয় বছরে আমি সম্পাদক হই, কিন্তু সম্পাদনা, প্রকাশনা, টাকাকড়ির হিসাবনিকেশ সমস্ত কিছু করতেন বুদ্ধদেববাবু। আমার কবিতা রচনার আয়ু অবশ্য বারো বছর—১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত, অর্থাৎ আমার আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত। প্রথম বই 'কয়েকটি কবিতা' বের করি ১৯৩৭-এ স্বর্ণপদক বেচে, উৎসর্গ করি মুজফ্‌ফর আহমেদকে। আমার কবিখ্যাতির একটা কারণ—ইংরেজিতে ভালো ছাত্র ছিলাম। 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা করেন বুদ্ধদেববাবু, বিষ্ণুবাবু এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যথাক্রমে 'কবিতা', 'পরিচয়' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়। ১৯৪০-এ প্রকাশিত হয় 'গ্রহণ', ১৯৪২-এ 'নানাকথা', ১৯৪৩-এ 'খোলাচিঠি', ১৯৪৪-এ 'তিনপুরুষ' ও ১৯৫৪-এ 'সমর সেনের কবিতা' (সিগনেট প্রেস)। পরে কয়েকটি টুকি-টাকি কবিতা লিখেছি (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

'কবিতা' ও 'পরিচয়'-এর আড্ডার প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন। এ বিষয়ে অন্যত্র লিখেছি, অবশ্য সবিস্তারে নয়। [দ্র. উড়ো খৈ : ৪] 'পরিচয়'-এ কবিতা লিখি দু-তিনবার, পুস্তক সমালোচনা করি অনেক বেশি [১২টি]। সুধীনবাবু সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, সুপুরুষ, কবিতা আবৃত্তি করতেন সুন্দর, গলাটা ছিল সুরেলা। নাটকীয়তা বোধ হয় পেয়েছিলেন তাঁর কাকা বিখ্যাত অভিনেতা অমর দত্তের কাছ থেকে। প্রথম দিকে তাঁর উপস্থিতিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম না, বুদ্ধির জগতে তিনি ছিলেন বেশ উঁচুতে। কী নিয়ে আলাপ করবো বুঝতে পারতাম না, ব্যবহারে তিনি ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক। যুদ্ধ শেষ হবার পর অবশ্য তাঁর আচরণে-ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন আসে, অনেকটা ঘরোয়া হন। যুদ্ধের সময় এবং পরে চাকরির সূত্রে নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ও রাজেশ্বরীর সঙ্গে বিবাহ বোধ হয় এর কারণ এমন-কি বাজার-দর নিয়ে পর্যন্ত আলোচনা করতেন, যেটা আগে অভাবনীয় ছিল। তুলনায় বুদ্ধদেববাবু, বিষ্ণুবাবু, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এঁরা সবাই ছিলেন অনেক বেশি ঘরোয়া, ওঁদের সামনে সংকোচ বোধ করতাম না।

শুরুতে সুধীনবাবুর কবিতা আমার কাছে কঠিন শব্দের কালোয়াতি মনে হতো। একবার বিষ্ণুবাবু 'ক্রন্দসী'র পাণ্ডুলিপি থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনান, তখন থেকে সুধীনবাবুর কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হই—তাঁর কাব্যে যুক্তি ও আবেগের সমন্বয় ও শৃংখলাবদ্ধ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।*

মস্কো থেকে প্রথম ছুটিতে ফিরে (১৯৬০-এ) রাসেল স্ট্রিটে সুধীন দত্তের ওখানে সকালে গিয়েছিলাম। কফি খাওয়ালেন। ইতিমধ্যে এলেন এডোয়ার্ড শিল্‌স্। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক বই আছে (আমি পড়িনি)। সুধীনবাবু তাঁকে বললেন সন্ধেবেলায় আবার আসতে ও বললেন আরো কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি থাকবেন। আমাকে না বলাতে অবাক হলাম। মস্কোফেরৎ ব'লে বোধহয় বাদ দেন, তখন মুক্ত দুনিয়ার অনুরাগীদের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতা ছিল। তাছাড়া সুধীনবাবুর বাড়িতে স্পেণ্ডরের সঙ্গে আমার বাদানুবাদের কথা হয়তো তাঁর মনে ছিলো। অন্যত্র, যেমন নিরঞ্জনের বাড়িতে দেখা হলে সুধীনবাবুর ব্যবহারে কিন্তু অন্তরঙ্গতা দেখলাম। রাজেশ্বরীর কোনো ভাবান্তর দেখিনি। শেষে যে দিন দেখা হলো, সুধীনবাবু বারকয়েক বললেন ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে একটি কবিতা-পাঠের আসরে যেতে, ওঁর বাড়ি হয়ে গেলে 'মনোবল' যোগাবার আশ্বাস দিলেন। শেষ পর্যন্ত 'পেট খারাপ হওয়া'তে যেতে পারিনি। মস্কোয় ফিরে বুখারেস্টের বিখ্যাত চীন-রুশ বিতর্কমূলক বৈঠক-ফেরৎ ভূপেশ গুপ্তের কাছে সুধীনবাবুর মৃত্যু সংবাদ [মৃত্যু : ২৫ জুন ১৯৬০।] পাই

* দ্র. প্রকাশক-কৃত 'সংযোজন' অংশ।—প্রকাশক

(১৯৬০. জুলাই মাস)।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাসমস্যার ব্যাপার। তাঁর বিরুদ্ধে একদা-বিদ্রোহীরা তিরিশের দশকে ঘোরতর রবীন্দ্রভক্ত হন। একদিকে 'রাশিয়ার চিঠি' ও পরে 'সভ্যতার সংকট' বামপন্থীদের মধ্যে আলোড়ন আনে। অন্যদিকে আধুনিকদের টেক্কা দিয়ে লেখা 'শেষের কবিতা' উত্তেজনা ও উৎসাহের খোরাক যোগায়। তারপর 'চার অধ্যায়'। দুটিই আমার ভালো লাগেনি। 'শেষের কবিতা' চালিয়াতি মনে হয়েছিল। 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের একটি পত্রিকায় আটদশ লাইনের একটি তীব্র সমালোচনা পড়ে বুদ্ধদেববাবু খুব চটে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'চ্যাংড়া' সমালোচকটি কে? ওটা যে আমার লেখা চেপে গেলাম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচকেরাও নিজেরা কিছু লিখে তাঁর কাছে দু'এক ছত্র সার্টিফিকেট পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতাগুলি অন্য জগতের লেখা।

অনেকে হয়তো জানেন না যে তিরিশ দশকের শেষাশেষি [১৯৩৮] রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার একটি সংকলন [বাংলা কাব্যপরিচয়] বের করেন (জোর গুজব সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় ও পরামর্শে)। তিনজন 'আধুনিক' কবি বইটিতে স্থান পায়নি—বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র ও আমি। শেষ পর্যন্ত সংকলনটির কি হয়? এ বিষয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ আলোকপাত করতে পারে।* প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে অশোক মিত্র (পরে আই. সি. এস.) একটি তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন সংকলনটির; অন্য দু-একটি পত্র-পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য বেরোয়।

সংকলনটি বেরোবার আগে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেষ দেখা হয় শান্তিনিকেনে ১৯৩৮-র এপ্রিলে, কাঠফাটা গ্রীষ্মে। বিষ্ণুবাবু সহ আমরা চার-পাঁচজন প্রথমে পৌঁছই, দু-একদিন পরে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আমি ছাড়া আর সবাই চলে আসেন খুব সম্ভব গরম ও মশার অত্যাচারে। দুজনে ছিলাম তখনকার দোতলা গেস্ট-হাউসে; খেতে যেতাম টিনের চাল দেওয়া একটা হলে। প্রচণ্ড গরমে গলা দিয়ে কিছু নামতো না, এমন একটা জায়গায় খাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে কর্তৃপক্ষ যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার তারিফ করতাম। দিন সাতেক পরে বিল দিতে গিয়ে শুনলাম টাকা লাগবেনা, আমরা 'গুরু-দেবের' অতিথি। কলকাতায় ফিরে গদগদ ভাষায় কবিকে চিঠি লিখেছিলাম।*

বিষ্ণুবাবুরা চলে যাবার পর স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বুদ্ধদেববাবু আসেন, ওঠেন উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণের একটা ছোট বাড়িতে। সেখানে যখন-তখন যেতাম। কবির দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা আন্দাজ করে একটা দূরত্বে সিগারেট ফেলে দিয়ে প্রণাম সেরে বসতাম গাছতলার নিচে মোড়ায়। বুদ্ধদেববাবুর কুঠিতে সময়-অসময় চায়ের কথা তুললে বন্দোবস্ত করতেন একটি সুন্দরী তরুণী। নাম

* দ্র প্রকাশক-কৃত 'সংযোজন' অংশ।—প্রকাশক

এখনো মনে আছে—সুনন্দা। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর শুনলাম 'রবিবাবু' বলাতে এবং প্রায়ই তাকে বিরক্ত করাতে দুর্নাম হয়েছে। শান্তিনিকেতনের পরচর্চার আবহাওয়া দেখে বলতাম ব্রাহ্ম-পল্লীসমাজ (বুদ্ধদেববাবুর 'সব পেয়েছির দেশ' অন্য সুরে লেখা)।

বাংলার অতিবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন ইয়েট্‌স্‌, এলিয়ট, পাউন্ডের প্রচণ্ড প্রভাব, বিশেষ করে এলিটের কবিতা ও গদ্য রচনাবলীর। 'শুদ্ধ' কবি হিসেবে ইয়েট্‌স্‌কে খাতির করতেন সুধীনবাবু। আমার বেশি অনুরাগ ছিল এলিয়টের প্রতি। "Poetry is not a turning loose of emotion" কথাটি এখনো মনে পড়ে বাংলা কবিতা পড়লে। তারপর এলেন 'প্রগতিবাদী' অডেন, স্পেণ্ডর, ডে-লুইস ইত্যাদি। প্রথম দু'জনের 'মরমী' পরিবর্তনের কথা অবশ্য সুবিদিত। পঞ্চাশের দশকে দু'জনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়। অডেনকে দেখি লিণ্ডসে ও মিনি এমারসনের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে, ব্যক্তি হিসেবে ভালো লেগেছিল (তাঁর ভাইঝি, শীলা অডেনের মেয়ে বলতেন, Oh, uncle is a queer !)। স্পেণ্ডর অত্যন্ত tense ও উদ্ধত প্রকৃতির বলে বাকবিতণ্ডা হয় সুধীনবাবুর বাড়িতে (নভেম্বর, ১৯৫৪ সালে)।* স্পেণ্ডর সাম্যবাদ কাটিয়ে উঠে 'মুক্ত দুনিয়া'র ভক্ত হন। সেদিন স্পেণ্ডর কয়েকটি পুরনো কবিতা আবৃত্তি করার পর প্রেমেনবাবুর প্ররোচনায় অত্যন্ত সরল মুখে জিজ্ঞাসা করি যে এখন কবিতাগুলো তাঁর নিজের লেখা ব'লে মনে হয় কিনা। হঠাৎ মারমুখি হয়ে স্পেণ্ডর বললেন, 'What do you mean ?' বললাম আমার পুরানো লেখা অনেক সময় নিজের মনে হয়না, তাই প্রশ্নটা করছি, তাতে এতো চটে ওঠার কোনো কারণ নেই। 'Is that so', বেশ রাগতভাবে বললেন স্পেণ্ডর। কিছুক্ষণ পরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে 'homo' শব্দটি একটু চড়া গলায় ব্যবহার করেছিলাম।

ক্রিস্টোফার কডওয়েলের লেখা তখন অনেকের মনে গভীর রেখাপাত করে, সাহিত্য মূল্যায়নের একটি নতুন ধারার সূচনা করে। এখন পড়লে কেমন লাগবে জানি না।

তারাশংকর ও মানিকবাবু তখন প্রগতিবাদীদের প্রিয়। মানিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' অবিস্মরণীয়। তাঁর মতো নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিক ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যে আগে কেউ লেখেননি। মানিকবাবু দিল্লীতে কিছুদিন চাকরি [?] করেন মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর। তখন কামাক্ষী-প্রসাদের বাড়িতে কয়েকবার দেখা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়নি। জীবনানন্দকে দেখেছি দু-একবার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' তখনকার দিনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সুকান্ত শুরু করেন আরো কিছুদিন পরে। তখন মনে হতো বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত ক্রমশ বিস্তৃত

* দ্র. প্রকাশক-কৃত 'সংযোজন' অংশ।—প্রকাশক

হচ্ছে। পরবর্তীকালের সাহিত্যে আগাছা কিন্তু বেড়ে গেল।

'কবিতা' ও 'পরিচয়' এই দুই আড্ডায় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা হতে শুনিনি। 'শেষ প্রশ্ন' সম্বন্ধে উন্নাসিক মনোভাব ছিল, যদিও মানিকবাবু উপন্যাসটির প্রশংসা করেন।

কোন পত্রিকা বিষয়ে আতিশয্য অনুচিত। কিন্তু আশ্বিন ১৩৪২, অর্থাৎ ৪৩ বছর আগেকার প্রথম সংখ্যা 'কবিতা' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকদের ভালোলাগতে পারে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : তামাসা

তামাসাটা রেখো মনে। ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাসা।···পথের ধারে/বেড়ায় ঘেরা বিদেশী গাছ/যেদিন চমকে দেবে হঠাৎ পুষ্পিত আহ্বানে, আর সাধ হবে যেদিন/তার কালো চুলো সমস্ত চেতনা ঢেকে দিতে/ভুলো না সেদিন ইলেকট্রনের এই তামাসা।

বুদ্ধদেব বসু : চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়/কেমন ক'রে বলি/কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,/যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান/দিগন্ত থেকে দিগন্তে :/কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;/চারদিকে সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,/মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

বিষ্ণু দে : পঞ্চমুখ

···উত্তরে হাওয়া লাগেনি কখনো তোমার গায়ে। /পাহাড়তলীর দাবদাহ আজো দেখনি চোখে। /সাহারার বালি পোড়েনি তো আজো কোমল গায়ে/ প্রসার্পিনার পরশ পাওনি এ মরলোকে। /হৃদয়বিহীন খর যৌবনে তোমার হিয়া/হাসি তব তাই বৃথাই ছড়ালো তুষার, প্রিয়া।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জাগরণ

তোমার চিকন দেহে বিজড়িত সে-দিব্য, কুহক,/ভাস্কর অলজ্জ কটি, দৃপ্ত কুচ, নিঃসঙ্কোচ উরু,/অধরে সিতাভ হাসি, মুক্ত কেশে উথলে অগুরু,/ সাবলীল আত্মদান স্নিগ্ধ চোখে এনেছে ঝলক।

জীবনানন্দ দাশ : মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পৌষ-সন্ধ্যায়,/দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর কোলে নিমগ্ন দেউল,/দেখিয়াছি নদীটিরে : ম্লান বাঁকা নিস্তব্ধতা চোখে দেখা যায়/যতদূর ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল/জোনাকীতে ভ'রে গেছে ; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে/চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নেই তার ফসলের তরে।

অজিতকুমার দত্ত : ন খলু ন খলু বাণ

সংহত করো, সংহত করো অয়ি,/যৌবন-বাণ তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর, এ নহে তন্দ্রা-অরণ্য-ছায়াচারী ত্রস্ত হরিণ ; সংহরো তব শর। তীক্ষ্ণসায়ক দীপ্ত এ-

দিবালোকে/ভ্রষ্টলক্ষ্য কোনোমতে হয় পাছে,/শক্তি তোমার সংহত করো অয়ি,/মৃণ্ময়ারো তরে ভিন্ন সে-ঋতু আছে।

সুধীন দত্তের লেখা ঋজু ও স্পষ্ট, কাব্যিপনা নেই। কবিতাটির নায়িকা কি বিদেশিনী? কিন্তু 'অগুরু' কোথা থেকে এলো?

প্রেমেনবাবু তখনি ইলেকট্রনের তামাসা ধরে ফেলে সংসার সীমান্তে থাকতেন ব'লে চেহারা ও স্বাস্থ্য অটুট রেখেছেন।

'কবিতা' ও 'পরিচয়' ছাড়া পরিচিত অনেকে যেতেন বিষ্ণুবাবুর ওখানে। তখনো তাঁকে কেন্দ্র করে কোনো রীতিমতো গোষ্ঠি গড়ে ওঠেনি—'সাহিত্যপত্র' বেরোয় পরে। বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে যেতেন চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সাহিত্যিকরাতো বটেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে কলকাতায় আগত বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের অনেকে যেতেন তাঁর ও সুধীনবাবুর ওখানে। তাঁদের অবশ্যগন্তব্যস্থান ছিল বাগবাজারে যামিনী রায়ের বাড়ি। যামিনীবাবুর আন্তর্জাতিক খ্যাতির বিস্তারে সাহায্য করেন বিষ্ণুবাবু ও সুধীনবাবু। বিষ্ণুবাবুর আর একটি বিষয়ে উৎসাহ ছিল—বিয়ের ব্যবস্থাপনায়। অশোক মিত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী গোপাল ঘোষ এ বিষয়ে জানেন। দিল্লীতে থাকাতে বিষ্ণুবাবু এই বরগুণ থেকে আমি বঞ্চিত হই।

একবার বিষ্ণুবাবু বিজলি-পাখা কেনার জন্য ২৫ টাকা ধার নেন। বেশ কিছুদিন পরে টাকা শোধ না ক'রে আমার অজ্ঞাতসারে আমাদের বৈঠকখানায় যামিনী রায়ের একটি ছবি টাঙিয়ে দিয়ে যান। টাকাটার কথা মনে হলে মাঝে মাঝে ছবিটা উল্টিয়ে রাখতাম; বৈঠকখানায় কেউ না থাকলে বিষ্ণুবাবু আবার সেটা সোজা ক'রে দিয়ে যেতেন। এখন বিজলি-পাখার দাম বোধহয় ৪০০-৫০০ টাকা, কিন্তু শুনেছি যে ছবিটার দাম তার বহুগুণ।

যামিনীদাকে ছোটবেলা থেকে চিনতাম। তাঁর বড়ো ছেলে জীমূত, যিনি বেঘোরে বাঁকুড়ার জঙ্গলে প্রাণ রাখেন, আমার বয়সী ছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে যে-এলাকায় থাকি সেখান থেকে যামিনীদার বাড়ি কাছে, মাঝে মাঝে যেতাম। অসুখবিসুখ হলে আমার দাদাকে খবর দিতেন চিকিৎসার জন্য। শেষের দিকে এ্যালোপ্যাথ ডঃ পাল কিছুদিন দেখাশোনা করেন। ডঃ পালের কাছে শুনেছি শারীরিক সংকট সাময়িকভাবে কেটে গেলে যামিনীদা আসুরিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য তাঁকে বেজায় ধমকাতেন। এখানে স্বীকার করে রাখি, সংগীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে আমার জ্ঞান অগভীর। সুধীন-বাবু, বিষ্ণুবাবু, অশোক, চঞ্চলের ধারে কাছে এ ব্যাপারে আমি ঘেঁষতে পারি না। তবে সংগীত বা চিত্রকলা বিষয়ে বিরূপতা ছিল না। লিণ্ডসে ছুটিতে গেলে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় কিছুদিন বাধ্য হয়ে চিত্রসমালোচকের কাজ করতে হয়।

'কবিতা' ও 'পরিচয়' পত্রিকার পাঠক সংখ্যা অতি সীমিত ছিল, তুলনায় বহুল প্রচলিত ছিল 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা', 'শনিবারের চিঠি' ইত্যাদি।

আধুনিকদের শ্রাদ্ধ করতো বলে 'শনিবারের চিঠি' সবাই পড়তাম। এর একটি সংখ্যা পেলে এখনো পড়ি—'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথম কয়েকটি লাইন বিভিন্ন আধুনিক কবিরা কী ভাবে লিখবেন তার প্যারডি। বিভিন্ন পত্রিকার (যেমন 'পূর্বাশা' ও 'চতুরঙ্গ'-র) বিভিন্ন গোষ্ঠি, কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। 'শনিবারের চিঠি' আমার একটি লাইনের প্যারডি করে লেখে "মাঝেরহাট ব্রিজের উপর" (ব্রিজটা বেহালার পথে) "শুনি লম্পটের গুষ্ঠির পদধ্বনি।" "গুষ্ঠি?" মানহানির মোকদ্দমার কথা ঠাকুর্দার কাছে তোলাতে তিনি গায়ের মধ্যে আনলেন না।

দিলীপ রায় পণ্ডিচেরী থেকে কলকাতায় এসে বিদগ্ধ ও সম্ভ্রান্ত সমাজে গানের আসর জমাচ্ছেন। 'বৃন্দাবনে লীলা অভিরাম'। তাঁর সূত্রে ঘরোয়া আসরে গান শুনেছি কেশরবাঈ ও হীরাবাঈ বরদেকারের। নাট্যমঞ্চে তখনো সম্রাট শিশিরবাবু। তবে তাঁর অভিনয় নির্ভর করতো মাদক মাত্রার উপর। 'সীতা' নাটক, প্রথম দৃশ্যে রামের অংকশায়িনী সীতা (শ্রীমতী প্রভা), সিন উঠলো, রাম (শিশিরবাবু ক্লান্ত জড়িত কণ্ঠে বললেন "সীতা, তুমি যদি রাম হতে আর আমি সীতা, তাহলে একটু জিরোনো যেত।" পট নেমে আসত, কিছুক্ষণের জন্য। উদয়শংকর সিম্‌কির আবির্ভাব ঘটেছে। 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' কি সেই দশকের! দুটোর একটিতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন। সিনেমায় সবাক যুগ জাঁকিয়ে বসেছে। একদিকে দুর্গাদাস ও পেসেন্স কুপারের 'কপালকুণ্ডলা', অন্যদিকে প্রমথেশ ও যমুনার 'দেবদাস'। ক্রিকেটে সি. কে. ও সি. এস. নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, মুস্তাক আলি, মহম্মদ নিসার, অমর সিং, ওজারে, অমরনাথ ইত্যাদিরা। ফুটবলে মহমেডান স্পোর্টিং-এর অকস্মাৎ আবির্ভাব ও বিস্ময়কর রেকর্ডের পেছনে হয়তো ছিল স্বাধিকারের প্রাথমিক দাবীর প্রেরণা। মামলা-মোকদ্দমায় ভাওয়াল সন্ন্যাসী ও নলিনী-সুজাতা ও পাকুড় বোধহয় কিছু পরে।

সাহিত্যজগৎ বাদে আমার অন্য আড্ডা ছিল হালকা, তরল। আমার দাদা হোমিওপ্যাথ, ভবানীপুরে মজুমদার ক্লিনিকে সন্ধেবেলায় বসতেন। সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা সেখানে একে একে জমায়েত হতাম। পরস্পরের পকেটের অবস্থা বুঝে গন্তব্যস্থান ঠিক করা হতো। খিদিরপুরের একটা হোটেলে প্রায়ই যেতাম আমরা তিন ভাই অন্য কয়েকজনের সঙ্গে। খেয়াল চাপলে চলে যেতাম ডায়মণ্ডহারবারে বন্ধু রামনারায়ণ সিং-এর গাড়িতে। মজুমদার ক্লিনিকে (এখন অন্য নাম হয়েছে) জমায়েত হবার রেওয়াজ ছিল বহুদিন। এখনো ওদিকে গেলে হঠাৎ মনে হয় দাদা বসে আছেন আমাদের অপেক্ষায়। মজুমদার ক্লিনিককে কেন্দ্র করে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে, কতোজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা নিয়ে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তর্ক হতো। গম্ভীরভাবে তিনি বলতেন ওটা faith cure, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। জিতেন মজুমদার, প্রতাপ মজুমদার, জ্ঞান মজুমদার, দাদা, এঁদের রোগ নির্ণয় ও

আরোগ্য করার অনেক দৃষ্টান্ত জানতাম, বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞেস করতাম পোষা কুকুর ও শিশুরা যে হোমিওপ্যাথিতে দিব্যি সেরে ওঠে সেটাও কি faith cure ? বঙ্কিমবাবু কবিরাজীতে বিশ্বাসী ছিলেন।

পরে, যুদ্ধকালে কলকাতায় বেড়াতে এলে সান্ধ্য আড্ডা বসতো লেকের কাছে দেবু চৌধুরীর ফ্ল্যাটে আর রাসবিহারী এ্যাভেনিউ-গড়িয়াহাটের মোড়ে গুরুদাস ম্যানসনে প্রদ্যোত গুহঠাকুরতার চার তলার ফ্ল্যাটে। ওখানে তাসের রেওয়াজ ছিল, কিন্তু ও-রসে আমি বঞ্চিত।

রাজনীতি সংক্রান্ত সভাসমিতিতে যেতাম মাঝে মাঝে। কোন পার্টিতে কখনো যোগ দিইনি ('অংশগ্রহণ' করিনি), কিন্তু আলোচনাচক্রে বাগবিতণ্ডায় শ্রোতা হিসেবে থাকতাম। তিরিশের শেষের বছরটিতে সাহিত্য ও রাজনীতির একটা যুক্তফ্রণ্ট গড়ে ওঠে, প্রগতি বা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ফ্রণ্ট। প্রকাশ্যে রচনা পাঠ বা বক্তৃতা করা আমার একেবারে আসতো না—অবশ্য নীরব বিপ্লবে বিশ্বাস তার কারণ নয়। ছোট ছোট আড্ডায় সহজ স্বচ্ছন্দবোধ করতাম।

বাবা কম্যুনিস্টপন্থী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী কারণে হিটলার, মুসোলিনির ভক্ত হয়ে পড়েন। বেহালায় পৌর-রাজনীতিতে তাঁর উৎসাহ দেখা যায় সেখানকার জমিদার বাড়ির বীরেন রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে। বেহালার পৌর নির্বাচনে সেজকাকা ছিলেন বিরোধী পক্ষে ; তাঁকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করার একটা প্রয়াসের ফলে বাগানবাড়ি ও ঠাকুর্দার বাড়ির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আমরা 'ছোটরা' অবশ্য জমিদার বাড়ির পক্ষে ছিলাম না, যদিও মাঝেসাঝে ওখানে যেতাম। কী কারণে জানি না আমাদের বাগানবাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়। (বাগানবাড়ি হাত বদলায়—প্রথমে 'কোকোলা' কম্পানি, যুদ্ধের সময় রয়াল এয়ার ফোর্স এবং বর্তমানে নাকি সি. আর. পি. শিবির)। কলকাতায় প্রথমে আসি বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে, পরে বিষ্ণুবাবু প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে একটি বাড়ি ঠিক করে দেন, একটা বাড়ি পরেই পুকুর পারে তিনি নিজে থাকতেন। দিল্লী না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে নৈকট্য এবং অন্যান্য কারণে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে রাজনীতি নিয়ে বাবার সঙ্গে ক্রমাগত বচসা-বিতর্ক হতো ; হিটলার মুসোলিনির হাতে ইংরেজরা অপদস্থ হলে আমরা বিচলিত বোধ করতাম না, কিন্তু নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট আন্দোলনে আমাদের সমর্থন ছিল না। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষ বোসের বিরোধে আমরা ছিলাম সুভাষবাবুর পক্ষে। কিন্তু সুভাষবাবু সাম্যবাদ ও ফ্যাসিজম্-এর একটা সমন্বয়ের কথা তোলেন। অন্যদিকে নেহরু অক্লান্তভাবে হিটলার মুসোলিনির বিরোধিতা করেন—সে কারণে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নেহরুর প্রতিপত্তি প্রখর ছিল। বাবা ফরোয়ার্ড ব্লকের অনুরাগী হন। মাঝে মাঝে আমাদের মতান্তর এমন স্তরে পৌঁছতো যে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকার কথা ভেবেছি।[১] অবশ্য এটা নয় যে আমি সক্রিয় কর্মী ছিলাম। আমার গণ্ডি সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডি

কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ১৯৪২-এ ছুটিতে কলকাতায় এসে রাত্রে বিমান আক্রমণের হুঁশিয়ারি বাজলে আমরা ছাদ থেকে নেমে যেতাম, বাবা নামতেন না ; বোধহয় কলকাতার আকাশে জাপানী বোমারু বিমানের আগমন তিনি অপছন্দ করতেন না। যুদ্ধশেষে তিনি শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার দিকে ঝোঁকেন। চল্লিশের দশকে একটি উপন্যাস ('মর্মান্তিকা') লেখেন, যার গদ্য এখন বিস্ময়কর লাগে। একজন অভিনেত্রী নিয়ে কানাঘুষোর উল্লেখ করে নিজেই আমাকে বলেন, তাতে তো সংসারের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। ওঁর সামনে আমাদের ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু নিজের সিগারেট ফুরিয়ে গেলে আমাদের কাছ থেকে নিতেন। আত্মজীবনী লিখলে বাবা বঙ্গদেশের বিচিত্র পাঁচ'ছ দশকের পরিচয় রেখে যেতেন। শেষ দিকে আমার সঙ্গে দেখা এত কম হতো যে কয়েকবার আমার পরিচয় দিতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্মৃতি বিভ্রম হতো না।

সংক্ষেপে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে ফিরে যাই, কেননা তিরিশের দশক শেষ হবার পর আমি কলকাতা ছাড়ি।

স্কটিশে রাজনৈতিক আন্দোলন মাঝে মাঝে কিছুটা হতো, তবে উল্লেখ করার মতো নয়। ওখানে পড়াশোনার মান কতো উঁচু বুঝতে পারি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে। কলেজে ইংরেজিতে শিক্ষক হিসেবে নাম ছিল মোয়াট্, বি. বি. রয়, সুশীল দত্তের, বিশেষ করে প্রথম দু'জনের। কলেজের অধ্যক্ষ আরকার্ট দর্শন পড়াতেন। বাংলায় সুধীর দাশগুপ্তের বাঙাল উচ্চারণ সত্ত্বেও ক্লাশে টুঁ শব্দটি হতো না। প্রথম দিকে চেষ্টা হয়েছিল। 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পাঠের সময় (ক্লাসে মেয়েরা বর্তমান) একটি ছাত্র অতি সরল মুখে প্রশ্ন করলো, "স্যার, উচ্চ কুচযুগ মানে ?"—"Get out of the class." একটি ছেলেকে দলের পাণ্ডারা বারবার বলতো "তোর moral courage নেই, নইলে ···ক'র গায়ে গায়ে হাত দিতিস।" শেষ পর্যন্ত ছেলেটি (দেবী ভট্টাচার্য) moral courage দেখালো। মেয়েটি অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করাতে অধ্যক্ষ শেষ পর্যন্ত বলেন এত স্পর্শকাতর হলে বেথুন কলেজে ভর্তি হওয়া উচিত। বাবার ক্লাসে খুব হৈ চৈ হতো। তবে শিক্ষকেরা শাসন করলে 'পথে কুকাজ ক'রে চোখ রাঙানো'র মানসিকতা ছাত্রদের মধ্যে ছিল না। কয়েকবার রাস্তায় 'হরিবোল' শুনে সরোজ দত্ত দাঁড়িয়ে উঠে বাবাকে জানালেন, "স্যার্, আর একজন রাঁড় হলো।' ক্লাস থেকে তিনি বাহস্কৃত হলেন ; বাবা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন যে 'রাঁড়' এর আর একটা অর্থ বিধবা—"রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট"। (ভারতচন্দ্র)

কয়েকজন ছাত্র এবং একটি ছাত্রী মিলে দ্বিমাসিক বের করা হল, নাম Today। পাঁচ সংখ্যা বেরিয়েছিল, শেষ সংখ্যায় পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হওয়াতে আরকার্ট আমার উপর অসম্ভব চটে গিয়ে কৈফিয়ত তলব করেন (ও-সংখ্যাটির প্রকাশকালে আমি ছিলাম বর্মায়) ;

উপ-অধ্যক্ষ ক্যামেরন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মালমশলা যারা বানায় তারা 'কিছু' দিয়েছিল কিনা? যাহোক তখন আমরা কলেজের এক্তিয়ারের বাইরে বলে কর্তৃপক্ষ অসহায়। আমাকে সন্দেহ করার একটা কারণ—পত্রিকায় মার্কস লেনিনের মন্তব্য আমার প্রবন্ধে থাকতো, অবশ্য তাঁদের নামোল্লেখ না করে—কেননা তখনকার দিনে মার্কস লেনিন ইত্যাদির বই দেখলে পুলিশের বিষ নজরে পড়তো লোকে। সেইজন্য হয়তো ছাত্ররা বেশি করে তাঁদের লেখা পড়তো। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মান উঁচু ছিল না। Extra-mural ক্লাস যাঁরা নিতেন—তাঁদের কথা আলাদা; প্রেসিডেন্সির প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (প্রফুল্লবাবুর মতো অধ্যাপক দেশ-বিদেশে বিরল), রিপন কলেজের রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, স্কটিশের মোয়াট্, প্রথমে প্রেসিডেন্সি ও পরে রিপনের হামফ্রি হাউজ, সেণ্ট পলসের মিলফোর্ড। দু-একজন সত্যিকার জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতের ক্লাসে বড়ো গণ্ডগোল হতো, তাদের উচ্চারণের দোষে। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক, ছ'মাস এখানে ছ'মাস অক্সফোর্ডে। ছেলেদের কমনরুম ছিল না বলে করিডরে ধূমপান করতাম, কিন্তু রাধাকৃষ্ণণকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ফেলে দিতাম। দুর্ভাগ্যবশত তারক সেনের Criticism-এর ক্লাসে যাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একতলায় দোকানপাট, কেমন যেন দমবন্ধ করা আবহাওয়া, সর্বদা যানবাহনের শব্দ। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যেতাম বসন্ত কেবিনে। ক্লাসে রোলকলের পর বেরিয়ে এসে দুবার গণ্ডগোলে পড়ি। প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালে বললাম তিনি তিনটে থেকে ক্লাস শুরু করে কখন শেষ করেন তার ঠিক নেই। ভয়ানক খিদে পায় ব'লে বেরিয়ে যাই। প্রফুল্লবাবু আরও বেশি করে খেয়ে আসতে বললেন। শিলঙে আমাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতেন সেটার উল্লেখ করলেন। অধ্যাপক মিলফোর্ড (যাঁর স্ত্রী 'নক্সীকাঁথার মাঠ' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন) ক্লাস ফাঁকি দেবার কথা না তুলে চা খাওয়ালেন।

পরীক্ষায় তখন ভালো করতো প্রেসিডেন্সি ও স্কটিশ। রিপন কলেজে পড়াতেন অনেক সাহিত্যিক-অধ্যাপক—বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে (হীরেন মুখোপাধ্যায় ও প্রমথ বিশী?) প্রেসিডেন্সির পরিবেশ ছিল বনেদী। তুলনায় স্কটিশ চার্চ কলেজ ছিল গণতান্ত্রিক, নানা শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আসতো স্কটিশে। মাঝে হেদো, ওপারে দেয়াল-ঘেরা বেথুন কলেজ, রহস্যে আবৃত। হেদোতে বসতো 'খিস্তলজি'র (খিস্তিখেউড়ের) ক্লসে, প্রফেসর ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য। বেশভূষায় ট্রাউজার্সের চল একেবারে ছিল না, ছেলেরা পরতো ধুতি ও পাঞ্জাবি বা সার্ট। ট্রাউজার্সের চল্ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।

১৯৩৪-এ আই. এ., আই. এস-সি. মিলিয়ে স্কটিশ থেকে প্রথম হন কৃষ্ণদাস গুপ্ত, প্রেসিডেন্সি থেকে অশোক মিত্র হন দ্বিতীয়। ১৯৩৬-এ, বি.এ.-তে স্কটিশ, দর্শন, অর্থনীতি ও ইংরেজিতে প্রথম হয়। দর্শনে শ্রীমতী

নলিনী চক্রবর্তী ঈশান স্কলারশিপ পান, অর্থনীতিতে প্রথম হন অনিলা (আইলিন) বনার্জি, ডবলিউ. সি. বনার্জির পৌত্রী। অনিলারা চার বোন, মৃণালিনী, শীলা, অনিলা নিজে ও ইন্দিরা। কেউ বাঙালি বিয়ে না করাতে মাঝে মাঝে ক্ষোভ হতো। একবার সুধীনবাবু ও শীলার বিয়ে হতে পারে বলে রব উঠেছিল।

১৯৩৪-এর শেষের দিক থেকে হাতে মাসে মাসে ছাত্রবৃত্তির টাকা আসায় গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটিতে ও মাঝে মাঝে ডিসেম্বরে বাইরে যেতাম। সবচেয়ে দীর্ঘ যাত্রা হয়েছিলো বর্মায়, প্রায় দুমাস। সহযাত্রী ছিলেন সহপাঠী দেবী ভট্টাচার্য ও অজিত মুখোপাধ্যায়। যাতায়াত জাহাজের ডেকে। তখন পাশপোর্ট লাগতো না! রেঙ্গুনে সাতদিন কাটিয়ে যাই মেমিওতে, ছোটখাটো সুন্দর হিল স্টেশন; সেখানে ছিলাম মাস দেড়েক। মাঝে ওখান থেকে মান্দালয়ে গিয়ে হপ্তাখানেক কাটাই, মান্দালয় ফোর্টে। সব মিলিয়ে ব্রহ্মদেশ বেশ লেগেছিল, প্রায় মনস্থির করেছিলাম যে ওখানে একটা চাকরি পেলে থেকে যাবো। দেবী (যাঁর কাকার বাড়িতে উঠেছিলাম) ও আমি, দিনের পর দিন গ্রামাঞ্চলে ঘুরতাম, তৃষ্ণার্ত হ'লে 'জেরবাদী' ছেলেমেয়েরা গুড় দিয়ে চা খাওয়াতো। একবার গিয়েছিলাম আমেরিকানদের তৈরি গোটিক্ ব্রিজে, আমার এক বন্ধুর স্ত্রী যিনি বহুদিন মেমিওতে ছিলেন, তিনি বলেন আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেটা ওয়েস্টউইন (যুদ্ধের সময় ব্রিজটা আমেরিকানরাই আবার বোমা ফেলে ভাঙে)। ওখান থেকে চীন সীমান্তের দিকে, ল্যাশিও খুব দূরে নয়। গোটিকে ট্রেন থেকে নেমে দেখলাম দিগদিগন্ত মেঘে ঝাপসা-ধূসর, যেন একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের আশংকায় স্তব্ধ! তারপর নামলো প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। পাহাড়ে ঝড়বৃষ্টি মনে একটা আদিম ভয় আনে। দিশেহারা অবস্থায় নিচে নেবে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অফিসে পৌঁছিয়ে ওখানকার এঞ্জিনিয়ার, এ্যাংলো-বার্মিজ এডউইনের সঙ্গে আলাপ হ'ল। নিঃসঙ্গ থাকতেন ভদ্রলোক, কিন্তু তার জন্য কোন ক্ষোভ নেই। ডিম পাউরুটি চা খেয়ে ঘণ্টা দেড়েক পরে বিদায় নিলাম। শুনেছি যে জাপানীরা বর্মায় এগোবার পর ভারতের পথে বনে-জঙ্গলে এডউইন মারা যান। কী কারণে কোন কোন মানুষের নাম এত দিন মনে থাকে জানি না। অবশ্য অরণ্যে একলা থাকার একটা ভারতীয় সুলভ টান আমার অনেকদিন ছিল। খুব সম্ভব 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখার পর মোহ মুক্ত হই। 'জনঅরণ্যে' থাকা ভালো।

আর একবার প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রথীন মৈত্র ও আমি, পুরীতে, স্বর্গদ্বার থেকে কিছু দূরে শালবন থেকে ফেরার পথে। অন্ধকারে বালির চাবুক, দ্রংষ্টাকরাল সমুদ্র যেন আমাদের গ্রাস করতে আসছে। একটা পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিই। সে বছরে বিষ্ণুবাবু সপরিবারে পুরীতে ছিলেন। চঞ্চল বোধ হয় আমাদের আগেই কলকাতায় ফিরে যায়। পুরীর ঝড়ের কথা দেখা হলেই জ্যোতিরিন্দ্র স্মরণ করতেন—মৃত্যুর কিছু দিন

আগে পর্যন্ত। জ্যোতিরিন্দ্রদের বাড়িতে ইয়েট্‌স্‌-এর সুধীনবাবু অনূদিত Resurrection নাটকের মহড়ায় কয়েকবার গিয়েছি। ঠিক কবে মঞ্চস্থ হয় মনে নেই।

যৌবনে সাঁওতাল পরগনার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। দূরে ধূসর পাহাড় সাঁওতালদের পরিচ্ছন্ন বসতি, মহুয়ার গন্ধ, মাদলের শব্দ, ভোরে মুরগির ডাক। মধুপুর-গিরিডি লাইনে মহেশমুণ্ডায় গিয়েছিলাম কয়েকবার। রামনারায়ণ সিং-এর বাংলোয় থাকতাম। সেখানে নাকি একদা লর্ড কার্জন উঠতেন। গিরিডি ঘিঞ্জি, একবার মাসখানেক ছিলাম। জামতারায় কয়েকবার গিয়েছি। দেবী ভট্টাচার্যের বাবা স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করে ওখানে বছর দুই ছিলেন। দেবীর ছোট বোন অপর্ণা কথাবার্তায়, ব্যবহারে বেশ সপ্রতিভ। চেহারা ও রঙের কথা উঠলে বলতো আমাকে দেখতে ছাল-ছাড়ানো মুরগির মতো। অপর্ণার প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল।

ওসব অঞ্চলে রাতের আকাশ গভীর, স্বচ্ছ ও বিরাট মনে হতো। অল্প বয়সের সাঁওতাল মেয়েরা তো খোদাই করা সৃষ্টি, তবে ধারে কাছে ঘেঁষতাম না, ছেলেরা বড়ো জঙ্গী। খনি অঞ্চলে কিন্তু দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল ওদের চিরাচরিত জীবনযাত্রায়।

দু-তিনবার গিয়েছি রংপুর জেলার গাইবান্ধা থেকে দশ-বারো মাইল দূরে বার্‌বলদিয়া গ্রামে। ট্রেনে গাইবান্ধা, সেখান থেকে সাইকেল বা গরুর গাড়িতে। বার্‌বল্‌দিয়ার জমিদারির (কাশিমবাজারের) নায়েব ছিলেন পিসেমশাই। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে শচীন সেন প্রায় আমার বয়সী, বেহালায় আমাদের বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন। ইতস্তত বিচ্ছিন্ন মাটির ঘর সদর অন্দরের ব্যবধান বজায় রাখতো বার্‌বলদিয়ার। মাইল খানেক দূরে বিরাট ব্রহ্মপুত্র, ওপারে নীলচে পাহাড়ের সারি। আশি বছরের মুসলমান বরকন্দাজের সঙ্গে ঘুরতাম, গাদা-বন্দুক দিয়ে পাখি শিকারে তার অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল। আমাদের কাজ কাদামাটি ভেঙে পাখিগুলো কুড়োনো। একবার পিকনিকে গিয়ে চড়ায় নৌকো ভিড়িয়ে দেখলাম কয়েকটা রোদ-পোয়ানো কুমিরছানা তড়তড় ক'রে জলে নেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে সেখানে নামতে হ'ল স্নানের জন্য। সঙ্গে মেয়েরা ছিল। জ্বর জ্বর ভাব হয়েছে বলতে পারিনি।

শচীনের বিয়েতে খুলনা হয়ে একবার গিয়েছিলাম মাদারিপুরের একটা গ্রামে। স্টীমার, নৌকো, হণ্টন, তারপরে বরপক্ষের সাময়িক আস্তানা। সেখান থেকে কনের বাড়ি জলপথে ছ-সাত ঘণ্টা। পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। কন্যার বাবা ছোটখাটো ভারিক্কি জমিদার, গ্রামের একটি মাত্র বড়ো পাকা বাড়ি তাঁর। চন্‌চনে খিদে, কিন্তু শুনলাম ওখানকার নিয়ম বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বর-যাত্রীদের স্বপাক। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি, শেষ পর্যন্ত বিরাট ছাদে আমাদের পংক্তিভোজনে বসালেন বটে জমিদার, কিন্তু পরিবেশন এত মন্থরগতি ছিল যে আমরা সহোদর ও একজন জ্যাঠতুতো ভাই না খেয়ে সেই রাত্রেই নৌকোযোগে

গ্রামত্যাগ করলাম। ভেবেছিলাম বর আমাদের হয়ে প্রতিবাদ করবে, কিন্তু সে আসনে নির্বাক বসে রইলো। সারা রাত খিদের জ্বালায় নিসর্গ শোভা উপভোগ করা হয়নি। তাছাড়া আমাদের জল-ডাকাতের ভয় দেখানো হয়েছিল। সেবার কিন্তু পূর্ববঙ্গের পরিচ্ছন্ন সবুজ সমৃদ্ধ গ্রামগুলি দেখে (বাইরে থেকে) 'সোনার বাংলা' কথাটা বেমানান লাগেনি। দূর থেকে ঝাপ্‌সা বরিশাল দেখে বুঝতে পারি জীবনানন্দ কেন ও-ধরনের কবিতা লেখেন।

ঢাকা কখনো যাইনি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে হতো ঠাকুর্দার আদি-বাড়ি মানিকগঞ্জের সুয়াপুর গ্রামে একবার গেলে হয়, ওখানে ওর একটি মূর্তি বা স্মারক স্থাপিত হয় পূর্ব পাকিস্থান সরকারের আমলে।

তিরিশ দশকের শেষে প্রায় যেতাম কৃষ্ণনগরে, দেবীর বাড়িতে। ওখানে যাওয়া নিয়ে অনেকে পরিহাস করতেন। কৃষ্ণনগরে আলাপ হয় কম্যুনিস্ট নেতা গদাদা (অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়) ও সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গদাদার স্তালিন-মার্কা গোঁফ ছিল। সুশীলবাবু ছিলেন বিরল কেশ। ওঁদের সঙ্গে একবার মার্চের প্রখর রৌদ্রে কয়েক ক্রোশ ভেঙে হেঁটে যাই একটি কিষাণ সভায়। মাটিতে শাল পাতায় খেতে ব'সে শুনলাম বক্তাদের মধ্যে আমার নাম। অন্যরা তখন ব্যস্ত, সরে পড়ি। পথ চিনতাম না, তার ওপর কালবৈশাখী নামে, অনেক ঘুরে কৃষ্ণনগরে যখন ফিরি তখন বেশ রাত।

১৯৩৬-এ অক্টোবরের মাঝামাঝি দার্জিলিঙে যাবার উদ্যোগ হ'ল সস্ত্রীক বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে। সে যুগে অক্টোবর থেকে দার্জিলিঙে off season, অর্থাৎ খুব সস্তা। বুদ্ধদেববাবু সে বছর সরকারী অনুমতি পাননি, পূর্ববঙ্গীয়রা তখন সন্ত্রাসবাদী বলে গণ্য হতো। তার আগে লেবঙ্গের ঘোড়-দৌড়ের মাঠে গভর্নরের প্রাণহানির চেষ্টা করেছিলেন উজ্জ্বলা। কিছুটা ফ্যাসাদে আমিও পড়েছিলাম। বেহালায় ওঠেন একটি পরিবার—স্বামী-স্ত্রী, জোয়ান ছেলে ও একটি মেয়ে। বাবার অনুরোধে মেয়েটিকে পড়াতাম সপ্তাহে দু-একদিন। পরে শুনলাম লেবঙ্গে যাবার আগে উজ্জ্বলা দু-একদিন ওঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। ফলে ভাইবোন গৃহে অন্তরীণ হলেন, আমাকে দুবার যেতে হলো আলিপুরে পুলিশের কাছে। মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিয়ে কয়েকটি সরস মন্তব্যের পর কলেজে সহপাঠীদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হ'ল। দু-একজনের নাম চেপে যাই, কিন্তু দেখলাম পুলিশ ঠিক তাদের কথা তুললো।

পুলিশের কথা যখন উঠেছে তখন অনেক পরেকার একটি ঘটনার কথা এখানে সেরে রাখি। খুব সম্ভব ১৯৭৩-র শীতকালে ভোর চারটে নাগাদ দরজায় প্রবল করাঘাত ও চীৎকার ? জানালা দিয়ে দেখলাম ছোট পাঁচিলে চার পাঁচজন পুলিশ উঠেছে। কোনোক্রমে জামাকাপড় গায়ে দিয়ে বিরক্তভাবে দরজা খুলে দেওয়াতে দুজন ঘরে ঢুকলেন। কয়েক মিনিট পরে বুঝলাম আমার খোঁজে নয়, আমার এক ভাইপোর খোঁজে এসেছে। ভাইপোর ঠিকানা জিজ্ঞেস

করাতে বললাম কাছের যে বাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত সে বাড়ির ঠিকানা নিয়ে লোকে মাথা ঘামায় না। পুলিশ এতে অতীব বিস্ময় প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব করলো যে তাদের গাড়িতে গিয়ে বাড়িটা চিনিয়ে দিই। ও কাজ আমার দ্বারা হবে না—তিন চারবার বলাতে অবশেষে টেলিফোন ডিরেকটরি থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে পুলিশ বাহিনী দুটো কালো ভ্যানে প্রস্থান করলো। রাস্তা ফাঁকা হবার হঙ্গে সঙ্গে দাদাকে ফোনে খবর দিলাম। খানা-তল্লাশির জন্য ঘন্টাখানেক সময় দিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী দাদার ওখানে হাজির হয়ে শুনলাম পুলিশ হানা দেয়নি। শীতের শেষ রাতে ইয়ার্কির মানেটা এখনো বুঝিনি।

ঘটনাটা চেপে গেলাম, কেননা জানাজানি হলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ নিয়মিত লেখকদের দু-একজন হয়ত ঘাবড়ে যেতেন। ঘনিষ্ঠ দু-একজন বললেন শেষরাতে একজন সম্পাদককে ও-ভাবে হয়রান করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত। যখন জেলে, পুলিশ ভ্যানে, রাস্তাঘাটে কিশোর ও যুবক হত্যা রেওয়াজ তখন সম্পাদকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য প্রতিবাদ ?

*

১৯৩৮-এ এম. এ পাশ করে কিছুদিন দোটানার মধ্যে ছিলাম। আগের বছর নির্বাচনে বঙ্কিমবাবুর পক্ষে আসানসোলে গিয়ে সক্রিয় রাজনীতির প্রতি ঝোঁক হয়েছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেষ্টা করবো কিনা গভীরভাবে চিন্তা ক'রে ঠিক করলাম আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না। বক্তৃতা আমার একেবারে আসেনা, তার চেয়ে মাঝে মাঝে 'বিপ্লবী' কবিতা লিখলে ও পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে বিবেক সাফ থাকবে। আমাকে কর্মী হিসেবে নিলে পার্টি বিশেষ কোন লাভ হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুবছর একটি বৃত্তি নিয়ে বলতে গেলে কিছু না ক'রে (সবশুদ্ধ বারো পাতা লিখেছিলাম) সময় কাটালাম। অধ্যাপক রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি জানালে বলতাম আমার প্রয়োজনীয় বইপত্র জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণে সমুদ্রের অতলে চলে যাচ্ছে, আমি কী করতে পারি ? বৃত্তির মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে আসাতে চাকরির চেষ্টা শুরু করলাম। কলকাতায় বিশেষ সুবিধে হবেনা, তবু দু-একবার প্রয়াস করেছি। রংপুর কারমাইকেল কলেজের একটি অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করলে ওখানে সুবিধে হবে শুনলাম। মেয়ে ও মা'কে একসঙ্গে দেখে মা'কে বেশি পছন্দ হলো। রংপুরের চেষ্টা তাই করিনি। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে আই. এস-সি-র ছাত্রদের জন্য ইংরেজি ক্লাস চালু হবে শুনে দরখাস্ত করি। ইণ্টারভিউ নিলেন দুজন, কলেজের অধ্যক্ষ ও একজন অচেনা দীর্ঘকায় ভারিক্কি বলিষ্ঠ ব্যক্তি। দরখাস্ত প'ড়ে দীর্ঘকায় ভদ্রলোক বললেন 'একে

নিয়ে নাও'। অধ্যক্ষ আপত্তি জানালেন—আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। জিজ্ঞেস করলাম চাকরি না পেলে অভিজ্ঞতা কী করে হবে? দীর্ঘকায় ব্যক্তি আবার অসহিষ্ণুভাবে বললেন আমাকে নিয়ে নিতে, অধ্যক্ষ মৃদুকণ্ঠে আপত্তি করাতে অচেনা ভদ্রলোকটি অধৈর্যভাবে বললেন, 'পরের প্রার্থীকে ডাকো তাহলে'। পরে জানলাম অধৈর্য ভদ্রলোকটি বিধানচন্দ্র রায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার খবর দিলেন আশুতোষ কলেজে দরখাস্ত করলে চাকরি হয়ে যাবে। ইণ্টারভিউর সময় এগিয়ে এসেছে, শুনলাম 'শনিবারের চিঠি' থেকে আমার কবিতার কিছু নমুনা বোর্ডের সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বোর্ডে ছিলেন প্রায় ১৪ জন—শ্যাম্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, জে. পি. নিয়োগী, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিরা। কবিতার কথা একবার ওঠে। পরে চাকরিটা হ'ল না কেন রেজিস্ট্রারকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন আমি যে অশ্লীল কবিতা লিখি তাঁর জানা ছিলনা। কবিতার সঙ্গে অধ্যাপনার কি সম্পর্ক? রেজিস্ট্রার বললেন, "বাবা, ওখানে কচি মেয়েরা পড়ে…" ওখানে সকালে মেয়েদের ক্লাস নিতে হতো শুনে চাকরি না পাওয়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

শেষ পর্যন্ত গেলাম কাঁথিতে, প্রভাতকুমার কলেজে। ১০০ টাকা মাইনে, ছিলাম মাস দুয়েক, অগস্ট-সেপ্টেম্বর। কাঁথির কলেজ ছিল বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির শুরুতে, সে বালিয়াড়ি নাকি গিয়েছে বালাসোর পর্যন্ত। বালি ভেঙে যেতাম কলেজে। চাঁদের আলোয় বেড়াতাম ফাঁপমনসাকীর্ণ বালিয়াড়িতে। বেশ রাতে কানে আসতো সমুদ্রের ক্ষীণ শব্দ। কাঁথি থেকে দীঘা ও কপালকুণ্ডলা'র জুনপুট খুব দূরে নয়। ছোট কলেজে দলাদলি ছিল খুব। এসবে নাক না গলিয়ে একটি শান্তিপ্রিয় অধ্যাপক বালিয়াড়ির ছোট বাড়িতে টিমটিমে আলোয় সন্ধেবেলায় বেহালা বাজাতেন। তাঁর ওখানে ভালো লাগতো। থাকতাম বাজারের কাছে একটি দোতলা ঘরে—এক কালে বোধহয় গুদাম ছিল, ঘরটা অতিশয় লম্বা, রাস্তার উপরে এক ফালি বারান্দা। আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল শুধু একটা 'আরামকেদারা'। একটা গড়গড়া সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। দু-মাসের মধ্যে একবার বন্যা নেমেছিল, একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম, দুই বন্ধু বেড়াতে এসেছিলেন—কামাক্ষীপ্রসাদ ও পরে তাঁর ছোট ভাই দেবীপ্রসাদ।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমার হাবভাব গতিবিধি দেখে বলতেন—এখানে বেশিদিন টিকবে না, bird of passage।

*

কাঁথি থেকে কলকাতায় এসে দিল্লী রওনা হই অক্টোবর, ১৯৪০-এ। রাজধানীতে উঠি আগ্রা হোটেলে। মাসিক ভিত্তিতে ছিলাম, সব মিলিয়ে মাস শেষে ৪৫ টাকা, গরম পড়লে সেটা ৩০ টাকায় দাঁড়াবে শুনলাম। হোটেল থেকে কলেজ

মিনিট চারেকের পথ। কম্যস্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীশৈলেশ্বর সেন প্রথম সাক্ষাতে আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, একে রোগা, তায় পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, ক্লাসে গণ্ডগোল হবে। তক্ষুনি কোট-প্যাণ্ট কেনার পয়সা বা ইচ্ছে ছিল না, ঠাণ্ডা তো পড়েনি। ক্লাসে দু-তিনটি ছাত্র শুনলাম ছেলেমেয়ের বাবা, তবে দুর্ধর্ষ নয়।

বাবা সম্ভবত ১৯১৫ সালে সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে পড়িয়েছিলেন। মা'র সূত্রে কয়েকটি আত্মীয়-পরিবার দিল্লীর প্রবাসী বাঙালি। তাঁদের নাম ধাম দিয়ে বাবা বলেছিলেন, "দ্যাখ, পাঁচুর (হরিপ্রসন্ন সেন) ওখানে যাস না, পাঁচু বড়ো দাম্ভিক। হোটেলে গুছিয়ে বসে পাঁচুবাবু বাদে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করলাম। দরিয়াগঞ্জে থাকতেন তাঁরা। ডাক্তার রামবাবু (জয়পুরে একদা দেওয়ান সংসারচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র) থাকতেন ন-নম্বরে, স্ত্রী ও দুই ছেলে। ফোর্ট এলাকা বলে ও-পাড়ায় বেশির ভাগ বাড়ি একতলা। ন-নম্বরের সামনে অনেকটা জমি, পিছনে ভাঙা দিল্লী প্রাচীরের নিচে বেলা রোড। রামবাবুর বড়ো ছেলে নিখিল সেনের সঙ্গে পরিচয় ছিল ওখানকার বিদগ্ধ সমাজের ও টাঙ্গাওয়ালাদের। এক মারাঠি ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেন, বছরখানেক পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। নিখিলদার আসরে বিচিত্র ভিড় জমতো। উত্তর ভারতের অনেক বুদ্ধিজীবী ন-নম্বরে উঠতেন। নেহরু পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল। সন্ধেবেলায় গাড়ি নিয়ে বেরতেন না নিখিল সেন। দু-একটা দুর্ঘটনার পর তিনি বলতেন সূর্যাস্তের পর রাস্তায় গাছগুলো তাঁর গাড়িতে ধাওয়া করে। টাঙ্গায় চেপে নিখিলদার সঙ্গে মাঝে মাঝে যেতাম দিল্লী স্টেশনের স্পেন্সারস হোটেলে, সেখানে খাদ্য ও পানীয় সস্তা ও নির্ভেজাল। জাপানীরা যুদ্ধে নামার পর নিখিল সেন রেড্‌ক্রসের Assistant Commissioner for Iraq and Iran হয়ে বিদেশে যান। যুদ্ধশেষে UNRAA ও ১৯৪৭-র পর দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য, সম্ভবত নেহরুর প্রেরণায়, যোগ দেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারে। প্রথম যৌবনে পড়তে গিয়েছিলেন অকসফোর্ডে ও কেমব্রিজে, থাকতেন প্যারিসে, পিতৃদেবের অজ্ঞাতসারে। সাংবাদিকতায় হাত পাকিয়ে দেশে ফিরে বোধহয় একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থায় যোগ দেন। ঘটনাস্থলে না গিয়ে কয়েকটি উটকো খবর দেওয়াতে কিছু গণ্ডগোল হয়। তখন সাংবাদিকতা ছেড়ে দিয়ে মন দেন সাহিত্যরচনায়, ইংরেজিতে। লেখায় বেশ হাত ছিল। কলকাতায় এসে কিছুদিনের মধ্যে বুঝলেন যে এ-দেশে উদ্বাস্তুদের জন্য কিছু করা অসম্ভব, তাই অফিসের পর আড্ডায় সময় কাটাতেন। আড্ডায় আসতেন বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন প্রকৃতির নারী পুরুষ। বেশভূষার ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে শরীরে অযথা কিছু চাপাতেন না। আড্ডায় অনেকদিন দেখেছি খালি গায়ে, ছোট্ট একটা আণ্ডারয়ার পরে আছেন। একবার বেশ ভোরে আগের সন্ধ্যায় ফেলে আসা বর্ষাতি ও মানিব্যাগ আনতে

গিয়ে দেখি একেবারে দিগম্বর হয়ে দাড়ি কামাচ্ছেন। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন—জিনিসপত্র এমনভাবে ফেলে যাওয়া ভালো নয় ইত্যাদি। নিখিল সেনের সঙ্গে শেষ দেখা হাওড়া স্টেশনে, ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারিতে, মস্কো যাবার পথে কাল্‌কা মেলে ওঠার আগে। সেই বছরে তিনি মারা যান। নিখিল সেনের মতো জাতি শ্রেণী ধর্ম নির্বিশেষে মিশুকে লোক কম দেখেছি।

দরিয়াগঞ্জে ভাড়া ফ্ল্যাটে থাকতেন আদুবাবু (রাসবিহারী সেন), দিল্লীতে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মালকোচা দিয়ে ধুতি পরা, স্বদেশী, গোঁড়া ভদ্রলোকটি পরোপকারের জন্য উপস্থিত হতেন সর্বত্র, বিয়ে থেকে নিগম্‌বোধ ঘাট পর্যন্ত।

হোটেলের খরচা বেশি বলে আদুবাবু আমার জন্য ছোট্ট একটা বাড়ির অংশ ঠিক করে দেন, বাড়িটা রামবাবু সহোদর 'দাম্ভিক' ডাক্তার পাঁচুবাবুর বাংলো থেকে আধ-মিনিটের পথ। পিতৃ-আজ্ঞায় তখনো ওমুখো হইনি।

একটি সন্ধ্যায় হানা দিলাম দরিয়াগঞ্জের কেমব্রিজ স্কুলে। ধূর্জটিপ্রসাদ আমাকে দুজনের নামঠিকানা দিয়েছিলেন, লখ্‌নৌ-এ মানুষ, ওখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। ঘরে ঢুকে দেখলার সেই সন্ধেয় একজনের সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে, চোখ তখনো লাল। নাম অমিতাভ সেন (খুচু)। অন্যজন জ্যোতির্ময় লাহিড়ী—ওরফে জুট্‌লু (ওস্তাদ চিন্ময় লাহিড়ীর সতাতো ভাই)। আলাপ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুচু জানালো আমার কবিতা তার ভালো লাগে না। তৎক্ষণাৎ আমার সংকোচ কেটে গেল। উর্দু ও ইংরেজিতে খুচুর দখল ছিল স্বচ্ছন্দ, বিলিতি ও 'মোগলাই' আদব-কায়দায়, বিশেষ করে ওয়াজেদ আলি শার রেওয়াজে, সমান দুরস্ত। সাহিত্য-দর্শন আলোচনায় এত সূক্ষ্ম স্তরে উঠে যেতো বিশেষ একটা সময় যে বিভ্রান্ত লাগতো। জুট্‌লু বেশি কথা বলতো না, যদিও সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে তার দখল কম ছিলনা। মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতো, তাদের 'মশাই', বলে সম্বোধন করতো। খুচু ছিল মেয়েদের বিষয়ে অতি আগ্রহী, সেক্‌স্‌ নিয়ে তার নানা তত্ত্ব ছিল, ছিল প্রয়োগের চেষ্টা। খুচু ও জুট্‌লুর মাধ্যমে আর একজনের সঙ্গে আলাপ হ'ল, 'খুড়ো' বলে সুপরিচিত (ডি. পি. সেন)। বয়স নির্বিশেষে সবারি 'খুড়ো', তার কারণ কিন্তু তাঁর বয়স নয়। যাঁরা এখনো বর্তমান তাঁদের বিষয়ে লেখা আমার বাঁধে, সেজন্য ওঁর বিষয়ে কিছু লিখছিনা। তবে খুড়ো ছাড়া দিল্লীর কথা ভাবতে পারি না।

আদুবাবুর বন্দোবস্ত করে দেওয়া বাড়িতে খুচু ও আমি থাকতাম। লাহিড়ী কিছুদিন পরে স্কুল ছেড়ে কাশ্মীরি গেটের একটা মেসে উঠে গেল। আমাদের খণ্ড বাড়িটার ভাড়া ছিল ১৮ টাকা, মাসকাবারি মুদির বিল হতো প্রায় ৩৪ টাকা, তার মধ্যে সিগারেট খরচা ছিল ২২ টাকার কাছাকাছি, দু'জনে মিলিয়ে। কলেজে প্রথমে মাইনে পেতাম ১০০ টাকা। ১২ নম্বর দরিয়াগঞ্জের

কথা ভোলা কঠিন ! কনকনে ঠাণ্ডায় অনেক রাত্রে খুচু, জুটলু ও আমি কোন আলোচনার সূত্র টেনে যেতাম চাঁদনি চকের কোনো রেস্তরাঁয়, ওভারকোট চাপিয়ে। কলকাতা বা লখনৌ থেকে আগত সকলেয় সঙ্গে আলাপ জমতো অতি সহজে। দিল্লী-লখনৌ-এর মোগলাই আবহাওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে খুচু ও জুটলু।

১৯৪১-এর এপ্রিলের শেষে বিয়ে হলো রামবাবুর ছোট ভাই পাঁচুবাবুর ছোট মেয়ে সুলেখার সঙ্গে। নিখিল সেনের ওখানে পাঁচুবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমাকে আসতে বলেছিলেন ১৩নং দরিয়াগঞ্জে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্ভিকতার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। পাঁচুবাবু সুপুরুষ, সৌম্য, স্নেহশীল ব্যক্তি, কখনো কারো বিষয়ে বিদ্বেষ প্রকাশ করতে দেখিনি। তাঁর স্ত্রীকে দম্ভ করতে দেখিনি। আমার মতো জামাইকে বরদাস্ত করেছিলেন, সেটা সামান্য কথা নয়।

বিয়েতে বাবার অমত ছিল, কেননা আমার দিদিমা ও সুলেখার ঠাকুমা সহোদরা, কাশীর পণ্ডিতদের অভিমতে তিনি বিশ্বাস করেন নি। বিয়েতে অবশ্য এসেছিলেন। বরপণে বাবার আপত্তি ছিল না, আমার ছিল! ফলে বৌভাত হয়নি।

বিয়ের পর স্থানাভাবে খুচু আলাদা হয়ে যায়। কিছুদিন পরে লখনৌতে বিয়ে করে, তারপর দিল্লী ছেড়ে গেল আজমীর মেয়ো কলেজে। ছুটিতে দিল্লীতে এলে দেখা হতো। আমি দিল্লী ছাড়ার পর খুচু অধ্যাপনা করে খড়্গভাসলা'র ডিফেন্স এ্যাকাডেমিতে। সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পরে যায় ইথিওপিয়ার মাসোয়াতে, মিলিটারি একাডেমিতে। ১৯৭৩-র ডিসেম্বরে ক্লাস নেবার সময়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। দেশে ফিরে কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রীও বিগত হন।

জুটলু মারা যায় অনেক আগে, ১৯৪৭-এ। কাশ্মীরি গেটে একটা কলেজে পুরানচাঁদ যোশীর বক্তৃতা শুনে ভালো লাগেনি। বেরিয়ে এসে জুটলু পান-বিড়ির দোকানে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করল অনেক, তৃষ্ণা মেটাবার জন্য, সুবিধে হ'ল না। কারণ অনেক বকেয়া ছিল। সেদিন আমার পকেট প্রায় খালি। জুন মাসের শেষ, বেশ গরম, আমরা দুজন হেঁটে দরিয়াগঞ্জে আসি, জুটলু এক গেলাস জল খেয়ে তখুনি হেঁটে গেল কাশ্মীরি গেটের মেসে। দিল্লীতে তখন সাধারণ যানবাহন ছিল টঙ্গা, সাইকেল ব্যস। বাসে কখনো উঠেছি কিনা সন্দেহ। যাহোক, দিন সাতেক পরে বেশ কিছু টাকা নিয়ে কাশ্মীরি গেটের মেসে গিয়ে দেখলাম জুটলুর ঘর বন্ধ। ম্যানেজার জানালেন মাসের শেষে গরম লেগে জুটলু মারা গিয়েছে প্রায় বিনা চিকিৎসায়। খুড়োকে সে সময় খুচু আজমীর থেকে টেলিগ্রাম করেছিল—Worried about Lahiri wire news। স্বপ্নে দেখেছিল জুটলু মারা গেছে, তাই টেলিগ্রাম।

বিয়ের দু-একদিন পর থেকে পুরনো জীবনযাত্রায় ফিরে যাই। যৌবনের শুরুতে দু-একবার হোঁচট খেয়ে রোমান্টিক হাবভাব ছিল না। তাছাড়া ২২শে জুন রুশ-জার্মান লড়াই আরম্ভ হওয়াতে সংসারের কথা মনে থাকতো না; বিপদ-আপদ হ'লে শ্বশুরবাড়ি তো হাতের ডগায়। ১৯৪২-৪৩র মধ্যে দুটি কন্যা হয়।

ছুটিতে কলকাতায় আসতাম, ফলে উত্তর ভারত দেখা হয়নি, আগ্রা ও ও সিমলা ছাড়া। এখন সেজন্য মনস্তাপ হয়। কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করতাম। ১৯৪৪-এ একটি বিজ্ঞাপনী অফিসে দিন সাতেক কাজ করে বেশ খুশি ছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার দিল্লীতে ফিরে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও-র সংবাদ বিভাগে ঢুকি, ওখানে সারে পাঁচ বছর কাটে।

বাংলার বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত চল্লিশের দশকে আমি প্রবাসে ছিলাম। সে কারণে হয়তো আমার মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষের সময় কাশ্মীরি গেটে বেঙ্গলী ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে পুরনো বাংলা বই এনে ক্রমাগত পড়েছি, যার ছাপ আছে 'তিন পুরুষ'-এ। কলকাতার আই. এন. এ আন্দোলনের সময় দিল্লীতে ছিলাম। ১৯৪৬-এ কলকাতায় থাকাকালীন ২৯ জুলাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিরাট ধর্মঘট হয়, মনে হয়েছিল কংগ্রেস-লীগের খেয়োখেয়ি ছাড়িয়ে দেশ চলেছে অন্য একটা পথে। ১৯৪৬, ১৬ আগস্টের কথা ভাবা যায় নি। ১২ বা ১৩ আগস্ট নিজামি হোটেলে রাত্রে বেয়ারাদের Direct Action Day-তে যোগদানের উৎসাহ দিয়ে দিল্লী রওনা হই।

কলকাতার দাঙ্গার পর বহুদিন চলে কংগ্রেস-লীগ আলোচনা, খেয়োখেয়ি। পটভূমিকায় দাঙ্গা—'স্বাধীনতার সংগ্রাম', ওয়াভেলের প্রত্যাবর্তনে, মাউণ্ট-ব্যাটেনের আগমন, তারপর দেশবিভাগ।

রাজধানীতে একতরফা ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের দু-তিন সপ্তাহ পরে। আমার বাড়িওয়ালা তরুণ মুসলমান মারুফ আলিকে তার আগে কয়েকবার বলেছি নেহরু থাকতে দিল্লীতে কিছু ঘটবে না। একদিন অতি ভোরে রেডিও অফিসে পৌঁছিয়ে দেখলাম অনেকে আসেনি। দিন বাড়তে দু-একজন আসতে শুরু করলেন, শুনলাম করলবাগে খুনোখুনি শুরু হয়েছে। দুপুরে বাড়ি ফিরে মারুফকে বললাম তার বিধবা মা দুটি সুন্দরী বোনকে বিনা বিলম্বে নিরাপদ পাড়ায় সরানো অবশ্য কর্তব্য। মারুফকে খুব বিচলিত মনে হ'ল না। বিকেলের দিকে মারুফের পিতৃবন্ধু আসফ আলি মেয়েদের জুম্মা মসজিদ এলাকায় নিয়ে গেলেন। মারুফ একা থেকে গেল। একটা বড়ো জমিতে পাঁচটা বাড়ির মালিক, বাড়িগুলো যতই জীর্ণ হোক জীবিকার একমাত্র উৎস, তাই তদারক করা দরকার। সারা পাড়ায় একটি মাত্র মুসলমান যুবক, ক্রমাগত হানা দিচ্ছে পাঞ্জাবের বাস্তুহারা, প্রায়-হিংস্র, হিন্দু ও শিখ, বাড়ি দখলের জন্য। মারুফ কিন্তু অবিচলিত। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য

করতাম। শেষে বর্ষণমুখর একটি রাত্রে মারুফ ও হামদরদ্ দাওয়াইখানার নৈশ আস্তানাকে লক্ষ্য করে মত্ত শিখ সৈন্যরা অনেকক্ষণ গুলি চালায়। (সে সময় বোমা, মেসিনগান ও বন্দুকের আওয়াজ চলতো সারাদিন সারা রাত)। পরদিন পাড়ার লোকেরা বললেন যে মারুফরা থাকলে গণ্ডগোল চলবে, তখন মারুফ ও হামদর্দে'র লোকেরা নিরাপদ পাড়ায় চলে গেলেন। মারুফ অবশ্য সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত হাজিরা দিত দরিয়াগঞ্জে। কিন্তু ১৯৪৮-র জানুয়ারীতে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সে-বছর জুলাইতে একবার দিল্লী এসেছিল। তারপর দেখা হয় দশ বছর পরে—লণ্ডনে, পাকিস্তান দূতাবাসের বিমান বিভাগ সংক্রান্ত অফিসে। মারুফ তখন অফিসার, Wing Commander খুব সম্ভব। তারপর তো পাকিস্তানের সঙ্গে দুটো 'বড়ো' যুদ্ধ হয় মারুফ জীবিত না মৃত জানি না। মারুফের বোনকে বিয়ে করেন, 'Twilight in Delhi'র লেখক আহ্মেদ আলি।

দিল্লীর অবিরাম হত্যাকাণ্ড থামে প্রধানত দুটি কারণে, হপ্তাতিনেক পর দক্ষিণ ভারতীয় সৈন্যরা টহল দিতে নামলো এবং অবিরাম বৃষ্টি শুরু হলো। দিনের পর দিন নাগরিকদের আহার্য জুটতো অতি কষ্টে, দোকানপাট বাজার সব বন্ধ। একবার খুড়ো খবর দিলেন তাঁকে টিমারপুর টি. বি. হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা দরকার। তাঁকে এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে এসেছিলেন নিখিল সেনের ছোট ভাই অনিল সেন। খুড়োর বাড়িতে, তার পরের দিন তিন-চারজন মুসলমান রোগী ও রোগিণীদের নিয়ে আসতে হয় হাসপাতাল থেকে হিন্দুবেশে। সেখান থেকে নিরাপদ এলাকার পাচার করা হয় গোপনে। হিন্দু পাড়ায় থাকতাম বলে চাক্ষুস নরহত্যা দেখিনি, মৃতদেহ অবশ্য চোখে পড়েছে। ৫নং দরিয়াগঞ্জে আমার জ্যেষ্ঠশ্বশুর ডঃ বি. সি. সেনের একটা বাংলোতে সস্ত্রীক থাকতেন 'প্রাভদা'র বিশেষ প্রতিনিধি ওলেগ ওরেস্তভ; তাঁর ওখানে গেলে মিসেস ওরেস্তভ ঝোলায় ভরে শাকসবজি, আলু, টিনের মাছ মাঝে মাঝে দিতেন। চোখের সামনে একজনকে খুন হতে দেখে ওঁরা এতো বিচলিত হন যে দরিয়াগঞ্জ থেকে নয়া দিল্লীতে চলে যান।

অন্তর্বর্তী সরকারের রেডিও পরিচালনায় ও দিল্লীর দাঙ্গায় সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা গৌরবময় ছিল না। তাঁর জন্য দাঙ্গা সহজে থামেনি, তাঁর রক্ষণশীল হিন্দুয়ানির ও হিন্দি প্রেমের ফলে এ. এস. বোখারির মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিকে রেডিও ছাড়তে হয়। কম্যুনিস্ট সন্দেহে দু-একজনকে সাসপেণ্ড করা হ'ল। অথচ ১৯৪৪-এ বাবা যখন দার্জিলিঙের কাছে সোনাদায় ধৃত হন তখন আমি ছুটি চাইলে সংবাদ বিভাগের বড়ো কর্তা চার্লস বার্নস বাবার সুভাষপন্থী রাজনীতির কথা শুনেও ছুটি মঞ্জুর করতে ইতঃস্তত করেননি। অবশ্য এটা বলেন যে অন্য চাকরির চেষ্টা করা ভালো, ইতিমধ্যে তিনি দিল্লীর বড়োকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন।

রেডিওতে সহকর্মীদের অনেকে ছিলেন পাঞ্জাবী মুসলমান, তাঁদের সঙ্গে

এতো সদ্ভাব শেষ পর্যন্ত ছিল যে একবার ভেবেছিলাম পাকিস্তানে opt করবো। পাঞ্জাবী বড়োকর্তাদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। মুখে মুখে জবাব ও লেখার জন্য আমাকে শাস্তি হিসাবে সরিয়ে দেওয়া হয় নীরদ চৌধুরী যে বিভাগে ছিলেন সেই বিভাগে—English Political Warfare Section-এ। শাপে বর হল। শ্বেতাঙ্গদের স্বজনপোষনের জরুরৎ হতো না ব'লে তাঁরা অন্য মাপকাঠিতে কর্মচারীদের যাচাই করতেন। নীরদবাবু আমাদের লেখা সংবাদ বুলেটিন দেখতেন; নিজের কার্যকালে অসীম একাগ্রতা, আমাদের কাজের সময় সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসী উদ্ধৃতি শোনাতেন। কাশ্মীরি গেট থেকে হেঁটে আসতেন অফিসে, চোস্ত সাহেবী পোশাকে; গরমের সময় কিন্তু বাড়িতে থাকতেন খালি গায়ে, ধুতি পরনে। অফিসে কয়েকজন বেয়াড়া পাঞ্জাবীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে। একবার একজন ষণ্ডাগোছের যুবককে মারতে উঠেছিলেন টেবিলের ওপর পা তুলে উদ্ধতভাবে বসেছিল ব'লে। নীরদবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ নতুনভাবে গড়ে ওঠে Now পত্রিকায় সম্পাদনার সময়। এককালে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু বাংলা কবিতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। একবার সস্ত্রীক আমাদের মিসেস চৌধুরীর রান্না বিলিতি খানা খাওয়ান। কোন পদের সঙ্গে কোন wine পান করতে হবে সে বিষয়ে সাবধান করে দেন। তারপর নিজে তিন দিন অফিসে আসেন নি—অভাবনীয় ব্যাপার। পেট খারাপ হয়েছিল।

রেডিওর চাকরিতে শারীরিক পরিশ্রম হতো, যাতায়াত সাইকেলে আট মাইল, কখনো বা প্রচণ্ড গরমে বেলা দুটোর সময় যাত্রা, কখনো বা প্রচণ্ড শীতে শেষ রাত্রে প্রত্যাবর্তন। ছুটি ছিল খুব কম।

১৯৪৮, ৩০শে জানুয়ারী আমার off day। সন্ধ্যার দিকে রেডিও পাড়ায় এ্যামেচার নাটক দেখতে গিয়ে শুনলাম গান্ধীজী গুলিতে আহত। অফিসে গিয়ে ছটার বুলেটিনে মৃত্যুসংবাদ—stand by for grave news, ডি-মেলো'র গলায়। পরের দিনে শহরে জনসমুদ্র, আমরা ছিলাম রেডিও অফিসে। ফিরে আসার পর পেশোয়ার থেকে নবাগত একজন প্রতিবেশী গান্ধীর মৃত্যুতে উল্লাস প্রকাশ করাতে খারাপ লাগে। অবশ্য Freedom at Midnight পড়ে যদি কেউ ভেবে থাকেন যে দিল্লীতে গান্ধীজীর উপস্থিতি ও অনশনের ফলে জনসাধারণের মনোভাব বদলে গিয়েছিল, অনশন থামাবার জন্য সম্পূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল সেটা ভুল। তাঁর মৃত্যুর আগে গান্ধীপ্রীতি অন্তত উদ্বাস্তুদের মধ্যে দেখিনি।

বাপুজী বিগত হবার মাস চারেক আগে সদ্য বিলাতফেরৎ সুব্রত রায়-চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা, দুপুরের দিকে। হাতে সময় ছিল, হোটেলে বিয়রযোগে লাঞ্চ খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম মুখে গন্ধ পাচ্ছে কিনা। বলল, "বহুৎ বদবু"। দুটো করে মশলাদার পান খেয়ে পৌঁছলাম বিড়লাভবনে। আমি "বদবু" সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন,

দূরে বসলাম! বিলেতফেরৎ সুব্রত গান্ধীজীর কাছ ঘেঁসে বসাতে তিনি একটু দূরে সরে গেলেন। খালি গা, চিক্কন চামড়া, প্রশ্নোত্তরে দ্বিধা নেই। সুরাবর্দীর কথা ওঠাতে বললেন, "I trust he can deliver the goods." (দিল্লীতে আসার আগে সুরাবর্দীর সঙ্গে কলকাতায় কাজ করেছিলাম)। ভাষা প্রসঙ্গে বিলেতফেরৎ আয়রিশ উপভাষার উল্লেখ করাতে বললেন, "You are taking me beyond my depth." পনেরো মিনিটের সাক্ষাৎকার প্রায় চল্লিশ মিনিট চলার পর গান্ধীজী মন্তব্য করলেন যে এরপর লোকে তাকে বাঙালি-ঘেঁষা বলবে, অনেকে অপেক্ষা করছেন (এক কোণে জয়রামদাস দৌলতরাম বসেছিলেন)। বেরিয়ে এসে বন্ধুকে সাবধান করে দিলাম যে সেদিন সন্ধ্যার প্রার্থনাসভায় মহাত্মা হয়তো ভারতীয়দের সুরাপান বিষয়টা তুলবেন, কেননা তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পরদিন সকালে কাগজে পড়লাম কোরাণ-পাঠে কে-একজন আপত্তি জানাতে প্রার্থনা-সভা হয়নি।

বিয়ের কিছুদিন পরে ভাড়া বাড়িতে আর একটা বড়ো ঘর ও সামনের ছোট্ট বাগান আমরা পাই; ভাড়া বেড়ে দাঁড়ালো ৩২, শেষ পর্যন্ত ৪০। আমাদের ওখানে অনেকে এসে উঠতেন। ভিড় বেশি হলে দুই কন্যা নিয়ে স্ত্রী পিত্রালয়ে রাত কাটাতেন।

পুরনো দিল্লীর একটা আলাদা মোহ দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত ছিল। নয়া দিল্লী সন্ধের পর নির্জন হয়ে যেতো, বড়ো বড়ো সাহেবদের বাড়ি ও ক্লাবগুলি ছাড়া। জাপানীরা যুদ্ধে নামার আগে পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম খুব চড়েনি। তখন কুতবমিনার তুগলকাবাদ ইত্যাদি দেখতে হলে টঙ্গা নেওয়া হতো। পেট্রোল র‍্যাশনিং ইত্যাদি কারণে মোটর গাড়ির চল ছিলনা বিশেষ। রেডিও অফিসে কাজ করতেন সম্ভ্রান্ত বংশের অনেকে, তাঁরাও সাইকেল ব্যবহার করতেন। হঠাৎ বড়লোকদের সংখ্যা বাড়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর। বাঈজীদের প্রতিপত্তি ছিল। গোধূলিতে গান বাজনা, রাত বাড়লে অন্য ব্যাপার। বুদ্ধদেববাবুকে একবার ও পাড়ায় নিয়ে গিয়েছিলাম দিল্লীর হালচাল দেখাতে। গানের পর সন্ধিক্ষণে আমরা চলে আসি।

দিল্লীতে কম্যুনিস্ট পার্টি ও পার্টির নানা ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি—রাজধানী ব'লে সমস্ত ব্যাপারটা কিছুটা শৌখিন ছিল। মনে আছে একবার অরুণ বোস (এখন অধ্যাপক) আমাদের বসবার ঘরটা কিছুক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে চান, দু-একজন রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করবেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। পরে ডেকে পাঠাতে একজন—অন্যরা বিদায় নিয়েছেন—আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে চিনি কিনা? চট্ করে বললাম "পি. সি. যোশী।" যোশী চমকে উঠলেন—আমার মতো লোক যদি প্রথম সাক্ষাতে চিনতে পারে তাহলে পুলিশের কাছে আত্মগোপন করা তো অসম্ভব। তাঁর তোৎলামি দেখে অনুমান করেছি? বললাম, "না, হঠাৎ মনে হল, তাই।"

(অরুণ বোস যোশীর এত ভক্ত ছিলেন যে নিজেও তোৎলাতেন)।

যোশীর সঙ্গে পরে কলকাতায় দেখা হতো সুনীল জানার বাড়িতে। আমাদের বাড়িতে এসেছেন কয়েকবার পঞ্চাশের দশকে। চা খেতেন প্রচুর, সাংস্কৃতিক মহলের সঙ্গে আগের দশক থেকে যোশীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ইত্যাদি আন্দোলনের উপর তাঁর প্রভাব ছিল ব্যাপক। যুদ্ধের দরুণ দেশে কর্মসংস্থা বাড়ে, শিল্পোন্নতি ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে ফাট্‌কাবাজি, কালোবাজার, মুনাফাখোর। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কম্যুনিস্টদের প্রভাব বিনষ্ট হয়নি—তার অন্যতম কারণ কি এই যে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর সুযোগসুবিধা ঘটে যুদ্ধ প্রয়াসের ফলে? কঠিন দণ্ড দিতে হয় গরিব কৃষকদের। তেতাল্লিশের মন্বন্তর যার প্রমাণ। যুদ্ধ শেষে গণ আন্দোলন আবার প্রখর হয়ে ওঠে, যার প্রভাব পড়ে মধ্যবিত্তদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। তেভাগা, আই. এন. এ., নৌবিদ্রোহ, বিমান বাহিনীতে বিক্ষোভ, তেলেঙ্গানা একদিকে, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাজনীতিকদের অশ্লীল অবিরাম খেয়োখেয়ি। দেশের দুর্ভাগ্য—ক্ষমতার হস্তান্তর যতটা ঘটে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপক বাস্তুত্যাগের পটভূমিতে, ততটা গণ-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিপ্রেক্ষিতে নয়। 'নেপোয় দই মারা'র মতো নেতারা মস্‌নদে বসলেন। গণ-আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করলো নেহরু-সরকার; শেষ পর্যন্ত কিছু 'বাম বিভ্রান্তি'র পর সংসদীয় পথে এল কম্যুনিস্ট পার্টি। শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা-সহযোগিতার ফলে সাংস্কৃতিক জগতে ব্যাপক স্থায়ী আলোড়ন কি ঘটে? বিচ্ছিন্ন প্রতিভার আবির্ভাব অবশ্য দেখেছি—যেমন সিনেমা ও নাট্যজগতে। কিষাণ সভাগুলি ম্রিয়মান হয়ে এল, প্রকট হ'ল শহর-ভিত্তিক রাজনীতি, যেটা ভারতীয় সমাজে ব্যাপক দুর্নীতির একটা কারণ।

*

১৯৪৯-এ, খুব সম্ভব সেপ্টেম্বরে, সাংবাদিক অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও আমি কলকাতায় এসে একসঙ্গে 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় দরখাস্ত করি, আমি করি ছ-পয়সার খামে। নভেম্বরের শেষাশেষি পত্রিকার সংবাদ সম্পাদনা বিভাগে যোগ দিই। দীর্ঘ ন'বছর পরে দিল্লীর পাট উঠল। আমার দুই মেয়ে শ্বশুর শাশুরির অত্যন্ত আদরের পাত্রী ছিল—চলে আসার সময় ওঁদের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করিনি। দেশ বিভাগের পর ছ মাসের বাড়ি ভাড়া লাহোরে মারুফকে পাঠিয়েছিলাম বলে Custodian of Evacuee Property অফিস কড়া তাগাদা দেয়। উত্তরে লিখেছিলাম আমি জানতাম যে ওঁরা হলেন Custodian of Evacuee Poverty। শেষ পর্যন্ত সহকর্মী একটি পাঞ্জাবীকে বাড়িটা দিয়ে আসি; তাকে নিশ্চয়ই পুরোনো ভাড়া দিতে হয়নি।

সংবাদপত্র অফিসে কাজ আমার কাছে নতুন, রেডিও'র সংবাদ সম্পাদনার

সঙ্গে মিল ছিল না। নানা সূত্রের খবর বাছাই ক'রে রেডিও'র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুলেটিন তৈরি করে মুখে মুখে স্টেনোগ্রাফারকে বলে টাইপ করিয়ে নিয়ে স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেওয়া। কাজের চাপ ছিল বেশ, যুদ্ধক্ষেত্রের নানাস্থানেয় নাম ও ঘটনা পরম্পরার স্পষ্ট একটা ধারণা মনে রাখতে হতো। যুদ্ধশেষেও চাপ কমেনি। খবরের কাগজে সময় পাওয়া যায়। অন্যদের কপি এডিট করতে হয়। টাইপ, হেডিং ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা দরকার। তিনটে শিফ্‌ট সকাল, বেলা দুটো থেকে সন্ধে ও রাতে। তখন নাইট ডিউটি ছিল মাসে একটানা চোদ্দদিন, আটটা থেকে শেষরাত পর্যন্ত। রেডিওতে কখনো অফিসে রাত্রে শুয়ে কাটাতে হয়নি, সংবাদপত্রে সেটা অপরিহার্য ছিল। ভোরের প্রথম আলোয় ট্রামে ফিরতাম। দু-একবছর পরে অফিসের গাড়িতে ফেরার ব্যবস্থা হয়। আড্ডার দিক দিয়ে অসুবিধে কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল। রাত্রের ডিউটি থাকলে খাওয়াদাওয়া সন্ধে ছটার মধ্যে সেরে বেরিয়ে পড়তাম, এখানে-ওখানে অল্পক্ষণ গল্পগুজবের পর যেতাম অফিসে। দুপুর থেকে রাত আটটার শিফ্‌টের পর কোথায় যাবো নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকতো। ফলে, সকালের শিফ্‌ট এলে মাসে মাত্র এক সপ্তাহ সন্ধ্যার গল্পগুজব ইত্যাদির মাত্রা থাকতো না। বড়ো বড়ো ঘটনার খবর সংবাদপত্রে আসতে থাকে সন্ধ্যার পর থেকে, নেতাদের দীর্ঘ বক্তৃতাও, এবং আমাদের দেশের নেতাদের মতো বক্তৃতাবাগীশ তো ভূ-ভারতে পাবেন না।

'স্টেটস্‌ম্যান'-এর সংবাদ সম্পাদনা বিভাগে তখন বর্মা-ফেরৎ এ্যাংলো-বার্মিজদের প্রতিপত্তি! তাঁদের কর্মদক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়, ব্যবহার ভালো; স্বজাতিপ্রীতি বাদ দিয়ে। এদেশের রাজনীতি বা সংস্কৃতিতে তাঁরা খুব ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ওপরের দিকের ইংরেজরা ছিলেন মার্জিত। আমি যোগ দেবার কয়েক বছর আগে পর্যন্ত অক্‌সফোর্ড বা কেম্‌ব্রিজ ফেরতরা পর্যন্ত প্রথমে সাব এডিটর হয়ে ঢুকতেন, হাত পাকিয়ে হতেন সহকারী সম্পাদক। সবাই অবশ্য উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু নির্ভুলতার বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা ছিল। ইয়ান স্টিফেন্স কাগজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত—এমন কি বিজ্ঞাপন বাদ পড়তো না—দাগ দিয়ে নানা মন্তব্য ক'রে সকালে নিউজ রুমে পাঠাতেন (অবশ্য 'আজাদ কাশ্মীর' সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন নিয়ে পরে তিনি গণ্ডগোলে পড়েন)। 'Marked copy'-র প্রথা ক্রমশ শিথিল হয়ে পরে। এখন সাহেবিয়ানা রয়ে গেছে, কিন্তু কাগজের মান নিয়ে অতো মাথা ব্যথা নেই। কলকাতায় প্রতিযোগিতা কম।

'স্টেটস্‌ম্যান' অফিসে প্রায় সাত বছর খারাপ কাটে নি। তবে মাসে দু-সপ্তাহ একটানা নাইট ডিউটির কথা ভাবলে এখনো গায়ে জ্বর আসে।

কলকাতায় ফিরে সাহিত্য জগতে ঘোরাফেরা হতো কদাচিৎ। আড্ডার পরিধি অন্যদিকে বাড়ে। 'মজুমদার ক্লিনিক' তো ছিল তাছাড়া বেশ কিছু সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ হলো, তাঁদের দু-একজন রবিবার দাদার আড্ডায়

আসতেন সন্ধেবেলায়। ডিউটি না থাকলে রবিবার সকালে আমাদের ওখানে আড্ডা হতো। নিরঞ্জন মজুমদার, সুনীল ও শোভা জানার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় কলকাতায় ফিরে। প্রথম সাক্ষাতে নিরঞ্জনকে জানিয়েছিলাম (অনেকটা দিল্লীর খুচুর মতো) যে তাঁর 'শীতে উপেক্ষিতা' ইত্যাদি আমি পড়িনি এবং পড়ার ইচ্ছে নেই। নিরঞ্জন কিছু মনে করেন নি। তিনি তখন 'ক্যাপিটল্' সাপ্তাহিকে কাজ করতেন, পরে 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' হয়ে যখন 'স্টেটস্‌ম্যান'-এ আসেন তখন আমি মস্কোয়।

দিল্লীতে বহুকাল কাটিয়ে কলকাতায় আসার কিছুদিন পরে আমার মানসিক ভারসাম্য কমে। যাঁদের সঙ্গে স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা তাঁদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতো সামান্য বিষয় নিয়ে, অনেকবার রেগে আড্ডা থেকে বেরিয়ে গিয়েছি।[২] অবশ্য মনোমালিন্য বিদ্বেষ বা শত্রুতায় পরিণত হয় নি। ভারসাম্য হারানোর কারণ সম্বন্ধে অভিহিত ছিলাম, কিন্তু আত্মজ্ঞান মুক্তির পথে নিয়ে যায় না, স্বভাব যায় না ম'লে।

অন্তত আমাদের জীবনে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রখর ছিল তিরিশ ও চল্লিশের বছরগুলিতে, যখন দেশ-বিদেশের চেহারা বদলে যায়। পঞ্চাশের দশকে চীনের অভ্যুদয়, কোরিয়ার যুদ্ধ, চীনের দ্রুত প্রগতি, ইজিপ্ট সংকট, দেশে মাঝে মাঝে রক্তাক্ত সংঘর্ষ। সংসদীয় পথ পাকা হয়। ১৯৫৬-এ স্তালিনে-র কেচ্ছা শুরু হ'ল। ব্যাপারটা অত্যন্ত কদর্য ঠেকেছিল, কৈশোর ও যৌবনের অনেক বদ্ধমূল ধারণা ও আদর্শে এমন আঘাত আগে লাগে নি।

ব্যক্তিগত জীবনে নানা বিভ্রান্তি আসে, তবু সময় কেটে যেতে থাকে মধ্য-বিত্ত পথে। নিজের সংসারের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি একটা ঔদাসীন্য ছিল। কিছুটা অফিসের উদ্ভট সময়ের জন্য, বেশিটা স্বভাব দোষে। হয়তো বাবা'র সংসার-উদাসীন প্রভাব অন্যতম কারণ। কিন্তু আমার দুই বড়ো ভাই নানা আতিশয্য সত্ত্বেও গৃহস্থ হিসেবে আমার মতো আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। অথচ তাঁরা বরাবর কলকাতায় থেকে গেছেন, যে কলকাতায় চল্লিশের ডামাডোলে স্বাভাবিক থাকা ছিল কঠিন। পরের তিন ভায়ের মধ্যে কনিষ্ঠতম মারা যান অল্প বয়সে; পিসতুতো বোনকে কী একটা মতে বিয়ে করে তার দুঃসময় আসে, যদিও ভায়েরা তাকে কখনো একঘরে করেনি, শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। অন্য একটি ভাই আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট—চাকুরে হিসাবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নতি করে। তার সংসার শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। বেশ কিছুদিন সে বিদেশে। আর এক ভায়ের বিরুদ্ধে অসাংসারিক অভিযোগ কেউ আনবেন না।

আমার মেজভাই (জে. পি. সেন—গাবুদা নামে পরিচিত) জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানা মতামত পোষণ করতেন। দিল্লী থেকে ছুটিতে এলে ওঁর বাড়িতে উঠতাম। একদিন রাত একটা বেজে গেল, কোনো পাত্তা নেই। টেলিফোন তো ছিল না, লোক পাঠিয়ে, নিজে বেরিয়ে নানা জায়গায় খোঁজ নিলাম :

সবায়ের উৎকণ্ঠা যখন চরমে উঠেছে তখন ফিরলেন। আমি সেদিন বাড়িতে বন্দী, মেজাজ গরম, সিঁড়িতে রাগারাগি করাতে মেজভাই বললেন বারোটা নাগাদ ফিরলে বৌদি অনেক কথা শোনাতেন, এত দেরিতে জীবিত-অবস্থায় অক্ষত শরীরে ফিরছেন ব'লে সবাই এতো আশ্বস্ত হবে যে বকাবকির কথা উঠবে না। চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল যে ওষুধে যখন খরচা হচ্ছে তখন সবকিছু খাবোনা কেন? খাওয়া ছেড়ে দিলে শরীর তো আপনা থেকেই সুস্থ হবে। একবার, অনেক দিন আগে, ডায়াবিটিসের জন্য খাদ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে অথচ মাদক না ছেড়ে প্রমাণ করেন যে মাদকের জন্য ব্লাডসুগার বাড়ে না—যেটা এখন অনেক ডাক্তারের মত। দাদা কখনো খুব একটা উৎকণ্ঠায় বৌদিকে ফেলেন নি। মেজভাই দু-একবার দুর্ঘটনার ফলে (নিজে আহত হননি) সারারাত ফিরতে পারেন নি। দিল্লীতে একবার মোটর দুর্ঘটনায় (গাড়িতে অমলেন্দু দাশগুপ্ত ছিলেন) আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে যেতে হয়, কিন্তু শ্বশুরমশাই রাত বারোটা নাগাদ খবর পেয়ে নিয়ে যান। দাদা ও দুই বন্ধু কলকাতায় গুরুতর মোটর দুর্ঘটনায় পড়েন। কিন্তু সব মিলিয়ে তিন ভায়ের বৌদের ধারণা ছিল আমরা বেঘোরে প্রাণ হারাবো না। তবে বাড়াবাড়ি ঘটতো। অশোক মিত্র সতর্ক ক'রে মাঝে মাঝে বন্ধুসুলভ উপদেশ দিতেন। নিরঞ্জন বোধহয় কখনো 'হারিয়ে' যায়নি। তাঁর হাতে সর্বদা কয়েকটা বই থাকতো। একবার হাত খালি থাকাতে অন্যমনস্কভাবে বন্ধুর টেলিফোন ডিরেক্টরি তুলে নিয়ে যান। নিরঞ্জন বি.বি.সি. ইংরেজিতে কথা বলতেন সর্বক্ষণ; কিন্তু বাজি রাখলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না ক'রে বাংলায় আলাপ করতেন। সুনীল ও শোভা জানার জীবনযাত্রা ছিল সংস্কারমুক্ত ও বাধাবন্ধহীন, যার প্রভাব আমার উপরে বিশেষ করে পড়ে। আর একটি নতুন ও বিচিত্র গোষ্ঠি, ভানু ও সন্ধ্যা ঠাকুরের দলের সঙ্গে পরিচয় ঘটে কামাক্ষীপ্রসাদ ও রেখা চট্টোপাধ্যায়ের সূত্রে। এখন সকলের উদ্দামতায় ভাটা এসেছে।

দিল্লী থেকে চলে এলেও পঞ্চাশের দশকে মাঝে মাঝে রাজধানীতে যেতাম! একবার দামোদর ভ্যালি করপোরেশন এলাকায় কামাক্ষীপ্রসাদের সঙ্গে ঘুরেছিলাম। নবীন সব এঞ্জিনিয়র নতুন প্রকল্প সবে গড়ে তুলছেন কঠোর পরিশ্রমে ও উৎসাহে। বিরাট যন্ত্রপাতি এখানে ওখানে ছড়ানো। অবিরত কাজ চলছে, কতো শ্রমিক খাটছে। সে আন্তরিকতা ও উৎসাহ এখন আর নেই।

১৯৫২-তে নির্বাচনের সময় বম্বের টিকিট কেটে হাওড়া স্টেশনে পকেটমার হয়ে যাওয়াতে বাড়ি ফিরে আসতে হ'ল। বম্বেতে 'ইকনমিক উইক্‌লি'র শচীন চৌধুরীর ভাই দেবু চৌধুরী আমার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু ও মুখো আর হইনি অনেক বছর। একবার গিয়েছিলাম বালাসোর থেকে মাইল সাতেক দূরে চাঁদিপুরে, জানাদের ও শিল্পী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে। শিশু-সমুদ্র, উঁচু নিচু বালিয়াড়ি, শালবন। ভোরে দেখতাম মাইল খানেক দূরে

জলের ওপর গম্ভীর মুখে মহাভারতীয় বক দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব বাইবেলের মোজেজ ওখানেই হেঁটে সমুদ্র পার হয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত বৃত্তান্ত পড়ে পাঠকেরা বুঝবেন যে জনগণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিলনা, পরিধি ও পরিবেশ ছিল মধ্যবিত্ত। আমার ছাত্রাবস্থায় বাবা বলতেন আমার বন্ধুবান্ধব সবাই সচ্ছল। কথাটা ঠিক। আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হতো—এবং এখনো হয়—যে বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে। চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় আনতে না পারলে বড় জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায়, কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না। এমন কি স্তালিনোত্তর 'মহান বিপ্লবী' দেশে কয়েক বছর কাটালেও নয়।

*

১৯৫৬-এ স্তালিনের মুণ্ডপাত। পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে সপরিবারে মস্কো যাই চাকরি নিয়ে। সংস্থার নাম ছিল 'বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়'—এখন 'প্রগতি প্রকাশালয়' [প্রকাশনী]। বাংলা বিভাগে এবং একই বাড়িতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন রেখা ও কামাক্ষীপ্রসাদ, 'উদয়ের পথে'-র বিখ্যাত অভিনেতা চিরকুমার রাধামোহন ভট্টাচার্য (অসুস্থতার দরুণ মাস সাতেকের বেশি থাকেনান)। বেশ দূরে বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় থাকতেন ননী ভৌমিক, ফল্গু কর ও শুভময় ঘোষ (ভুলু, শান্তিদেব ঘোষের ছোট ভাই, ১৯৬৩-তে দেশে ফিরে মাস খানেকের মধ্যে মারা যান। ভুলুর মতো তরুণ কম দেখেছি—তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের পারিবারিক ট্র্যাজেডির মতো)।

আয়তনে অফিসটা ছোট, কিন্তু নানাদেশের লোক অনুবাদের কাজ করতেন। কাজটা বাড়িতে বসে হতো, সম্পূর্ণ হলে রুশ কনট্রোল এডিটরদের সঙ্গে বসতে হতো। প্রথম দিকে রুশ বই-এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরে মূল থেকে কতোটা বিচ্যুতি হয়েছে দেখবার ভার যাঁদের ওপরে ছিল তাঁদের বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ভাষাজ্ঞান পাকা ছিল না। ফলে লাঞ্চের এক ঘণ্টা বাদ দিয়ে, সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অনুবাদক ও রুশ কনট্রোল এডিটর হিমসিম খেতেন। 'চিরায়ত' রুশ সাহিত্যের অনুবাদে ভাষার খাতিরেও কোন অদলবদল চলবে না, অনুবাদ তার ফলে হাস্যকর হোক না হোক। ক্রমশ দু'পক্ষের ভাষাজ্ঞান বাড়াতে ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে, অনেকের ক্ষেত্রে। রুশ সহকর্মীদের ব্যবহারে আন্তরিকতা ছিল। কাজের সময় কাজ, উৎসবের সময় উচ্ছলতা। অফিসের বাইরেও অনেকের সঙ্গে আলাপপরিচয় হলো, ভাঙাভাঙা রুশীতে আলাপ চলতো, তবু অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। আমার দুই মেয়ে বয়স অনুযায়ী ক্লাসে ভর্তি হলো, যদিও রুশ ভাষা ঘুণাক্ষরে জানতেনা না। কিন্তু অল্পবয়সীরা চটপট ভাষা রপ্ত করে নেয়।

আমরা মস্কো যাই কাবুল হয়ে। কাবুল থেকে তের্মিয়েজ, তারপর

তাশখন্দ। রাশিয়ার অগ্রগতি মনে গভীর ছাপ ফেলে। দু-একটা ব্যাপারে খটকা লাগলো। তাশখন্দে বিকেলে নেমে রাত বারোটার আগে মস্কোর প্লেন ছাড়বেনা শুনে (তখন জেট বিমান হয়নি) দোভাষিণীকে বললাম শহরটা একবার ঘুরে দেখলে হয়। দোভাষিণী ইতস্তত করে বললেন, আমরা যখন খাস মস্কোয় যাচ্ছি তখন তাশখন্দ দেখে কি হবে ? সোভিয়েত শহরের মধ্যেও বিভেদ ? পরে জেনেছিলাম রুশ ভিসা শহর হিসেবে দেওয়া হয়। আমাদের তাশখন্দে ঘোরা বেআইনী হতো।

তাশখন্দ থেকে মস্কো'র পথে তিন-চারটে জায়গায় নামতে হলো। চারদিক বরফে ধু-ধু, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কিন্তু ভেতরে তুলোভর্তি ওভারকোট, খরগোসের চামড়ার কানঢাকা টুপি, ফার-দেওয়া হাঁটু পর্যন্ত চীনে বুট ইত্যাদির ফলে অসুবিধে হয়নি। আখতুবিনস্কে প্রত্যুষে আমাদের ঠাণ্ডা লাগছেনা শুনে দোভাষী বিস্মিত ও নিরাশ হলেন, তিনি জানতেন না যে ওভারকোটের ভেতরের তুলোর ব্যাপারটা। ওখানকার গ্রামবাসীরা ও-ধরনের, আয়তনে ছোট তুলোর কোট পড়ে।

মস্কোয় জিনিসপত্রের দাম দেশের তুলনায় বেশি মনে হলো। সরবরাহে ঘাটতি ছিল। আমরা সরকারী বাঁধাদরের দোকান ('ম্যাগাজিন') এবং খোলা বাজার দু জায়গাতেই যেতাম। খোলা বাজারে দাম চড়া বটে, কিন্তু শাকসবজি ও মাংস টাটকা পাওয়া যেতো, লম্বা কিউ-এর বালাই ছিলনা। দামের কথা তুললে বলতে হয় যে বাড়িভাড়া, সেণ্ট্রাল হিটিং, গ্যাস, বিদ্যুৎ সব মিলিয়ে ব্যয় অত্যন্ত কম। তাছাড়া শিক্ষা ও চিকিৎসায় পয়সা লাগতো না—ওষুধের দাম ছাড়া। দু-একটা জিনিস নিয়ে আমরা ঠাট্টা ইয়ার্কি করতাম—এক দিকে স্পুত্‌নিক, অন্যদিকে বেজায় মোটা থার্মোমিটার পাঁচ মিনিট মুখে রাখতে হবে, হিক্‌সের থার্মোমিটারে ওঁদের বিশ্বাস ছিল না। বাড়িতে ডাক্তার বা ডাক্তারনী —বেশির ভাগ মেয়ে ডাক্তার—ডাকতে হলে রুশীরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে টেলিফোনে বলবে ১০২ ডিগ্রি জ্বর হয়েছে। অসুখ একটু গুরুতর হলে পলিক্লিনিক, তারপর হাসপাতাল। জলবসন্ত হামে ওঁরা মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু আমাশা হয়েছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল ; বাড়িতে জীবানুনাশক ছড়ানো হতো, হাসপাতালে রাখা হতো একেবারে বিচ্ছিন্ন কাঁচের দরজা জানালা দেওয়া ক্যাবিনে। আমার একটা শখ ছিল বিনা পয়সায় হাসপাতালে কিছুদিন কাটানো, কিন্তু পলিক্লিনিক পেরোতো পারিনি। মাইনাস ৩৮ ডিগ্রি সেণ্টি-গ্রেডে রাস্তায় ঘুরেচি, জ্বর হয়নি। মাসের পর মাস রাস্তাঘাট, বাড়ির ছাদ কার্নিশ বরফে ঢাকা, মাঝে মাঝে তুষারঝড়, মস্কো নদী জমে যেতো। বরফের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন শুদ্ধতা আছে। ধোঁয়া ও কুয়াশা নামমাত্র। রাস্তায় বরফ সরাতো বরফ সরাবার গাড়ি ও বুড়োবুড়িরা। বরফগলার সময় এলে কাদা-ঘোলা ভাব, এরেন্‌বুর্গের 'Thaw'। আমাদের ভালো লাগতো না, কিন্তু সে ক্ষণ-বসন্তে ওখানকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে পুলক আসতো।

মস্কো শহরে যেটা নজরে পড়ে সেটা হলো শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে অতিরিক্ত মনযোগ। বহুতল বাড়ির প্রাঙ্গণে খেলার বন্দোবস্ত, অল্প খরচায় বিশেষ আহার্যের কোটা, ক্লেশে, আট বছর বয়স থেকে অবৈতনিক শিক্ষা। রুগ্ন রোগা বাচ্চা বলতে গেলে দেখিনি। এখানে ২৫ নম্বর ট্রামে যাতায়াতের সময় লোয়ার সার্কুলার রোডে গোরস্থানের কাছে এলে মস্কোর কথা মনে পড়ে। 'দাঁড়াও পথিকবর' মর্মর মূর্তি, দুপাশে নোংরা নিচু ছোপরা, সামনে কাদাজলে বাচ্চারা খেলছে, অনেকের পরনে কিছু নেই। অনাহার, অর্ধাহার, জ্বর, পিলে তবু ফুর্তির অভাব নেই। যারা দেখে তাঁদের প্রতিক্রিয়া অবশ্য অন্য হয়।

বরফের মধ্যে রাস্তায় দূরে একটা কালো ছোপ, কাছে এসে দেখতাম কালো ওভারকোট পরিহিত মাতাল বেহুঁশ পড়ে আছে। ছোট ছোট পাব-এ ভোদ্‌কা পরিবেশন নিষিদ্ধ, কিন্তু অনেকে সঙ্গে বোতল নিয়ে যেতো, ভিনো (wine) কিনে তার সঙ্গে মিশিয়ে মাত্রাতিরিক্ত পান, বেরিয়ে ভূমিশয্যা। মাতালদের প্রতি রুশীদের একটা চিরাচরিত সহানভূতি অন্তত তখন পর্যন্ত ছিল, 'চিরায়ত' রুশ সাহিত্যের প্রভাবের ফলে বোধ হয়। পরে মাদকদ্রব্যের দাম অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু চোলাই চলতো অনেক ঘরে। খালিপেটে খাওয়ার রেওয়াজ ছিলনা। ভোদ্‌কা প্রলিতারীয় পানীয়। ক্রেমলিনের সংবর্ধনায় সাধারণত কোনিয়াক ও ভিনো দেওয়া হতো।

কয়েকবার রুশী বন্ধুদের পার্টিতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম। পরে তাঁরাই বলেছিলেন যে ভোদ্‌কার সঙ্গে স্পিরিট মিশিয়ে দেয় ব'লে গণ্ডগোল, অতএব সামনে ভোদ্‌কার বোতল না খুললে ও জিনিসটা খাওয়া বিপজ্জনক। মেশানোর পেছনে অবশ্য বদ মতলব ছিলনা। ওটা ছিল সস্তায় কিস্তিমাতের চেষ্টা। প্রচণ্ড শীতের দেশে এ-সব নিয়ে লোকে মাথা ঘামায় না।

স্তালিনের বিষয়ে কথাবার্তা প্রথম দিকে তুলতাম না, ভাষাজ্ঞানের অভাবে। পরে জিজ্ঞাসবাদ করলে বয়স্ক রুশীরা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত একদা মহান নেতার অবদানের কথা স্বীকার করতেন। জর্জিয়ায় অবশ্য স্তালিন সম্বন্ধে অনুরাগ কমেনি। ওখানে গেলে এমন কি ক্রুশ্চেভ পর্যন্ত কিছু প্রশংসাসূচক কথা বলতেন। তবে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্তালিন-বিষয়ে অসহিষ্ণু ছিল। আমার ছোটমেয়ের খাতায় স্তালিনের ছবি স্কুলের বন্ধু-বান্ধবরা ছিঁড়ে ফেলে। এখন তারাই বড়ো হয়েছে, তাদের মনোভাব অনুমান করতে পারি। খুব সম্ভব ১৯৬৪-র শেষে স্তালিনের দেহ লেনিনের পাশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন আমারা চলে এসেছি। তার বছর তিনেক আগে জর্জিয়ার কাছাকাছি নোভি আফনে ছোট সরাইখানায় তিনজন জর্জিয়ান আমাদের টেবিলে এসে কিছুক্ষণ পরে 'বিচলিত' অবস্থায় স্তালিনের নামে টোস্ট প্রস্তাব করেন, আমরা সোৎসাহে যোগ দিই, বলি পরে আবার আলোচনা হবে। পরের দিন শরাইখানার লোক জর্জিয়ানদের ভোদ্‌কা দেয়নি।

আমরা পেঁছবার কিছুদিন পরে মস্কোয় আন্তর্জাতিক যুব উৎসব হয়। অনেকে মনে করেন এ ধরনের উৎসবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা প্রখর হয়। কিন্তু আসলে উৎসবটা ভিনদেশী যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার মেলা। সেই প্রথম অন্য অর্থে মস্কো open city হ'ল। তারপর আন্তর্জাতিক ফিল্ম-উৎসব ইত্যাদি শুরু হয়। লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হ'ল।

রাশিয়ায় বর্ণবিদ্বেষ দেখিনি। বরঞ্চ রং যতো ময়লা, মেয়ে মহলে ততো খাতির। অবিবাহিত ভারতীয়দের সঙ্গিনীর অভাব হতো না, কয়েকজন বিয়ে ক'রে থেকে গিয়েছেন। আফ্রিকার হঠাৎ বড়লোক সম্প্রদায়ের কতিপয় চ্যাংড়া যুবক বাড়াবাড়ি করাতে গণ্ডগোল হয়; মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক ছেলেমেদের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থায় কড়াকড়ি শুরু হয়। মে-দিবস, ৭ই নভেম্বরের সমাবেশে ভারতীয়দের স্থান পেতে অসুবিধা হতো না। শাড়ি পরিহিতাদের বলশয়ে থিয়েটারে টিকিট পাওয়া সহজ ছিল, যে টিকিটের জন্য স্থানীয় লোকদের অপেক্ষা করতে হতো মাসের পর মাস। রাস্তায় লোকদের মধ্যে ছিল একটা গায়ে-পড়া আন্তরিকতা ও কৌতূহল। বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ দূরে রেখে চলতো রুশীরা।

সময়টা ছিল উত্তেজনা ও প্রত্যাশায় ভরা। প্রথম স্পুতনিক, লাইকা, বিয়েলকা ও স্ত্রীয়েল্‌কা'র মহাকাশ ভ্রমণ, তারপর গ্যাগারিন, যতোক্ষণ না তিনি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন ততক্ষণ কী উৎকণ্ঠা (১৯৬১)। ক্রুশ্‌চভের যুগ, টাকমাথা মোটাসোটা মানুষ, সংখ্যাতথ্য নখের ডগায়, স্পষ্টকথায়-কণ্ঠে নেই গোছের ভাব, বক্তৃতায় অজানা প্রবাদ ও প্রবচনের ছড়াছড়ি। ১৯৫৮-এ দিন বিশেকের জন্য প্রথম পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণের সময় রাশিয়া ও ক্রুশ্‌চভ সম্বন্ধে বিদেশীদের কৌতূহলের সীমা ছিলনা, আমাদের বিশেষ খাতির করা হতো। পশ্চিম ইউরোপের বাহ্যিক সমৃদ্ধি ও পণ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য যে আমাদের বিচলিত করেছে সেটা একেবারে চেপে যাই। (বিদেশ ভ্রমণে সেবার সঙ্গী ছিলেন শুভময় ঘোষ।)

১৯৫০-এ কলকাতা থেকে ফেরার কিছুদিন পর ট্রেনে সস্ত্রীক ওয়ারশ, প্রাগ হয়ে ভিয়েনায় যাই। ওয়ারশ'র হোটেলে রাতে পেঁছিয়ে বিদেশী মুদ্রা বিনিময় করতে গেলে কাউণ্টারের ভদ্রমহিলা 'ভারতীয়' মুদ্রা শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সহকর্মীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা কী। ভদ্রলোক বললেন পরের দিন অন্য জায়গায় বিনিময়ের বন্দোবস্ত হবে, কিন্তু হোটেলে থাকতে পারি। 'ভারতীয়' মুদ্রা সম্বন্ধে এই অজ্ঞানতা আমাকে বিচলিত করে। ওয়ারশতে চেনাশোনা কেউ না থাকাতে ২৪ ঘণ্টার বেশি থাকিনি। শহর ভ্রমণ কালে পথে বিভিন্ন জায়গায় খেতে নিতান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন ও খরচা অনেক। প্রাগে পেঁছিয়ে দেখলাম ইনট্যুরিস্ট কোনো বন্দোবস্ত করেনি, ফলে ভারি লাগেজ নিয়ে মহা মুস্কিল। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সতীশ দাশগুপ্ত শেষ পর্যন্ত ওখানকার বিখ্যাত হোটেল Alcron-এ ব্যবস্থা করে

দিলেন—যে হোটেলে কয়েক বছর পরে ও-দেশের 'বিক্ষুব্ধদের' আলোচনা ও জমায়েত কেন্দ্রস্থল ছিল। দিন তিনেক প্রাগে ছিলাম, অত্যন্ত সুন্দর শহর। তারপর ভিয়েনায় ছদিন ছিলাম এ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সীতে তখন কর্মরত অমলেন্দু দাশগুপ্তের ওখানে। এই সংস্থার অফিসারদের মধ্যে রাশিয়া নিয়ে বিশেষ কৌতূহল দেখিনি। ফিরতি পথে অব্যবস্থার ফলে বিশেষ অসুবিধায় পড়ি—বুর্জোয়া দেশে, প্রতিযোগিতার দৌলতে কিছু গুণ আছে সন্দেহ নেই।

মস্কোয় একটা অসুবিধে হতো। বাইরের পত্রপত্রিকা আনানো ব্যয়সাপেক্ষ ও অন্য কারণে কঠিন ছিল ব'লে খবরের একমাত্র ও একপেশে সূত্র ছিল 'প্রাভ্‌দা' ও 'ইজভেস্তিয়া'। ট্রট্‌স্কির একটি বিখ্যাত উক্তি—There is no Pravda (truth) in Izvestia (news), there is no Izvestia in Pravda. নেতাদের বক্তৃতার রিপোর্ট থাকতো দিনের পর দিন, খবর কম। নেহরুর দেশে পুলিশের গুলিতে দু-একশ শ্রমিক মারা গেলে মস্কোর সংবাদপত্রে উল্লেখ থাকতো না। প্রলিতারীয় আন্তর্জাতিকতা!

মস্কো থেকে দু-একটি ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতাম। ডাকে দিলে প্রায়ই পৌঁছতনা, তাই ৫৫ কিলোমিটার দূরে ভ্নুকভা বিমান বন্দরে কোন ভারতযাত্রীর হাতে লেখা দিয়ে আসতাম, এয়ার ইণ্ডিয়া'র দু-একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। পরে উপলব্ধি করেছি, খবরের অন্য সূত্রের অভাবে বেশির ভাগ লেখা একপেশে, রুশ সরকারের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি। লেখাগুলিতে প্রথমে আমার নাম থাকতো না। প্রকাশালয়ের ডেপুটি পাভ্‌লভ্‌ (পটস্‌ডাম ইত্যাদি বৈঠকে স্তালিনের দোভাষী ছিলেন) একদিন ডেকে পাঠালেন। টেবিলে একতাড়া প্রবন্ধের রুশ অনুবাদ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লেখক আমি কিনা। স্বীকার করাতে বললেন, কিছু কিছু 'অসত্য' রয়েছে, যেমন জর্জিয়ার জনৈক কবি আত্মহত্যা করেননি, তিনি মদ্যপ ছিলেন। ফাদায়েভের কথা তোলাতে বললেন তাঁরও পরিণতির মূলে সুরাসক্তি। আমি বললাম আমার মোটামুটি বক্তব্য এই যে বিপ্লবের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে সংগঠনমূলক পর্যায়ে কয়েকজন শিল্পস্রষ্টা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি, যেমন মায়াকভ্‌স্কি, ইয়েসেনিন। সেটা বিপ্লবের দোষ নয়। যাই হোক্‌ লেখা কি ছেড়ে দেবো? পাভ্‌লভ্‌ বললেন, না, মোটের ওপর প্রবন্ধগুলি 'বাস্তবধর্মী'। তবে কি পাঠাবার আগে দেখানো দরকার, আমি তো রুশ সরকারের কর্মচারী? কমরেড পাভ্‌লভ্‌ এবার রীতিমত বিচলিত হয়ে উত্তর দিলেন লেখা দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

চীন-রুশ মতাদর্শগত পার্থক্যের কথা মাঝে মাঝে কানে আসতো, কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে রাশিয়া হঠাৎ চীন থেকে বিশেষজ্ঞ ও ব্লুপ্রিণ্ট ফিরিয়ে আনে, অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়, বিরোধ যে এতো জটিল ও তীব্র, একেবারে টের পাইনি। বরঞ্চ, প্রথম প্রথম রুশ বন্ধুরা রাশিয়ায় আপাত-প্রবাসী

চীনেদের পরিশ্রম ও আদর্শের তারিফ করতেন। কারিগরি বিদ্যার্থী কোনো চীনা যুবক এসে দু-একমাস পরে বলতো তাকে যে বৃত্তি দেওয়া হয় তাতে আরেকজন চীনাকে অনায়াসে আনিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় ও আনা উচিত। আর তোমরা ভারতীয়রা কয়েক দিন পরে বলতে শুরু করো যে দেশে তোমাদের জীবনযাত্রা অনেক সচ্ছল ছিল, এখানে বৃত্তির পরিমাণ না বাড়ালে আন্দোলন করবে তোমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে। ভারতীয়দের এ-গুণের অভাব ছিল না। রাশিয়ার জীবনযাত্রার মানের তুলনা তাঁরা করতেন পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে, নিজেদের এঁদোপড়া শহরের সঙ্গে নয়। আমরা খেতে পেলে শুতে চাই।

বিদেশী বিবাহিতরা দু-ঘরের ফ্ল্যাট্ পেতেন। রুশীরা থাকতেন একটা ফ্ল্যাটের একটা ঘরে, বাথরুম ও রান্নাঘর বারোয়ারি। আমাদের আটতলায় তিনটে ফ্ল্যাট ছিল। পাশের একটি ফ্ল্যাটের তিনটি ঘরে থাকতেন তিনটি পরিবার—একটি ঘরে দম্পতি, অন্য দুটিতে পুত্র কন্যাসহ স্বামী স্ত্রী। অন্য তিনঘরের ফ্ল্যাটে থাকতেন প্রকাশালয়ের ডিরেক্টর, তাঁর স্ত্রী বা তাঁদের বয়স্ক ছেলে বা মেয়েকে অন্য ফ্ল্যাটের ছাপোষা বাসিন্দেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখিনি। অবশ্য অফিসে রা অন্যত্র 'ভেচের' বা সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শ্রেণীভেদ একেবারে চোখে পড়তো না। 'ভেচের' মানে বেশিটা নাচ, রুশীরা নাচ-পাগল, সেজন্য ওঁদের নেশা হতো খুব কম। বাড়িতে পার্টি হলে একই ব্যাপার, কথাবার্তা বলতে গেলে হতো না, নাচ শুরু হয়ে যেতো। ও জিনিসটা আমার একেবারে আসে না।*

প্রকাশালয় ছাড়া আরো কয়েকটি সংস্থায় ভারতীয়রা বর্তমান ছিলেন—দূতাবাসের কথা আলাদা—মস্কো রেডিও, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। অধ্যাপক নীরেন রায় কোন্ প্রতিষ্ঠানে ছিলেন ভুলে গিয়েছি। তিন চার জন ছিলেন অজ্ঞাত সংস্থায়, তাঁরা বহু বছরের বাসিন্দা। রেডিওর বাংলা বিভাগ ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যমণি ছিলেন বিনয় রায়, যিনি দেশ-বিভাগের পর ওখানে গিয়ে বছর বারো ছিলেন, শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকের স্বীকৃতি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। কয়েকবছর আগে মস্কোয় কার্যোপলক্ষে গিয়ে গাড়ি চাপা প'ড়ে মারা যান। তার উৎসাহে এখানে 'হিন্দুস্থানী সমাজ' গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকের সময় রবীন্দ্র রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। কবিতার বাছাই ও ইংরেজিতে আক্ষরিক অনুবাদে আমি সাহায্য করি। একজন নবীন রুশ-সাহিত্যিকের সঙ্গে বসতাম। মূল তিন লাইন এক লাইনে অনুবাদ করলে তিনি আপত্তি করতেন, কেননা তাহলে পারিশ্রমিক কম মিলবে। ইংরেজি অনুবাদ তিনি রুশীতে রূপান্তরিত করতেন। সেগুলিকে

* মস্কো প্রসঙ্গে 'সংযোজন' অংশ দ্রষ্টব্য "মস্কোর জীবন" প্রবন্ধ। প্রকাশক

শেষ রূপ দিতেন যাঁরা তাঁদের একজন ছিলেন পাস্তেরনাক। পরে ডক্টর জিভাগোর জন্য তাঁকে যথেষ্ট হেনস্থা করা হলেও শেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদক ও অসাধারণ কবি হিসাবেই সবাই প্রশংসা করতো।

দু-এক বছরের মধ্যে কিছু কিছু রুশীদের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করি। বিশেষ করে ইনটুরিস্ট-এর মতো অফিসে। বিদেশী মুদ্রার প্রতি অতিশয় আসক্তি, রুবলে টিকিট কাটতে গেলে বা হোটেলে থাকতে গেলে অপরিসীম ঔদাসীন্য তাচ্ছিল্যের পর্যায়ে পড়তো। বিদেশী মুদ্রার খোঁজ পথেঘাটে মাঝে মাঝে করতো অল্পবয়সীরা। লেনিনগ্রাদে গিয়ে আমাদের এক রাত কাটাতে হয় একটি অচেনা রুশী পরিবারের সঙ্গে—হোটেলে নাকি বিন্দুমাত্র স্থান নেই, যদিও চোখের ওপরে দেখলাম আমেরিকান, জার্মান, ইংরেজ ইত্যাদিরা অতি সহজে ঘর পেয়ে যাচ্ছেন। পরের দিন আমি যে সাংবাদিক সেটা জানিয়ে দিয়ে কিছু চেঁচামেচি করাতে সঙ্গে সঙ্গে জায়গা পেয়ে গেলাম ওখানকার শ্রেষ্ঠ হোটেলে। তার আগে একবার গিয়েছিলাম দক্ষিণ কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী কয়েকটি অদ্ভুত সুন্দর জায়গায়—সোচি, গাগরা, পিৎসুন্দা, নোভি আফ্‌ন ও সুখুমি। বিশজনের এক একটি দল ট্যুরিস্ট টিকিটে হাওয়াবদলের জন্য গেলে খরচা অনেক কম হয়, তেমন একটি দলের সঙ্গে ছিলাম, আটজন বাঙালি, বাকিরা রুশী। থাকার জায়গা মনোরম না হলেও রুশীদের আন্তরিক সঙ্গ ও সাহচর্যে ভালো লেগেছিল। সুখুমি থেকে জর্জিয়ার রাজধানী তিব্‌লিসে যাবার যথেষ্ট প্রয়াস করি, কিন্তু অনুমতি পাইনি।

রাশিয়া বিরাট দেশ, পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ। জারেরা পরদেশ দখলে বেশ তৎপর ছিলেন। সেগুলি ধ'রে রাখা উত্তরাধিকারীদের মহান কর্তব্য, লেনিনের নীতিবিরুদ্ধ হলেও। ইচ্ছে ছিল আরো কয়েকটি প্রজাতন্ত্রে ঘুরে আসবো, কিন্তু ছুটিতে দেশে আসার ঝোঁকে হয়ে ওঠেনি। একেবারে ফেরার সময় সমরকন্দ ও বোখারার টিকিট কাটার চেষ্টা করি, কিন্তু ইনটুরিস্টের তাচ্ছিল্যে এতো চটে গেলাম যে সটান দিল্লী ফিরি। রুশী বিদেশী দপ্তরে সাংবাদিক হিসেবে অভিযোগ করাতে তাঁরা বলেছিলেন সব বন্দোবস্ত করে দেবেন, প্রথমে তাঁদেরি সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল—কিন্তু তখন মনস্থির করে ফেলেছি।

সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা কয়েক পাতায় লেখা যায় না, বিশেষ করে রাশিয়ার মতো বিরাট ও নানা অর্থে বিচিত্র দেশের বিষয়ে। তবে এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার কথা লিখবো না। আমরা অনুবাদ ক'রে জীবনধারণ করতাম, ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের মতো অতিথি হিসেবে রাজকীয়ভাবে থাকিনি—ভালো হোটেল, গাড়ি, দোভাষিণী ইত্যাদি ইত্যাদি। সেজন্য মুখ বন্ধ রাখার বাধ্যবাধকতা আমার নেই, কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রতাজ্ঞানে লাগে। তাছাড়া প্রাচ্যের মাপকাঠিতে পাশ্চাত্যের বিচার অনুচিত। তবে রুশ পত্র-পত্রিকা গল্প-উপন্যাসে ক্রমাগত যে 'নতুন মানুষ' সৃষ্টির কথা শুনেছি সেই

নতুন মানুষ চোখে পড়েনি। গ্যাগারিনকে আচারে ব্যবহারে ব্যতিক্রম মনে হয়েছিল। এক হিসেবে রুশীরা অরাজনৈতিক। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হ'লে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো আন্দোলন না হ'লে বোধহয় লোকে কর্তাভজা ও অরাজনৈতিক হয়। কম ও বেশি রোজগারী পরিবারের অভীপ্সা ছিল আলাদা ফ্ল্যাট, রেফ্রিজেরেটর, টেলিভিশন, দাচা (শহরের বাইরে বাড়ি, সেটা সরকারের সম্পত্তি নয়) ইত্যাদি, এখন বোধহয় মোটরগাড়ি। 'পোটেম্‌কিন'-এর দেশে 'আওয়ারা' ও রাজকাপুর নিয়ে উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না, 'পথের পাঁচালী' পাত্তা পেত না। কারণ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অসম্ভব ট্র্যাজেডি ও যন্ত্রণার পর দুঃখ-দারিদ্র্যের ছবি ভালো লাগে না। আমেরিকান জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মোহ তখনি দেখেছি। বিদেশে যাওয়া কঠিন ব'লে বন্ধুবান্ধবীরা (অফিসের লোক নয়) আক্ষেপ করতেন। তাঁদের মতে রাশিয়া ঠিক ইউরোপীয় দেশ নয়।

তিন বছর একটানা ওখানে থেকে দেশে এলাম ছুটিতে। মস্কোয় ফিরে আগেকার মতো ভালো লাগলো না। একটা কারণ, শিক্ষার জন্য দুই মেয়েকে দিল্লীতে রেখে আসি। তাছাড়া আমরা যে পাড়ায় থাকতাম সেখানে ভারতীয় অনুবাদক বলতে গেলে আর [কেউ] ছিলেন না। আড্ডার জন্য যেতে হতো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, সেখানে বেশির ভাগ আলাপী ভারতীয়রা থাকতেন।

১৯৬১-তে দুই মেয়েকে নিয়ে আবার ফিরে যাই মস্কোয়, ভেবেছিলাম কয়েক বছর থেকে যাবো। কিন্তু বড়ো মেয়েকে লুমুম্‌বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পারলাম না—'লাল ফিতে'র জন্য। কলকাতায় থাকতে শুনেছিলাম বয়স বাড়ছে, দেশে ফিরে চাকরি পাওয়া কঠিন হবে। ভেবেচিন্তে ছ-মাস পরে পাততাড়ি গুটোলাম, অগস্ট মাসে, মাঝরাতে বিমান বন্দরে অনেক বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গ ছেড়ে।

*

কলকাতায় ফিরে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি নিই। ১৯৬১-তে মস্কো ফেরার আগে দিল্লী থেকে টেলিফোনে কথা হয় সংস্থার পরিচালকের সঙ্গে। কোন চিঠিপত্রের বিনিময় হয়নি। ফোনে বললাম ছ'মাসের আগে ফেরার সম্ভাবনা নেই। পরিচালক জানালেন, ছ'মাসের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে, যদিও সম্ভাবনা কম। মস্কো পৌঁছিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি—ভদ্রলোকের এক কথা'য় বিশ্বাস করতাম।

ফিরে এসে অফিসে দেখা করাতে পরিচালক পরিহাস করলেন—খাস মস্কো থেকে একেবারে আমেরিকান সংস্থায় আসছেন! আমার ধারণা ছিল সংস্থাটি ইংরেজদের। যাই হোক, মস্কোয় সাধারণ লোকদের মধ্যে আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ খুব দেখেনি, যদিও কয়েকবার অপ্রীতিকর আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে, যেমন ইউ-টু বিমানের ব্যাপারটা। গ্যারি পাওয়ারস-এর বিচারে

উপস্থিত ছিলাম, সাংবাদিক হিসেবে (দেশ থেকে আইনজীবীদের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন স্নেহাংশু আচার্য) কিন্তু ওসব ষড়যন্ত্রের মূলে তো ইয়াঙ্কি সরকার, সাধারণ মানুষ নন। তাছাড়া আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতায় ক্রুশ্চভের সবিশেষ আগ্রহ ছিল। আসলে মস্কো থেকে যখন ফিরি তখন অনেকটা অরাজনৈতিক ছিলাম, ওখানকার সঙ্গ-দোষে বা গুণে।

বিজ্ঞাপন সংস্থায় সাত মাস ছিলাম। কাজের চাপ খুব একটা ছিলনা, তবে ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে ভালো লাগতো না। বিজ্ঞাপন লেখার 'সৃষ্টিশীল' কাজে উৎসাহ পেতাম না। লাঞ্চের সময় বেরিয়ে যে গল্প করবো তার উপায় ছিল না, কেননা অফিস থেকে বাড়ির দূরত্ব আধ মিনিট।

সাত মাস পরে কলকাতায় একটি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদকের পদে যোগ দিই। সম্পাদকীয় লিখতে হতো না, সেজন্য খোশ-মেজাজে ছিলাম, কেননা কর্তৃপক্ষের পলিসির সঙ্গে মতের মিল ছিলনা। একটা খুপরি ঘরে ব'সে প্রবন্ধ এডিট্, সংবাদ পরিবেশনে নজর রাখা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি ছিল আমার কাজ। অফিসে দলাদলির অন্ত ছিল না, কিন্তু কখনো জড়িয়ে পড়িনি। ১৯৬২-তে একবার মাদ্রাজ যাই দিন-দশেকের জন্য একটি সেমিনারে ; সেমিনার বসতো 'হিন্দু' পত্রিকার অফিসে। 'হিন্দু'র ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন দেখার মতো। অত্যন্ত solid পত্রিকা সেজন্য কিছুটা নীরস। সেমিনারের সময় ইণ্ডিয়ান প্রেস ইনস্টিটিউটের পত্তনের কথা শুনি।

দৈনিক পত্রিকায় যোগদানের পর সবচেয়ে বড়ো ঘটনা চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। তখন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিরপেক্ষ, তবে রাশিয়া ঘেঁষা। সংঘর্ষকে উপলক্ষ ক'রে গজিয়ে ওঠা সংগঠনগুলিতে চাঁদা দিইনি, কিন্তু 'দেশরক্ষার' জন্য মাইনে থেকে চাঁদা কাটা গেলে আপত্তি করিনি। চীন সম্বন্ধে বিদ্বেষ ছিল না। একদিন অতি ভোরে ঘুম থেকে উঠে কেন জানি মনে হলো চীন যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা ক'রে একতরফাভাবে পিছিয়ে যাবে, ভারত জয়ের অভিলাষ চীনের নেই। চীনের ঘোষণার পর নিজের দূরদর্শিতা নিয়ে কয়েকবার জাঁক করাতে নিরঞ্জন মজুমদার জানালেন যে টাইম্স, অফ্ ইণ্ডিয়ার নানপুরিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী বেশ কিছুদিন আগে দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধে যুক্তিসহ করেছেন। তাছাড়া নিজের দূরদর্শিতা নিয়ে বড়াই করলে লোকে ভাববে বৈদেশিক কোনো সূত্রে সঙ্গে আমার গোপন যোগাযোগ আছে।

পরের বছর রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের ব্রিটেন সফরকালে একটি সাংবাদিক দলের সঙ্গে যাই, ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে। তখন প্রফিউমো কেচ্ছা চলেছে। ম্যাক্মিলান সাহেব উদ্ভ্রান্ত, রাধাকৃষ্ণণকে সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে টুপি খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন আধ মিনিট। মাসখানেক ইংলণ্ড ও স্কট্ল্যাণ্ডে ছিলাম, পুরনো দু-তিনজন বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তারপর পনেরো দিন ছিলাম পশ্চিম জার্মানীতে। ইংলণ্ডে লেবার পার্টির তুলনায় টোরিরা

ছিল বেশি বিনয়ী। পশ্চিম জার্মানীতে সবচেয়ে বিক্ষোভ দেখেছি বার্লিন প্রাচীর নিয়ে। দেড়মাস পরে দেশে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, বিদেশ ভ্রমণের ধকল বেশিদিন ভালো লাগে না। সেই শেষ বিদেশ যাত্রা। ১৯৬৭-র ডিসেম্বরে কিউবা থেকে নিমন্ত্রণ আসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে। সম্মেলন বসে জানুয়ারির শুরুতে। আমার পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। নতুন পাসপোর্ট পেলাম এপ্রিলে—কিউবার নাম কাটা। তখন Now পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। কেন যে ইন্দিরা সরকার সময়মতো পাসপোর্ট দেয়নি, কিউবা কেন তালিকা থেকে বাদ গেল, অনেকদিন ভেবেছি। পরে মনে হয়েছে, ১৯৬৭-র মে-মাসের মাঝামাঝি দিল্লীর চীনা দূতাবাসের প্রথম ও তৃতীয় সচিব আমার সঙ্গে দেখা করেন অফিসে। কয়েক দিন পরে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়। হয়ত ভারত সরকারের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে গুয়েভারার দেশে গেরিলাযুদ্ধে তালিম নিয়ে নকশালবাড়ির সশস্ত্র আন্দোলনে সাহায্য করবো। কিছু কিছু মহলে শুনেছি যে চীনা দূতাবাসের সচিবরা আমাকে কয়েক বাণ্ডিল কাগুজে টাকা দিয়েছিলেন।

কলকাতার দৈনিক পত্রিকা ছাড়ি ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ পরিবেশন নিয়ে মতানৈক্য ঘটাতে। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে সম্পাদকের একটা 'ভদ্রলোকদের চুক্তি' হয় যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারাদের নিয়ে নানা রটনা অন্তত কয়েকদিন যেন প্রাধান্য না পায়।[৩] হঠাৎ এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক ঢাকা ঘুরে এসে খবর দিলেন যে আদমজী পাটকলে নিহতদের সংখ্যা অন্তত দশ হাজার। মালিক ও অধিকাংশ সম্পাদকরা অতিশয় উত্তেজিত ; আর একটি বৈঠকে প্রফুল্ল সেনকে বলা হ'ল যে এ-খবর চাপা দেওয়া হবে না। বৈঠক থেকে ফিরে আমাদের সংবাদপত্র গোষ্ঠির মালিককে বললাম ইংরেজি দৈনিকে খবরটা ফলাও করে ছাপাতে আমরা চাইনা। তিনি রাজী হলেন। হঠাৎ তাঁকে জানালাম যে তাঁর বাংলা দৈনিকে ইতিমধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমার বিবমিষা হয়। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে উত্তর দিলেন—কিছুদিন ধরে আমার এ মনোভাবের আঁচ তিনি পেয়েছেন। ইংরেজি পত্রিকা আমাদের মতে চালাতে পারি, বাংলা দৈনিকের কথা আলাদা। হক্ কথা, খুশি হয়ে নিজের খুপরি ঘরে ফিরলাম। দিনকয়েক পরে, ৩০শে জানুয়ারী (গান্ধীজীর মৃত্যু দিবস) সকালে ইংরেজি পত্রিকায় দেখলাম আগেকার চেপে যাওয়া নানা অদ্ভুত রিপোর্টের সঙ্গে আরও অনেক কিছু ফলাও করে ছাপানো হয়েছে। অফিসে গিয়ে শুনলাম মালিকের নির্দেশ। সেদিনই পদত্যাগ পত্র পাঠাই। তারপর আমার ঘরে লোকের আনাগোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। বিগত সরোজ আচার্য ছাড়া, যাঁর মতো নিরভিমান ও গুণী লোক বিরল। তাড়াতাড়িতে লেখা পদত্যাগ পত্রে আসল কারণের উল্লেখ ছিল না। ছিল একটা অভিমানের সুর। একটা নীতিনিষ্ঠ জ্বলাময় বিবৃতির সুযোগ হারাই। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে

থেকে গেল, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হ'ল না। একথা বলেন অন্যরা।

নতুন চাকরি'র চেষ্টা শুরু হ'ল। চঞ্চল সরকার (ইণ্ডিয়ান প্রেস ইনস্টিটিউটের) ও অমিতাভ চৌধুরী ('শ্রীনিরপেক্ষ') বাড়িতে এসে বললেন বাগবাজারী পত্রিকায় কাজ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত হ'ল না। আমার পদত্যাগের ব্যাপার আতোয়ার রহমানের কাছে শুনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য আমার এককালীন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির কিছুদিন পরে জানালেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি জোরদার করার জন্য একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করা বিশেষ দরকার। সম্পাদনার ভার দিলেন আমাকে। প্রায় ছ-মাস প্রস্তুতির পর Now পত্রিকা প্রথম বেরোল অক্টোবরের প্রথমে (১৯৬৪)। শুনেছিলাম সাপ্তাহিক চালানো কঠিন ব্যাপার, দুঃসাধ্য পরিশ্রম করতে হয়। খাটতে অবশ্য হয়েছিল অনেক, কতোজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা, পত্রালাপ। ব্যবসায়িক দিকটা নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। শুরু হবার পর নিয়মিত প্রকাশনে ছেদ পড়েনি।

'নাও'-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে মাস দেড়েকের জন্য প্রথমে কাজ করেছিলেন পুসি সেন। লোকেশ ঘটক (ঋত্বিকের ভাই) শুনেছিলাম চাপে পড়ে ভালো লেখেন; কিন্তু সকালে যে-অবস্থায় অফিসে পৌঁছতেন তখন চাপ দেওয়া সহজ ছিলনা। এর পর বেশ কিছুদিন শ্যামলেন্দু ব্যানার্জি ছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত জাগতেন (অফিসে নয়) অনিদ্রার অবসাদ কাটতো বেলা দেড়টা নাগাদ কফি হাউসে। সংশোধনবাদ সম্বন্ধে প্রখর ভাবে সচেতন ছিলেন। ও-বিষয়ে আমি বিশেষ ওয়াকিবহাল তখনো ছিলাম না। শ্যামলেন্দুর পরে আসেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ। 'নাও' এবং 'ফ্রণ্টিয়ার'-এ নিয়মিত সম্পাদকীয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জন মজুমদার ('ফ্রণ্টিয়ার'-এ বেশি দিন নয়), শঙ্কর ঘোষ, অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, নয়ন চন্দ, কুণাল বোস, জয়ন্ত সরকার ইত্যাদি। কখনো সখনো সম্পাদকীয় লিখতেন নির্মল চন্দ্র, অশোক রুদ্র প্রমুখেরা—এঁদের প্রবন্ধের উল্লেখ এখানে করছি না।

প্রথম প্রথম পত্রিকাটি ছিল দেশী-বিদেশী খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনার সমষ্টি, বিশেষ একটা 'চরিত্র' দানা বেঁধে ওঠেনি। সম্পাদকীয় লেখকদের দু-একজনের (বিশেষ ক'রে অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের) প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত একটা বামপন্থী রূপ আসে। কবির সাহেব দিল্লী থেকে চিঠি লিখে মৃদু আপত্তি জানাতেন, কিন্তু খবরদারির চেষ্টা করেননি। বঙ্গদেশীয় রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ার আগে তাঁর একটা অধ্যাপকসুলভ, উদারপন্থী (liberal) মনোভাব ছিল। 'নাও'তে প্রকাশিত অনেক কিছু কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তাঁর ক্ষতি করে বলে আমার বিশ্বাস, (এ বিষয়ে অতুল্য ঘোষ মশাই বলতে পারেন) কিন্তু পত্রিকায় মন্ত্রিসুলভ উদ্ধত হস্তক্ষেপ তিনি

করতেন না। তাঁর কয়েকটি লেখা পর্যন্ত আমরা ছাপাইনি। সত্যিকার গণ্ডগোল শুরু হয় ১৯৬৭-র নির্বাচন ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও পতনের পর, যে দুটোতেই তাঁর হাত ছিল। 'হিংসাত্মক' আন্দোলনের বিস্তারে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, সি. পি. এম-এর বর্ধমান প্রভাব মনে দুশ্চিন্তা আনে। 'নাও'-এর কাটতি বেড়ে চলেছে শুনে অস্বস্তিবোধও প্রকাশ করতেন। মনস্থির করতে কিন্তু তাঁর সময় লাগতো।

১৯৬৭-র জানুয়ারিতে বাড়িতে একটি দুর্ঘটনায় আমার ডান হাত জখম হওয়াতে শরীর ও মেজাজ ভালো ছিলনা। হঠাৎ একদিন কবির ডেকে পাঠালেন। একে অফিস যাবার আগে, যানবাহনের অসুবিধে, তায় হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বিরক্ত হয়ে সেণ্ট্রাল গভর্মেণ্ট হস্টেলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম একটি ভদ্রমহিলা ও একজন সাহিত্যিক বসে আছেন। কবির বললেন নির্বাচনের আগের সংখ্যাগুলিতে তাঁর লেখা দুটি সম্পাদকীয় ছাপাতে হবে। কোন পার্টির সমর্থনে? বাংলা কংগ্রেস। বললাম ও-বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখার ভার ইতিমধ্যে একজনকে দিয়েছি। কবির বললেন অন্য সম্পাদকীয় বের করা চলবেনা। এভাবে তিনি কখনো আমাকে নির্দেশ বা আদেশ দেননি। বললাম, তাহলে বিনা বিলম্বে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দুজনের যাওয়া দরকার। সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞেস করাতে জানলাম, তিনি যে নতুন সম্পাদক হচ্ছেন তার ডিক্লারেশন ওখানে করা নিয়ম। কবির শেষ পর্যন্ত নরম হয়ে বললেন A correspondent writes এ ভাবে ছাপালেও চলবে (মন্তব্যে ওঁর নাম বেশ কিছু জায়গায় বাদ দিয়ে ছাপানো হয়)। সেদিন অফিসে গিয়ে আতোয়ার রহমানের কাছে শুনলাম যে কবিরের ঘরে উপস্থিত ভদ্রমহিলাটি তাঁর স্ত্রী। আগে জানলে হয়ত এতোটা উদ্ধত ব্যবহার করতাম না। কবির সাহেবের আর একটি মন্তব্য ইচ্ছে করে ধরে রেখে নির্বাচনের আগে না ছাপিয়ে ভুল করি। কেননা বক্তব্য যাই হোক, নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ প্রায় নির্ভুল প্রমাণিত হয়। এ-সব ব্যাপারের পরও কবিরের ব্যক্তিগত ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠনের পর 'নাও' ছিল সি.পি.এম.-এর সমর্থক। বেশিদিন নয়, অন্তত ব্যক্তিগতভাবে নয়। নকশালবাড়িতে নারী ও শিশু হত্যার পর সি. পি. এম.-এর ক্ষীণকণ্ঠ প্রতিবাদ, বিক্ষুব্ধদের বিতাড়ন ও যেনতেন প্রকারেণ সরকারে টিকে থাকার 'রণকৌশল' আমাকে মোহমুক্ত করে। রাষ্ট্রপতির শাসন যে-ভাবে চাপানো হয় তাতে সাময়িকভাবে সি. পি. এম.-কে সমর্থন করা হয়। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পিছনে কবিরের হাত ছিল অনেকটা। তার কিছুদিন পরে আমাকে পত্রপাঠ 'নাও' থেকে পদত্যাগ করার (বেআইনী) আদেশ আসে। দু-তিন সপ্তাহ 'প্রতিরোধ' করি; তারপর দেখলাম অর্থবল যখন অন্যদের, নেশন ট্রাস্টের, তখন একলা লড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, আতোয়ার রহমান (তাঁর সরকারী অফিস ও 'চতুরঙ্গ'র

কার্যালয় ছিল পাশের ঘরে, তিনি কবিরের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন নানা-ভাবে) খবর দিলেন যে একজন ম্যানেজিং এডিটর নেওয়া হচ্ছে, ফলে আমাকে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। বুঝলাম বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষতিপূরণের দাবী জানিয়ে জানুয়ারির (১৯৬৮) প্রথম দিকে অফিস থেকে পাত্তাড় গুটোলাম।[৪]

প্রথম দিকে 'নাও'-এর সঙ্গে যাঁরা মাসিক ভিত্তিতে যুক্ত ছিলেন তাঁদের একজন উৎপল দত্ত। আমি অফিসে পৌঁছবার আগেই ক্ষিপ্রগতিতে ও নির্ভুল-ভাবে কাজ শেষ করে চলে যেতেন। ক্রমশ নাটক গোষ্ঠির চাপে লেখা কমে আসতে থাকে, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। উৎপল দত্তের রাজনৈতিক পালাবদল সুবিদিত—"তীর" হতে এখন বামক্রান্তের তরী—কিন্তু তাঁর ক্ষমতা অনস্বীকার্য। অবশ্য শুনি যে 'line' ঠিক না থাকলে শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায়। আর্থিক উন্নতি ছাড়া।

নিয়মিত লিখতেন নীরদ চৌধুরী। দু-একবার তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে DIR প্রয়োগ হতে পারে শুনেছিলাম, বিশেষ করে ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য। লিণ্ডসে এমারসনের (ইংরেজিতে দুটো M—Emmerson—তাঁর ভাষায়, "to distinguish myself from the great American bore") জবাব ছাপাতে খুব সম্ভব বিপদ কেটে যায়। চীন বিষয়ে পণ্ডিত সুন্দরলালের প্রবন্ধ নিয়ে একই গুজব শুনি। শেষ পর্যন্ত, ইন্দিরা গান্ধীর বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ একবার ছাপার পর দ্বিতীয়টিতে আপত্তি করাতে নীরদবাবু লেখা বন্ধ করেন। তাঁর আগে দু-একবার বন্ধ করেছিলেন।[৫]

সুকুমার রায়ের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ বোধ হয় প্রথম 'নাও'-তে বের করেন সত্যজিৎ রায়। তাছাড়া মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। লিখতেন অনেক নাম-করা ব্যক্তি। পত্রিকার সূত্রে দেশী-বিদেশী অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়, সাক্ষাতে বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। পরে আরও অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় 'ফ্রণ্টিয়ার'-এর সূত্রে। সে যুগে 'নাও'-র যে বিশেষ একটি ভূমিকা ছিল সে-বিষয়ে অবহিত হই 'এক্ষণ'-এ প্রকাশিত অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধ পাঠের পর। অবশ্য বিদেশে প্রকাশিত তাঁর Calcutta Diary-তে 'নাও'-এ তাঁর রচিত কোন লেখা স্থান পায়নি।

সাপ্তাহিক চালনায় বেশ কিছু কৌশল রপ্ত করা দরকার। নানান ধরনের লেখক, অনেকে স্পর্শকাতর, সমালোচনায় অসহিষ্ণু। গোষ্ঠি টিকিয়ে রাখতে সম্পাদককে অল্পবিস্তর মিথ্যার সাহায্য নিতে হয়, মাঝে মাঝে ন্যাকা সাজতে হয়। এ-সব গুণ রপ্ত করেছিলাম 'পত্রিকার স্বার্থে'। 'নাও'-এর Letters to the Editor (ব্যক্তিগত) ফাইল সরাবার কথা তখন মনে হয়নি। তবু হাতে বেশ কিছু চিঠিপত্র আছে, কিন্তু পত্রলেখকদের অনুমতি ছাড়া ছাপানো নাকি বেআইনী। তাছাড়া উত্তরে আমি যা লিখেছি তার কপি নেই—এবং মনে

নেই—ব'লে সাহস হয় না। 'নাও'-এর ব্যক্তিগত ফাইলটি মূল্যবান, তবে আমার ধারণা সেটার হদিস পাওয়া যাবে না, বিশেষ ক'রে আতোয়ার রহমানের মৃত্যুর পর।

'নাও' থেকে বিতাড়িত হবার হপ্তা-দুয়েক পরে নতুন পত্রিকার প্রস্তুতি শুরু করি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে আমার বিতাড়নের কিছুটা সম্বন্ধ ছিল ব'লে ভাবী পত্রিকার বিষয়ে সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির অভাব হয়নি। অনেকের সঙ্গে আলোচনার ফলে ধারণা জন্মে যে ৬০,০০০ টাকা তোলা কঠিন হবে না। কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার' বেরোবার মুখে হাজার ন'য়েক ওঠে, ভাইবোন ও বন্ধুদের কাছ থেকে। 'নাও'-এর গ্রাহক ও এজেন্টদের তালিকার কপি আমার কাছে ছিল। তিন সপ্তাহে ৬০০ পোস্টকার্ড নিজের হাতে লিখে বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠাই—সাড়া পাই প্রচুর। পুরনো লেখকগোষ্ঠি দল বেঁধে নতুন পত্রিকায় চলে আসেন। চলে আসেন ব্যবস্থাপনার কাজে জন বেবী ও গুলাম রশুল। সাহায্য করেন তরুণ চট্টোপাধ্যায় ও রবি সেন। নৃপেন সান্যালের সাহায্যের কথা ভুলবোনা।

কয়েকজন কালক্রমে মতাদর্শগত ও অন্যান্য কারণে লেখা বন্ধ করেন। কিন্তু সাংবাদিকতা যে শুধু পয়সার খেলা নয় সেটা তাঁদের প্রাথমিক সহযোগিতা প্রমাণ করে। অন্য কারণে দু-একজন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ কখনো লেখেন নি। কিংগ্‌সলি মার্টিন একদা 'নাও'-এর ভক্ত ছিলেন[৬] কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখেন নি। লেখেননি নীরদবাবু।

প্রথমদিকে খাটতে হয় প্রচুর। 'দর্পণ'-এর সম্পাদকমণ্ডলী দেড়টা ঘর ছেড়ে দেন। তালাচাবি কেনা, ফার্নিচার ভাড়া করা থেকে কাগজের বন্দোবস্ত নানা জায়গায় পায়ে হেঁটে করতে হয়। দু-একটা অভিজ্ঞতা ভুলবো না। ডাকঘরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেলে দু-পয়সায় পত্রিকা পাঠানো যাবে, নইলে বিশ পয়সায়। ডাকঘরের দু-একজন বড়ো কর্তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি ভাবী গ্রাহক তালিকা নিয়ে, যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায়। কিন্তু দেখলাম একটি বাংলা সাপ্তাহিক সাত দিনের মধ্যে পেল, আমাদের লাগলো তিন হপ্তার বেশি। শুনলাম বাংলা সাপ্তাহিকটি একটি কেরানীকে ৩০ টাকা দেওয়াতে ব্যাপারটা অতি সহজে হয়ে যায়। উৎকোচের কথা ঠিক কী করে তোলা যায় জানতাম না, সংকোচ হতো—এখনো হয়।

'ফ্রন্টিয়ার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮-র ১৪ই এপ্রিল, বাংলা নববর্ষে। প্রথমে ভেবেছিলাম টাকার অভাবে হয়তো আটকে যাবে, কিন্তু প্রথম থেকে কাটতি আশাতীত হওয়াতে ব্যাপারটা দাঁড়ালো মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো। প্রথম দু-এক বছর বিশেষ কোনো অনুবিধে হয়নি, প্রাণপণ খাটুনি ও ব্যক্তিগত অর্থকষ্ট ছাড়া। ('নাও'-তে ব্যবসার দিক, অর্থচিন্তা আমাকে করতে হতো না)। 'নাও'-এর তুলনায় প্রথম বছর মাইনে ছিল অর্ধেকের কম। তারপর মাইনের ব্যাপারটা snakes and ladders-এর মতো, কখনো বাড়ে কখনো কমে,

পত্রিকার আর্থিক অবস্থা বুঝে। দশ বছর কেটে গেছে, এখন প্রায়ই মনে হয়, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছি—ভারতীয় মোষ তাড়ানো অবশ্য কোন পত্রিকার সাধ্যের বাইরে। বিশেষ করে বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যক্তিরা অনেকে যখন বলেন 'ফ্রন্টিয়ার'-এর জন্য 'আপনাকে শ্রদ্ধা করি' তখন মনে হয় শ্রদ্ধায় চিঁড়ে ভেজে না।

দিনকাল ছিল উত্তেজনায় ভরা। ১৯৬৮-তে চারদিকে গরম হাওয়া, দেশে ও বিদেশে। দেশে নকশালবাড়ি আন্দোলন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করা হয় অবশ্য, কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কীর্তিকলাপ উজ্জ্বল মনে হয়নি। অনেকে ভুলে গিয়েছেন যে খুনোখুনি প্রথম শুরু হয় ফ্রন্টসরকারের শরিকদের মধ্যে, ক্ষমতা-বিস্তারের 'সংগ্রামে'। তারপর শুরু হয় নকশালপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষ। জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু নিহত মার্কসবাদীদের কথা এখনো কথায় কথায় বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতিবাবুর জানা উচিত যে একজন মার্কসবাদী নিহত হলে অন্তত চারজন নকশালপন্থী খতম হতেন। তাছাড়া থানা পুলিশ তাঁর হাতে ছিল, ওখানে নকশালপন্থীদের যাবার কোন উপায় ছিলনা।

'ফ্রন্টিয়ার' নকশাল-ঘেঁষা পত্রিকা বলে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করে। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হবার পর পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখায় ইন্দিরা-ঘেঁষা উচ্ছ্বাস এখন পড়ে বিব্রত বোধ করি। 'বুড়োর দল' বিদায় হওয়াতে খারাপ লাগেনি, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের মানে ছিলনা।

১৯৭০-৭১ সালে নকশালপন্থীদের উচ্ছেদে সি. পি. এম-এর ভূমিকা? পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। কিন্তু মুজিবরের ব্যাপারে ভারতীয় সশস্ত্র-বাহিনীর হস্তক্ষেপে সি. পি. এম-এর রাতারাতি ভোল বদল বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইন্দিরাবিরোধী, কিন্তু পরদেশের সঙ্গে সংঘাত লাগলে জাতীয় সরকারকে সমর্থন—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই ভূমিকা সি. পি. এম অনেকটা বজায় রেখেছে—চীনের সঙ্গে ১৯৬২-র সংঘর্ষটা অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম।

১৯৭২-এ নির্বাচনের কারচুপি হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী, তিনি তখন উপমহাদেশের সুলতানা। তাঁর গুণমুগ্ধ সি. পি. এম নির্বাচনে যে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না পার্টির জানা উচিত ছিল। কিন্তু মাত্র ১৩-১৪টি আসন! ওটা ভাবা যায় না।

ষাট-সত্তর দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের মহাকাব্য মানুষের আস্থাকে জিইয়ে রাখে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নতুন আদর্শের সৃষ্টি করে। উৎপাদন ক্ষমতা হাতে এলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ অব্যাহত হয় না, হাজার হাজার বছরের স্তূপীকৃত মানসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জঞ্জাল অপসারণ, মনের কাঠামো, অভ্যাস পরিবর্তনের সংগ্রাম না চালালে সংশোধনবাদ বারে বারে ফিরে আসে।

দেশের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে চলে। মহান নেত্রীর মহিমা বেশিদিন থাকেনি। ১৯৭৪-এর রেলওয়ে ধর্মঘট দমনের নৃশংসতা, কানকাটা মিথ্যাচার যে ইঙ্গিত বহন করে তা অনেকে ধরতে পারেননি। আমাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলির দূরদর্শিতা বিশেষ দেখি না। কোন সময় কাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় আমরা জানি না। তা ছাড়া ইন্দিরার পিছনে ছিল মহান সোভিয়েত দেশ, নেতৃত্ব না হয় সংশোধনবাদী কিন্তু বৈদেশিক কার্যকলাপে অতীব বিপ্লবী!

পূর্ব পাকিস্তানে, সিংহলে আন্দোলনের সময় চীনা নেতাদের বিবৃতি ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লাগেনি। বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য চীনের বিশ্লেষণকে অনেকটা সমর্থন করে, কেননা চীনের প্রধান আপত্তি ছিল ভারতের হস্তক্ষেপে। 'এক কোটি' উদ্বাস্তু আগমনের অনেক আগে, প্রায় এপ্রিলের শুরু থেকে ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আছে।

দেশে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন বিহার এবং অন্যত্র বাড়তে থাকে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়, গুজরাটে কংগ্রেসের পরাজয়—সব মিলিয়ে ভদ্রমহিলা অতি বিব্রত হয়ে পড়লেন। কথা ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে সি. পি. এম. পন্থীদের চলা যেতে পারে। ময়দানের বিরাট একটা জনসভায় এ নীতি ঘোষিত হয়। নীতিটি পালন করা হয়নি অবশ্য।

২৬ জুন ট্রামে অফিসে যাচ্ছি, জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা শুনে প্রথমে কান দিইনি—একটা তো জরুরি অবস্থা চালু আছে, আর একটা আবার কোথা থেকে আসবে? কফি হাউসে গিয়ে শুনলাম প্রি-সেন্সরশিপ চালু হচ্ছে। 'ফ্রন্টিয়ার' তখন প্রেসে—তারিখ থাকবে ২৮ জুন। ওই সংখ্যায় ইন্দিরা গান্ধী বিষয়ে একটি অতিশয় তীব্র সম্পাদকীয় ছিল (আমার লেখা নয়)। ওটা তখনো বন্ধ করা যেতো; কিন্তু গা করিনি। পরে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। ৫ জুলাই সংখ্যায় প্রি-সেন্সরশিপের দরুন নানা অসুবিধের কথা তুলে একটি নোটিশ ছাপা হয়। কর্তৃপক্ষ লেখেন ওটা highly objectionable। দু-একটি ছাড়া সরকারী বিজ্ঞাপন অবশ্য বন্ধ হয়ে যায় অনেক আগে, ১৯৭১ ডিসেম্বরে, রেডিও পাকিস্তান 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদকীয় থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি পাঠ করার পর।

প্রি-সেন্সরশিপ ব্যাপারটা কী, কীভাবে চলতে হবে, কিছু জানতাম না প্রথম দিন-দুই। তারপর কয়েকটা সপ্তাহ লেখাপত্র মহাকরণে দিয়ে আসতাম, ফেরৎ পেতাম পরের দিন। শেষে মহাকরণে লিখলাম এ-ভাবে সাপ্তাহিক নিয়মিত বের করা চলে না, অনেক কিছু শেষ মুহূর্তে ছাপাতে হয়—এবং তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সম্পাদকের। ছাপাখানায় বিশৃঙ্খলা ও অর্থের অভাবে কাজকর্ম ভালো হতো না, তাই মহাকরণে লেখা পাঠানো বন্ধ করে দিতে হ'ল।

বিদেশী ব্যাপার নিয়ে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ বেরোত, দেশের ব্যাপারে From the Press শীর্ষক একটি বিভাগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হতো। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হতো এভাবে পত্রিকা চালানো অর্থহীন। কিন্তু মানুষ অভ্যাস ও রুজির দাস। পত্রিকা উঠে গেল কয়েকজন বেকার হবে।

এমারজেন্সির সময় পুরনো লেখকগোষ্ঠির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়, তার প্রধান কারণ দেশের বিষয়ে খোলাখুলিভাবে লেখার উপায় ছিল না। কোনক্রমে একটা সম্পাদকীয় লিখতে পারলেই যথেষ্ট। ঝোঁক হতো এমন একটা কিছু ছাপাই যাতে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে উত্তর ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কড়াকড়ি কম ছিল। এখানে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের চেলাচামুণ্ডারা ইংরেজিতে ওয়াকিবহাল নয় বলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর কিছুটা সুবিধে হয়। একজন মন্ত্রীতো 'স্টেটস্‌ম্যান' অফিস থেকে রাত্রে বেরিয়ে এসে সগর্বে বলেন যে সব কিছু 'census' করে দিয়ে এসেছেন।

একবার ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে চার পৃষ্ঠার একটি গল্প কম্পোজ করে প্রেসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, খবর এলো ওটা ছাপানো চলবে না—গেরিলা যুদ্ধের কথা না তোলাই ভালো। খবরটি দিল্লীর ভিয়েতনাম দূতাবাসে একজন বিদেশী সাংবাদিকের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দেওয়াতে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। 'ফ্যাসিস্টবিরোধী' সংগ্রামে মাঝে মাঝে বিচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সম্ভবত তাই পাটনার ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে হ্যানয়ের প্রতিনিধিরা আসেন (এই অংশটি যখন লিখি তখন চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের ঝামেলা বাধেনি)।

দিন কাটছিল, দিনগত পাপক্ষয়। ১৯৭৬-এর মার্চের শেষে অফিসে বসে আছি, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর একটি ফর্মা ছাপা হয়েছে, আর একটি মেসিনে উঠেছে, হঠাৎ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে। 'দর্পণ' পত্রিকা কোনো লেখা মহাকরণে পাঠায় না, (আমরাও পাঠাতাম না) সেই 'দর্পণ' মুদ্রণের অপরাধে প্রেস বন্ধ করা হ'ল, 'দর্পণ'-এর সম্পাদককে কোনো চিঠি লেখার প্রয়োজন সরকার বোধ করেনি। ছাপাখানায় চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে সশস্ত্র পাহারা। 'ফ্রন্টিয়ার' ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। মাস দেড়েক পরে সরকারের অনুমতি নিয়ে আমাদের নিউজপ্রিণ্ট, প্রবন্ধ ইত্যাদি খালাস করতে গিয়ে শুনলাম ছাপাখানার পেছনদিকে রাখা কয়েকটি ভারী ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি পাচার হয়ে গেছে। একজন সশস্ত্র প্রহরী বলল, "বাবা, রাত্তিরে ওদিকে কে যায়, গা ছমছম করে।"

এপ্রিল-মে 'ফ্রন্টিয়ার' বন্ধ রইলো (বন্ধ না থাকলে হয়তো ঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি ছবি প্রথম দেখার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হতো না)। অন্য ছাপাখানায় যাওয়া সম্ভব নয়, কেননা কর্তৃপক্ষ কামান দাগবেন ছাপাখানার উপর! পরে অত্যন্ত ছোট একটি ছাপাখানা ভার নিতে কর্তৃপক্ষকে জানালাম প্রয়োজনবোধ

করলে তাঁরা যেন পত্রিকার বিরুদ্ধি action নেন, ছাপাখানার বিরুদ্ধে নয়। প্রথম প্রথম কিছু গ্যালি প্রুফ পাঠানো হতো, মুখ বন্ধের জন্য! কিন্তু তখন ২৪ ঘণ্টা নয়, প্রবন্ধাদি ফেরৎ পেতে প্রায় ২৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো। সাপ্তাহিক এভাবে চলে না। লেখা পাঠানো আবার বন্ধ হল। এমারজেন্সিতে কিছু শিথিলতা তখন এসে গিয়েছে, অন্তত পূর্ব ভারতে।

১৯৭৬-এর বম্বে যাই, ফিরে আসার কয়েকদিন পরে নেহরু কন্যা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল বিরোধী দল সুবিধে করতে পারবে না অর্থ, লোকবল ও সংগঠনের অভাবে। বাবুজীর পদত্যাগের পর শ্রীমতীর আবোলতাবোল কথাবার্তায় মনে হ'ল তিনি বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। তবে গোহারান হারবেন ভাবতে পারি নি। জুনে আবার কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে সে পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি হ'ল।

সে আশা-ভরসার দিন বিগত। (পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনেকে অবশ্য আশাবাদী)। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না। অধিকাংশ ব্যাপারে অপরিসীম ক্লান্তি এসেছে। কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি মৃত্যু ঘটে আপনজনের। অসীম পরহিতকারী যে দাদার বাড়িতে প্রতি রবিবার আড্ডা হতো, তিনি মারা গেলেন ১৯৭৪ সালে; তার দিন পঁচিশেক পরে বাবা, ৮৩ বছর বয়সে। ১৯৭৭ সালে আমার মেজভাই বিগত হন। সেরিব্র্যাল স্ট্রোকের আগের দিন সন্ধেবেলায় তাঁর ওখানে ঘণ্টা তিনেক আড্ডা দিয়েছিলাম। বেসরকারী বৈমানিক অরুণ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মজুমদার, কামাক্ষীপ্রসাদ তার আগেই বিগত হন। আরো কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে, একজন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এমারজেন্সির সময় হৃদ্‌তত্ত্ববিদ ডঃ অমিয় বোস মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতেন; বলতেন কিছু একটা করা দরকার। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি পুলিশের বর্বরতা বিষয়ে একটি তথ্যভিত্তিক বই প্রকাশ করার উদ্যোগ করেছিল, সেটা ডঃ বোস শেষ করে যেতে পারেন নি। লিগাল এইড্ কমিটির হয়ে কিছু টাকা তুলি—কিন্তু এমারজেন্সির সময় চাঁদা তোলা বন্ধ হয়ে যায়।

বিদেশের পরিস্থিতি অনেক আশা ও আদর্শে আঘাত হেনেছে গত দু-দিন বছরে। তবে আমাদের মতো লোকের প্রতিক্রিয়ায় কী এসে যায়? আমরা এতদিনে নিজেরি ঘর সামলাতে পারিনি।

বাবু বৃত্তান্তে আমার ও বন্ধুবান্ধবদের অনেক কথা ইচ্ছে করে লিখিনি। অনেকে বর্তমান। আমার স্ত্রী ও দুই কন্যা, দুই নাতনি—বড়োটি ইতিমধ্যে বেশ লায়েক হয়েছে—এরা আমার নির্ভীক আত্মকথায় পুলকিত হবে না, যেমন হবেন না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবিশেষ বাদ দিলে দেশ ও দশের কী ক্ষতি? আমার বন্ধু ও বান্ধবী ভাগ্য—আঠারো বছর বয়স থেকে—সামান্য নয়, কিন্তু তাঁদের বিষয়ে লিখতে গেলে খেই পাবো না। কয়েকজনের প্রভাব আমার (একদা) সাহিত্যিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায়

ব্যাপক কিন্তু এ-মুহূর্তে সেটা চেপে যাওয়া ভালো। মধ্যবিত্তের দৌড় সুবিদিত।

মে-জুলাই ১৯৭৮

---

১. পত্রাংশ : (তারিখ নেই)

স্নেহের সমর

…অরুণবাবুর সঙ্গে আজকাল মধ্যে মধ্যে দেখা হয়—তোমার সম্বন্ধে একেবারে হতাশ, তাই বোধহয় আমার প্রতি পুনর্বৎসল। রাধারমণবাবু, গোস্বামী, হীরেনদের সম্বন্ধে অরুণবাবু ভীষণ ক্ষিপ্ত। সুভাষকে ও বুদ্ধদেবকেও সাবধান করে দিয়েছেন…

বিষ্ণু

পত্রাংশ : পি ১০৪/১ লেক রোড, কালীঘাট
২রা বৈশাখ, ১৩৪৮

সমরবাবু

…ওদিকেতো সুভাষবাবু নিরুদ্দেশ হ'লেন। আপনার পিতৃদেব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন (একদিন সকালে দেখা গেল সারা কলকাতায় লাল ইস্তাহার—'সুভাষবাবু বার্লিনে' এবং ওদের organisation এমনিই শক্ত যে একরাত্তিরে ঐ সূত্রে ৬০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে) আপনাকে বুদ্ধদেববাবুকে আর আমাকে 'ভাবী ডিক্টেটর' সুভাষবাবু ফাঁসি দেবে। এখন থেকে গলাটা শক্ত করুন।…

ইতি
সুভাষ

২. কোন একটি সান্ধ্য ঝগড়ার পর লিখিত :

Sobha Dutta (Janah) 57, Rashbehari Avenue
Calcutta-26
Phone : South 1310

For

Samar, the Albino Rat
Arsenic Oxide……1 oz
To take liberally, preferably with potent alcoholic beverages till extinction is effected.
Patient to report to doctor this evening at 7 P.M.

SJ.
11.1.55

৩. প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের পর এই নির্দেশটা রিপোর্টার ও সাব-এডিটরদের পাঠানো হয় :

For publication of news of incidents in East Pakistan, it has been agreed to follow for seven days from today the following code :

1. To publish nothing but news circulated by PTI from Pakistan, 2. To publish no photographs of incidents in East Pakistan or of refugees arriving from there. 3. To publish no interviews with refugees. 4. When reproducing from the Pakistan Press, always to acknowledge the sources, and 5. to publish such news of incidents in Pakistan with one-column headlines and with no display and not on Page 1.

16.1.64

(আজকালকার দিনে এটা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় ঘোরতর হস্তক্ষেপ মনে হতে পারে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা থাকা কি উচিত ?—লেখক)

৪. পত্রাংশ :

Minister for Petroleum &
Chemicals
Government of India
New Delhi
5th June, 1965

Dear Shri Sen,

For the first time since the publication of NOW there are two or three articles which to may mind have fallen from the high standard you have set yourself··· You will remember that the central policy of NOW must be non-alignment internally and externally. This issue does lend some justification to the criticism that it leans a little to the left. I am sure this is not the picture you have in mind.

I am expecting to come to Calcutta on 24th or 25th June when we can discuss this further.

Yours sincerely
Humayun Kabir

নিচের চিঠির কপি আমাকে পাঠানো হয়েছিল। আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

15th June, 1965

Dear Shri···

···It (Now) is of course left wing, but you will appreciate that today almost all intellectuals are left-wing. In the home of capitalism in U.S.A., left-wing forces are strong and vocal. All that we have to guard is that the paper is not destructive and this I think we can definitely claim. Once Mr. Tata was travelling with me in the plane and he said that he liked the articles of Now even though he did not always agree··· Shri Masani also recently had a talk with Shri Lalbhai Patel and told him that while he often disagreed with Now, he found the paper had a fresh and original approach which was independent of government and all political parties.

Yours sincerely
Sd.
(Humayun Kabir)

Prof. Humayun Kabir
Member of Parliament
(Lok Sabha)

8, Ashoke Road,
New Delhi,
November 24. 1967

My dear Samar Babu

As you know I have sometimes been un-happy about the policy and the general trend of NOW. When we invited you to be the Editor, we told you that the Editor would have the full independence within the limits of the policy of the Trust. The Trust was establish to advance the cause of democracy and develop public opinion insisting on constitutional methods as the only way of bringing about radical change. The Trust has included some provisions of the constitution among its Articles and as such any appeal to violence or extra-constituoional methods would be outside the policy of the Trust.

I think you will agree that as Editor you have had full independence not only in editorial but also in financial matters. The Trustees had a right to expect that you would honour the commitments you had made with them but it seems that in the recent months the paper has become the mouthpiece of a particular political coterie. The Trustees have never objected to independent criticism but they cannot agree that the paper should toe the line of some anti-national groups.

I had intended to talk to you when I was in Calcutta in the last few days but I was too busy to do so. On my return to Delhi I have received the enclosed letter from another trustee. It is time that we should meet with the members of the Trust in which we can discuss the general policy of the paper afresh and decide how it is to be run in the future.

Yours sincerely
Humayun Kabir

Copy of letter dated November 22, 1967 by Shri M. R. Shervani, M. P. (Rajya Sabha), 11 Sunder Nagar, New Delhi.

I am feeling increasingly unhappy at the Editorials of 'Now'. It is almost become a mouth-piece of the CPI(M).

After all, you and I are the founders as well as owners of the paper as Trustees. I believe in an independent journalism, but to do that, a journalist should be a free lance. If Mr. Samar Sen has accepted employment with us, he must carry out our policy.

Yours sincerely
Sd/ M. R. Shervani

Calcutta
December 14, 1967

Dear Sir,

We regret to inform you that your services with

this Trust as Editor of "Now" are no longer required and are hereby terminated with immediate effect.

One month's salary will be paid to you in lieu of notice in addition to your salary up-to-date.

Yours faithfully
for Nation Trust
(Sd.) Humayun Kabir
P. N. Tagore
Trustees

Sri Samar Sen,
15-C, Swinhoe Street.
Calcutta-19

৫.

P & O Buildings
Nicholson Road,
Delhi-6
2nd January, 1967

প্রিয়বরেষু, সমরবাবু—আপনার ৩০শে তারিখের চিঠি এইমাত্র (সোমবার বেলা ৩টায় সময়) পাইলাম। আপনার শরীর কেমন আছে জানাইবেন।

লেখা সম্বন্ধে আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই। এই পর্যন্ত Now-এর সহিত চারবার কমবেশী ঝগড়া হইল। একবার বিজয়া দাশগুপ্তের চিঠি লইয়া, ২য় বার রিভিউ লইয়া। তৃতীয় বার, ঝগড়া হইলে নিরুৎসাহ হইয়া কয়েক মাস লিখি নাই—সেটা হইয়াছিল ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে লেখা লইয়া।

চতুর্থবারও হইল ইন্দিরা গান্ধী লইয়া। আমি আপনাকে সম্পাদক হিসাবে moral responsibility হইতে মুক্তি দিবার জন্য নিজের নামে নূতন series লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। অবশ্য legal responsibility হইতে আপনাকে একেবারে মুক্ত রাখা সম্ভব হইত না। কিন্তু আমার লেখার জন্য আপনাকে আইনের প্যাঁচে পড়িতে হইত তাহা মনে করি না।

তবু ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে আপনাকে আবার না লিখিয়া প্রবন্ধ পাঠাই নাই। তাহার পর এইসব ফ্যাকড়া উঠাতে আমার উৎসাহ গিয়াছে। Prime Minister-এর জীবনের কোন দিক খবরের কাগজের বা লেখকের বিচার্য্য নয়, ইহা আমি জানি না।

আসল কথা অন্য। আপনার সহিত ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরে সেসব ভুলিয়া যাই বলিয়া সমস্ত গোল হইতেছে।

Now-এর যে লেখক group তাঁহাদের সহিত আমার মত, দেখিবার ধরণ, লিখিবার ভঙ্গী বা চরিত্র কোন দিকেই ঐক্য নাই। আমি Now-এ সর্বদাই হংস মধ্যে বকো যথা হইয়াছি। তাঁহাদের সৌখীন বিদ্রোহ ও ততোধিক সৌখীন আত্মপ্রত্যয় আমার ধারা নয়। সুতরাং আমি মানসিক পীড়া হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য Now-এর সহিত সম্পর্ক ছাড়িব ঠিক করিয়াছি। ইহা ছাড়া আমার এখন অন্য লেখার তাগিদ অত্যন্ত বেশী। বহুদিন কোথাও কিছু লিখি নাই —বিলাতের একটি বড় দৈনিক হইতে ফরমাস আসিয়াছে। সুতরাং কাজের চাপ বেশী। অনুগ্রহ করিয়া লেখা ও ছবি ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন। ইতি—

আপনার
নীরদ

পুঃ কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ না ছাপায় আমি আপত্তি করি নাই। কারণ আমার মনে হইয়াছিল আপনার আপত্তির সঙ্গত কারণ আছে।

৬.

25, Carlisle Mansions,
Carlisle Place,
London, S. W. I.
1st July, 1965

Dear Sen,

I have formed a great respect for your paper and should like to contribute to it again. Have you anything particularly in mind to write about? I don't know if I can manage it, but I'd like to if I can.

Yours sincerly
Kingsley Martin

প্রবন্ধ

১৯৭২ – ১৯৮০

চন্দ্রবিন্দু বাদে

'ইন্‌টেলেকচুয়াল' কথাটায় জীবিকার প্রসঙ্গ এসে পড়ে না। 'বুদ্ধিজীবী' সেই হিসেবে সঠিক অনুবাদ নয়। হয়ত বা আমাদের পুরনো ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যের রেশ এই ভাষান্তরে এসেছে। ব্রাহ্মণরা ছিলেন বুদ্ধিসংস্কৃতির রক্ষক এবং বুদ্ধি ভাঙিয়ে তাঁদের জীবিকা চলতো। বহুদিন পরে ইংরেজদের প্রয়োজনে যে শ্রেণী আবার সংস্কৃতির ধারক হলেন তাঁরা শিক্ষাকে জীবিকার কাজে লাগাতেন। সাহেবরা গ্রামের খালে বজরা বা নৌকা ভিড়োলে মাঝে মাঝে অনেক যুবক ইংরেজি স্কুল স্থাপনের জন্য ব্যাকুল অনুরোধ করতেন। অনেকে যেটাকে মুৎসুদ্দি সংস্কৃতি বলেন সেই সংস্কৃতিতে বুদ্ধি ও জীবিকার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাই সম্ভবত বুদ্ধিজীবী কথাটার এত প্রচলন।

বুদ্ধিজীবীদের মানসিক জীবনে প্রায়ই নানা সংঘাত দেখা দেয় বলে গুজব। অবশ্য যাঁরা বিবেকবান তাঁদের মধ্যে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অবস্থা ভালো ছিল, তাঁর মননশীলতার বিবর্তনের সঙ্গে জীবিকার যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল না। কিন্তু এই ধরনের স্বাধীন লোক ও মননশীলতা আমাদের দেশে অত্যন্ত দুর্লভ। আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক দ্বন্দ্বের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল কাজের সঙ্গে বিরোধ। অর্থাৎ যে কাজ, যে চাকরি করি তার সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ খাপ খায়না। ফলে বিবেকদংশন দেখা দেয়। অনেকে নানা জোড়াতালি দিয়ে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা সইয়ে নেন। অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি সেটা পারেন না। তাঁরা না ঘরের, না বাইরের।

যাঁরা সইয়ে নেন আমাদের দেশে অনেক দিন ধরে তাঁরাই বাজারমাৎ করে রেখেছেন। রাজনীতি একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন, বিশেষ করে তথাকথিত স্বাধীনতার পরে। বুদ্ধিজীবী ও তার নানা প্রশ্নের কথা যে বারবার ওঠে তার মূলে রয়েছে এই ভাঙনের যুগে রাজনৈতিক পক্ষপাতের প্রশ্ন। গত বিশ-বছরে দেশে বেশ কিছু সংকট দেখা দিয়েছে, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কারণে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর আমলে নানা রকম সুলভ ও আপাত যুক্তিগ্রাহ্য ভাঁওতার আড়ালে স্বচ্ছন্দ ভাবে দিনযাপন করা নানা ধরনের লোকের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বুদ্ধিজীবীর অবস্থা ভালো ছিল। রাজনৈতিক দলের পাণ্ডারা কষ্টে দিনযাপন করতেন না। তাঁরা ঢাল-তলোয়ারের চিন্তা, হয়ত নিধিরামের চিন্তা, ছেড়ে দিয়ে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে, শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে মনোযোগ দিলেন। সাধারণ মানুষদের কথা ছেড়ে দিন—তারা বুদ্ধিজীবী নয়। একটা সংকট দেখা দেয় চীনের সঙ্গে বিরোধের সময়। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বরাবর বহি-র্বিশ্বের বিষয়ে অতীব ওয়াকিবহাল। কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানা ইত্যাদি তাঁদের

বিশেষ স্পর্শ করেনা, তাঁদের রচনায় বিশেষ স্থান পায়না। চীনের সঙ্গে বিরোধের সময় কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে পড়লেন। প্রায় সব শেয়ালের এক রব। তারপর ১৯৬৫ সালের খণ্ডযুদ্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে। ১৯৬২ সালে যদি-বা বামপন্থীদের একটা অংশের মধ্যে দ্বিধা দেখা দিয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে সংঘাতের সময় প্রশ্ন ওঠে না। ভূস্বর্গের ব্যাপার আলাদা।

বাংলাদেশের সংকটের সময় আমাদের জাতীয় সংহতি একটা অভূতপূর্ব রূপ নিয়েছিল। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সবাই তদ্গত, উত্তেজিত, লেখার বন্যা বাঁধ ভেঙে দিল। নানা কারণে সেটা হয়ত স্বাভাবিক ছিল। প্রধান কারণ ছিল পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষ, যে বিদ্বেষের নানা অঙ্গভঙ্গি, নানা যুক্তি। তাছাড়া বহুদিন ধরে অনেক শরণাগত এই দেশে আছেন। পাকিস্তানী সৈন্যদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন ও পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন—এতে উত্তেজনার কারণ অবশ্য ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা অন্তত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের থাকা উচিত ছিল। সংকটের সময়ে বাস্তবনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু মুজিবের সর্বদা সপ্তগ্রামে-ওঠা কণ্ঠস্বর, পলাতকদের নানা গল্প, রবীন্দ্রসংগীত, সোনার বাংলা সব মিশিয়ে একটি অনবদ্য খিচুড়ি পাক হয়, যে-খিচুড়িতে এমন কি অল্পবয়স্কদেরও পেট ফাঁপে, মাথা পাকা হয় না। দু-একটি স্রোত বহির্ভূত দল ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এক সুরে বাঁধা পড়লেন। স্বদেশে যে সরকারের রীতিনীতি নিয়ে অনেকে সরব, বৈদেশিক ব্যাপারে সেই সরকারের সতীত্ব সম্বন্ধে রাম-রাবণ সবাই একমত হলেন। দেশপ্রেমের মাদকতা এক আশ্চর্য ব্যাপার। মুজিব-পাগল কিছু কিছু লোকের, কিছু কিছু পত্রিকার মধ্যে অবশ্য নানা সংশয় দেখা দিয়েছে, তাঁরা এখন ভাবতে শুরু করেছেন যে ওপার বাংলার 'আমি বলি নাই ?' ও এপার-বাংলার 'আমি করি নাই ?' এই দুই কণ্ঠস্বরের পিছনে যে শ্রেণী-শক্তি কাজ করছে সেটা সমাজবাদ তো নয়ই, সাধারণ গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্ত করার পরিপন্থী। চোর জাঁকিয়ে বসার আগে এই বুদ্ধিটা এলে ভালো হতো।

বাংলাদেশ নিয়ে সংকটের সময় বা চৈনিক সংকটের সময় একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বর্তমান আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থকের সংখ্যা খুব বেড়েছে। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই জীবিকা। শুধু প্রাণ ধারণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না, স্বচ্ছন্দে ও স্বাচ্ছল্যের প্রতি অনুরাগ বেশ প্রখর এখন। সমর্থনের আর একটা কারণ, কোথাও না কোথাও বর্তমান ব্যবস্থার ওপর প্রতিঘাতের সম্ভাবনা দানা বেঁধে চলেছে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী আজ জয়ী বটে, কিন্তু তাদের মনোবল অনেকটা মেকি। মূল্যবোধে একটা আলোড়ন এসেছে, অনেকটা অর্বাচীনভাবে সে আলোড়ন আনা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য যখন অনেকে প্রাণ দিয়েছে এবং দেবে তখন

পুরনো ব্যবস্থা অনেকে অনেক বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। তাই বর্ধমানের সাঁই-ভ্রাতাদের জন্য এতো বিলাপ অথচ জেলে ও রাস্তায় অসংখ্য লোকের হত্যার ব্যাপারে বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবী প্রভু বুদ্ধের মতো নির্বিকার। তাঁরা ধর্ম ও কংগ্রেসের শরণ নিয়েছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার প্রয়োজন বোধ হয় নেই। হয়ত যাঁদের আমরা বুদ্ধিজীবী বলে মনে করিনা তারাই কালান্তরের কারণ হবে, তাদের বুদ্ধি জীবিকায় পরিণত হবার আগে। তাছাড়া যারা খেটে খায় তারা তো বুদ্ধিজীবী নয়। এদের কথা লিখতে চন্দ্রবিন্দু লাগে না।

অগস্ট, ১৯৭২

বন্দে মাতরম্

বেশ ছোট তখন। সন্ধেবেলায় মাঝে মাঝে কীর্তনের আসর বসত। কীর্তনীয়ার নাম, কেন জানিনা, এখনো মনে আছে—গৌরদাস বাবাজী। বাগবাজারের কয়েকটি বাড়িতে এ-ধরনের আসর ব্যতিক্রম ছিলনা। এর সঙ্গে শিবভক্তদের কল্কের আসর এদিক-ওদিকে বসত। তখন গাঁজাজাতীয় জিনিসকে মারিয়ুয়ানা বলা হতো না।

কীর্তন মন্দ লাগে না। কিন্তু কতক্ষণ? অত অল্প বয়সেও একটা পরিহাসের ভাব গড়ে উঠেছিল কীর্তনীয়া ও তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধে। বড়ো বড়ো লোক, অনেকে বুড়ো, কী ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেশাক্রান্তের মতো মাথা দোলায়, মাঝে মাঝে অশ্রু বিসর্জন করে, বুদ্ধিলোকের পারে চলে যায়? এই অলস মদিরতা, এই রাধাভাব কি মধ্যবিত্তদের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য?

তা নয় খুব সম্ভব। সময় হলে এরা ভয়ানক শাক্ত হতে পারেন। রংপুরের একটি গ্রামে পুজোর সময় এক আত্মীয়ের চেহারা মনে পড়ে। বছর আঠারো বয়স, মহাষ্টমীর দিন মাঠে নিজে একটি পাঁঠা কাটার ইচ্ছে। কিন্তু এক কোপে হ'ল না। আমরা একটু দূর থেকে ঠাট্টা করাতে চোখ টকটকে লাল হয়ে গেল, প্রাণপণে দু-তিনটে কোপ মারল। সে-সময়ে কাছে গেলে ঘাড়ে মাথা থাকত না আমাদের।

শাক্ত-বোষ্টমদের প্রসঙ্গে খাপছাড়াভাবে একটা কথা মনে হ'ল। ইংরেজদের আমলে হিন্দুদের মধ্যে শাক্তভাব কিছু প্রবল ছিল। জাতীয়তার সঙ্গে শক্তিপুজো, 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি! রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় 'মা' শব্দটির ব্যবহার, শক্তির রূপক হিসেবে, উল্লেখযোগ্য। পরে তিনি সেই অভ্যাস কাটিয়ে ওঠেন,

যতদূর মনে পড়ে, 'বিসর্জন' নাটকের পর। কী বৈষ্ণব কী প্রাশ্চাত্যপ্রবণ ব্রাহ্মধর্মী ব্যক্তিরা 'মা মা' করেন কম। ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার যুগে কালীভক্তরা অপেক্ষাকৃত চুপচাপ হয়ে যান। গান্ধীজীর প্রথম আন্দোলনের সময়েও 'মা মা', যতদূর মনে পড়ে, প্রচলিত ছিল না। শক্তির আরাধনা আবার শুরু হয় সন্ত্রাসবাদীদের সময়ে। মার্কসবাদের প্রভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এটা কমে যায়। সম্প্রতি যে আবার বেড়েছে সেটা অবশ্য খুব আনন্দের কথা নয়, কেননা সেটা বেড়েছে বিশেষ ক'রে মস্তান ও তাদের সাকরেদদের মধ্যে, রাজনীতির ব্যবস্থাপনায় যাদের প্রভাব সবাই জানেন। তাছাড়া মাতৃকুল বেশ জমজমাট—কেন্দ্রে তো আছেনই, এদিক-ওদিক অনেক মা আছেন যাঁদের শিষ্য-শিষ্যা বিস্তর, তাছাড়া মনের মধ্যে ভারতমাতা বিরাজ করছেন। এক হিসেবে, অন্তত পশ্চিম বাংলায় এই মা'য়ের যুগ, যে মা'য়ের ছেলেরা বখে গিয়েছে, ওপার-বাংলায় বোধহয় বাবার।

ব্রাহ্মণ সভ্যতার দেশে, যেখানে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, সেখানে মাতৃমূর্তির প্রতি এত মোহ গবেষণার বিষয়। কেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ে বা দেশীয়দের বিরুদ্ধে আপন শোষকদের বর্বর অভিযানের সময়ে মাতৃমূর্তি এত প্রবল হয়ে ওঠে। গো-মাতার প্রতিপত্তির পিছনে না-হয় অর্থনৈতিক কারণ আছে, কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থান তো দৃঢ় ছিল না। কেন তাহলে আমাদের সাহিত্যে নায়িকাদের নাম এত মনে পড়ে—রোহিণী, বিনোদিনী, দামিনী, কিরণময়ী, কমল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুসুম? এদের অনেকে বিধবা এবং বিবিধভাবে আচারধর্মের অচলায়তনের বিরোধী বলেই কি মনে লেগে থাকে?

দেশের আদিম স্তরের সঙ্গে বহিরাগতদের বিরোধ ও সংমিশ্রণের ফলে কি ঘটে মাতৃপূজার প্রাবল্য? কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে মেয়েদের স্থান তো অনেকটা সমান, জীবনধারণের ভয়াবহ পরিশ্রম ও গ্লানি থেকে তাদের রেহাই ছিলনা এবং নেই। তাদের মধ্যে মেয়েদের নিয়ে এই আবেগ ও পূজার ভাব কি প্রখর? যারা মহুয়া খেয়ে উৎসবের সময়ে মেয়েদের সঙ্গে নাচে, যাদের ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক নানা নিষেধে কণ্টকিত নয়, তারা কি মাতৃপূজা করে আমাদের মতো?

এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটা বিশেষভাবে ওঠা উচিত, কেননা তাঁর 'আনন্দমঠ' তথাকথিত জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং 'আনন্দমঠ'-এ আছে বন্দে মাতরম্, অবশ্য দেশমাতাকে। সামাজিক উপন্যাসে, অর্থাৎ তাঁর প্রথম দিকের রচনায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর অবনতি শুরু হয় 'আনন্দমঠ' থেকে, কেননা তিনি তখন তাঁর ইংরেজ-ঘেঁষা রাজনীতির রূপ দিতে শুরু করেন সাহিত্যে। সে রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান বিদ্বেষ (যবন বধের পর 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হয়), ইংরেজদের সঙ্গে আপস এবং হিন্দুধর্ম সংস্কার ক'রে রাজনীতিতে

প্রতিষ্ঠা করা

মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বললেন,…হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর…ব্রত সফল হইয়াছে—মা'র মঙ্গলসাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ।'…

'সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল: তিনি বলিলেন 'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।'

'মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।'

রমেশচন্দ্র দত্ত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :…But though the Anada Math is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspried by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book, of which the *Bande Mataram* is the most famous.

হেস্টিংস লাট হলেন ১৭৭২-এ। 'মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবী চৌধুরাণী'র জন্য কাল ও স্থান, এই দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল, তখন মুঘল সাম্রাজ্যের দেশব্যাপী শান্তি ও শৃঙ্খলিত শাসনপদ্ধতি অস্ত গিয়াছে, অথচ নবীন ব্রিটিশ শাসন দেশে স্থাপিত হয় নাই—এই দুই মহাযুগের সন্ধিস্থল; রাজনৈতিক গোধূলি অরাজকতার বিশেষ সহায়ক।' —যদুনাথ সরকার

অরাজকতার বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী নামলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লর মুখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কী বাণী শোনালেন? 'আনন্দমঠ'-এ মুসলমান বধ, ইংরেজ রাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের, হিন্দুধর্মের, ঐতিহাসিক কর্তব্য। কিন্তু ইংরেজদের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ? সেটা ঐশ্বরিক ব্যাপার হিন্দু মানুষের কাজ নয়। 'ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, **"ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে?"** শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপরে রাখিও।'

ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদের সূত্রপাতে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ রাজের স্পষ্ট প্রবক্তা হলেন, অথচ তাঁরই 'বন্দে মাতরম্' প্রথম থেকে আমাদের দেশপ্রেমিকদের অনুপ্রাণিত করেছে। এর কারণ বোধহয়, রমেশচন্দ্রের ভাষায়, '…the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom in India'। অবশ্য সর্বদা সচেতনভাবে নয়।

'আনন্দমঠ'-এ যে বিষবৃক্ষের বীজ, রামরাজ্যবাদী গান্ধীজীর সমধর্মী আন্দোলনের মাধ্যমে তার পরিচয় ঘটে দেশবিভাগে! বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকের

নারী চরিত্রে সামাজিক বিদ্রোহের আভাস আছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ'-এর পর তাঁর রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিতে যে-সব বীরাঙ্গনার আবির্ভাব ঘটে তাদের অনেকে অবাস্তব। তাদের ক্রিয়াকলাপ মাঝে মাঝে অত্যন্ত পুরুষোচিত, অতীব বীরত্বব্যঞ্জক। শক্তির ধারিকা এই নায়িকারা হিন্দি সিনেমার কথা মনে করিয়ে দেয়। যে বিভ্রান্ত রাজনীতি বন্দে মাতরম্ গানের পিছনে, যে মনোভাবের ফলে মাতৃমূর্তির এত প্রচলন, সে রাজনীতি ও মনোভাব এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান বলে আজকাল রাস্তাঘাট বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে যখন-তখন মুখরিত হয়। কিন্তু এই মাতা অবাস্তব। একদিকে ছিল বহুবিবাহ, সতীদাহ, অন্যদিকে মা নিয়ে আবেগ। আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার, বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ সমালোচনা নকশালপন্থীরা পর্যন্ত করেন নি।

এখন পুজোর সময়। মা-দুর্গা ঘরে আসছেন! অনাহার অত্যাচার সব ভুলে হিন্দরা প্রতিমাপূজায় মন দেবেন। অনাহার, বেকারজীবন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের কথা তোলা এ সময়ে পাপ। তাতে ভোটরঙ্গের সময় ক্ষতি হতে পারে। জননী, প্রতিমা, জন্মভুমি, স্বর্গ, নরক সব এখন একাকার হবে। ঝোলে টান পড়লে নন্দীভৃঙ্গী মস্তানদের রক্তচক্ষু হবে, যেমন এক কোপে পাঁঠা কাটতে না দেখে হয়েছিল সেই আঠারো বছরের ছেলেটির। কীর্তনের বালাই নেই, অন্যভাবে সে মাদকতা আসে। রাধামূর্তি সিনেমায় প্রতিষ্ঠিত। মা চলে যাবেন, তারপর আসবেন পূর্ণ-মস্তানদের কালী। এর একটা মূল্য আছে। পূজায় ও রাজনীতিতে মাতৃমূর্তির সুবিধা বোধহয় এই যে এর আড়ালে অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদি অবলীলাক্রমে করা যায়, যেমন করা হয় ভারতে, শ্রীলঙ্কায়।

সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

ট্র্যাম থেকে থানায়

শনিবার অফিস না গেলেও চলত, কিন্তু মনে হ'ল অনেক কাজ, তাই বেরিয়েছিলাম। নটা পঁয়ত্রিশে ট্র্যাম থেকে নেমে দেখলাম, কণ্ডাক্টর ও পুলিশের ভিড়। বিনা-টিকিট যাত্রীদের ধরা হচ্ছে। আমাকে টিকিটের কথা বলতে হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বললাম আমার মান্থলি টিকিট আছে, সেটা ট্র্যামের মধ্যে দেখতে চাইলে আইনত আমি দেখাতে বাধ্য, রাস্তায় যেখানে-সেখানে দেখাতে আমি বাধ্য নই। কণ্ডাক্টররা ট্রেনের টিকিট দেখার কথাটা উল্লেখ করলেন। বললাম যে, স্টেশন বলে একটা জায়গায় একটা স্থানে আমি দেখাতে বাধ্য, কিন্তু প্ল্যাটফর্মের বাইরে নয়। ট্র্যামের ব্যাপারে সারা কলকাতাটাই রেলওয়ে

স্টেশন নয়। কিছু কথা কাটাকাটির পর—একজন কণ্ডাক্টর ছাড়া আর সবাই ভদ্রভাবে কথা বলছিলেন, বোধহয় আমি 'ভদ্রলোক' বলে—আমাকে শেষ পর্যন্ত পুলিশের কালো ভ্যানে উঠতে হ'ল। আর একজন ভদ্রলোক বসে-ছিলেন, তিনি বললেন, কলকাতার বাইরে থেকে এসেছেন, ট্রামে অনেক ঘুরেছেন, টিকিট কেটেছেন, কিন্তু পার্ক সার্কাস থেকে আসার সময় কণ্ডাক্টর টিকিট কিনতে বলেনি। আর একটি ছেলেকে ধরাতে সে কেঁদে ফেলল—বলল, ভিড়ের মধ্যে নামতে গিয়ে বিশ্বাস করুন, টিকিট পড়ে গেছে। বিশ্বাস বড় দুর্লভ জিনিস। আর একটি ছোকরাকে 'জোর' করে ভ্যানে তোলা হ'ল, কিছুতেই উঠবে না, তাই কিছু বলপ্রয়োগের প্রয়োজন।

বসে আছি, একটা সিগারেট ধরালাম। কোনে একটা বন্দুক শোয়ানো, সিগারেট ধরালে তাতে আগুন লেগে যাবে না তো? তবু ধরালাম। মাঝে মাঝে লোক তোলা হচ্ছে, কণ্ডাক্টররা এসে মাথা গুনছে—নির্বীর্যকরণের মতো কোনো কোটা আছে নাকি? সেদিন অসহ্য গুমোট গরম। তাছাড়া মট লেনের দোকানীরা অন্তত চেহারায় আমাকে চেনে, তাদের ধারণা আমি টিকিট ফাঁকি দিয়েছি—সেটা ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল।

আটজন লোক হ'ল। সাড়ে দশটার সময় ভ্যান থেকে নামতে বলাতে ভাবলাম বোধহয় ছেড়ে দেবে। কিন্তু ওঠানো হ'ল রাস্তার অন্যদিকের একটা ভ্যানে, সেটা পুলিশে গিজ-গিজ করছে। রিভলভারধারী সাব-ইনসপেক্টর পুলিশের কয়েকজনকে ড্রাইভারের পাশে যেতে বলে আমাদের বসার জায়গা করে দিলেন। আরো কিছুক্ষণ কাটল। দেখলাম ট্রামেঝোলা কয়েকটি ছোকরা সে-স্টপে নামতে গিয়ে নামল না। পরের স্টপে নামলে কোন গণ্ডগোল নেই।

সাড়ে দশটার পর অর্থাৎ প্রায় ৫০ মিনিট গরমে পচার পর ভ্যান ছাড়ল। প্রথমে শুনেছিলাম লালবাজার, কিন্তু আমরা নামলাম তালতলা থানায়। থানাটা নিরিবিলি জায়গায়। ঘরে দুটো টেবিল, কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী, এক কোণে ১৯ জন লোক দাঁড়িয়ে, তার পাশের একটা বেঞ্চে বিনাটিকিট যাত্রীদের বসতে দেওয়া হ'ল।

আমার ধারণা ছিল থানাতেই জরিমানা করে ছেড়ে দেবে। প্রথমে যে ছোকরার ডাক পড়ল, তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করাতে সে অনেক ধমকানির পর উত্তর দিল। কথা আটকে গিয়েছিল। বাবার নাম জিজ্ঞেস করাতে একেবারে চুপ। বিরক্ত হয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, বাবার নাম কি সে জানে না? জানে, অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল, বাবা জীবিত। কত টাকা আছে? বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার ধমকানির পর ১৪ টাকা বের করল। অফিসার একটা রসিদ দিয়ে বললেন তাকে লক-আপে নিয়ে যেতে। পঁচিশ টাকা জমা দিলে রসিদ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। সোমবার ব্যাংকশাল কোর্টে (১৩ নম্বর) হাজিরা দিয়ে ফাইন যা হবে সেটা কেটে বাকিটা ফেরৎ দেওয়া হবে।

পঁচিশ টাকার কম হলে লক-আপ। কানুন শুনে অস্বস্তি বোধ করলাম।

আমাকে ডাকাতে কেসটা দুজন কণ্ডাক্টর ও আমি বললাম। আমি আইনের প্রশ্ন তুলেছি শুনে অফিসার অবাক হয়ে বললেন, পাশের বেঞ্চে অপেক্ষা করতে, কেননা কেসটা অন্য ধরনের। কণ্ডাক্টর দুজন আমার মান্থলি টিকিট নিয়ে কী সব টুকে রাখলেন। বসে আছি, অধৈর্য লাগছে। আজ আর অফিসে যাওয়া হবে না। মাঝে মাঝে অফিসারকে তাড়া দিচ্ছি। ইতিমধ্যে একটা গণ্ডগোল বাঁধল। আটজন টিকিটহীন যাত্রীদের একজন উধাও। অন্যান্যরা এক গাল হেসে বলল, যাকে 'জোর' করে তোলা হয়েছিল, সেই কেটে পড়েছে। থানার মর্যাদাহানি, অফিসার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করলেন, কোণের ১৯ জনের মধ্যে মিশে গেল কিনা খোঁজ করলেন। তারা সবাই দেখলাম ভয়-ভাবনা-হীন, বলল, তারা হকার, 'petty case'। তাদের দলে পলাতক ভেড়েনি। হৈ-চৈ চলল বেশ কিছুক্ষণ। একটু কমে গেলে জিজ্ঞেস করলাম দোরগোড়ায় গিয়ে একটা সিগারেট খেতে পারি কিনা। অফিসার বললেন—না, দেখছেন না একজন পালিয়েছে? বললেন, আমি বেঞ্চে বসেই ধূমপান করতে পারি।

আর একটা ব্যাপার ঘটল। লক-আপ থেকে নানারকম আওয়াজ আসছিল, সেটা হর্ষ না বিষাদের? ওখানে নাকি কয়েকটা ছিনতাই আছে। হঠাৎ দুটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক দৌড়িয়ে অফিস-ঘরে ঢুকে লক-আপের সামনে গিয়ে দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, চেঁচাতে চেঁচাতে ও-সি'র ঘরে সটান প্রবেশ করল; জোর করে তাদের বের করাতে একজন কোলের দু-তিন মাসের সন্তানকে ও-সি'র ঘরের দোরগোড়ায় শুইয়ে দিয়ে কী একটা প্রতিবাদ করল—তার সোয়ামি লক-আপে সেজন্য বোধহয় প্রতিবাদ। কনসটেবলরা বাচ্চাটিকে তার কোলে তুলে দিয়ে বিদায় করল।

ইতিমধ্যে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে একটি ছোকরা বাদে সবাই ২৫ টাকা জোগাড় করে ফেলেছে, এমন কি মফস্বলের সেই ভদ্রলোকটি পর্যন্ত যাঁর মাত্র ১০ টাকা ছিল। বুঝলাম হঠাৎ টাকা তোলার একটা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আছে। আশে পাশে কাবুলিওয়ালা অবশ্য চোখে পড়েনি।

আবার অফিসারকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন যে, আমার ব্যাপারটা দুটি কণ্ডাক্টরের ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, ওদের সিদ্ধান্তই 'final'। কণ্ডাক্টর-প্রবরদের জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা চুপচাপ, এ-ও'র মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বাইরের দিকে, কোন কথা নেই। নির্লিপ্ত, প্রশান্ত। তিন চার বার তাড়া দেওয়াতে বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন—তাই তো, কী করা যায়। আচ্ছা, ট্র্যামওয়ের বড়ো অফিসে ফোন করি।

ফোন করে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বড়োকর্তাদের সিদ্ধান্ত জানতে মিনিট দশেক কাটল, কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর সিদ্ধান্ত—পুলিশ যা করবে করুক।

অফিসারকে তিন-চারবার তাগাদা দেবার পর তিনি নাম ধাম লিখতে বসলেন। ব্যাপারটা ঘোরালো হচ্ছে বুঝে বললাম আমার কাছে পাঁচ টাকা

আছে। নির্বিকার চিত্তে তিনি বললেন, তাহলে লক-আপে থাকতে হবে। বললাম, তার আগে আমি লালবাজারে একটা ফোন করতে চাই। সেটা চলবে না, বড়োজোড় ও. সি-র সঙ্গে দেখা করতে পারি। তাই হোক। আপনার কার্ড কই? কার্ড নেই। কাগজের টুকরোয় নামটা লিখে পাঠাই? বসুন, ও. সি এখন খুব ব্যস্ত।

বসে রইলাম। ভিড় কমে গেছে। দু-একটি অল্প বয়সী মেয়ে এসে অফিসারের সামনে বেঞ্চে বসলেন। তারা কেন এসেছেন সে নিয়ে মাথা ঘামালাম না, কেননা ধৈর্য কমে আসছে, অস্থির লাগছে। ও. সি-র কাছে পাঠাবার কোন লক্ষণ নেই। দিনের কেসগুলো ধীরে সুস্থে বড়ো খাতায় তোলা হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নীল বুশ সার্ট আর খুব সম্ভব সাদা প্যান্ট পরিহিত একজন ব্যক্তি এলেন। হাসিখুশি, পুলিশী চাল নেই। তখন অফিসার বললেন যে উনি আমার কেসে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভদ্রলোকটা কেসটা শুনে বেশ মজা পেলেন, বললেন, আইনের কথা তুলে এতো ঝামেলার মধ্যে পড়ার কী দরকার ছিল? বললাম আমি বাঙালি, বাঙালিরা আইন নিয়ে সর্বদা মাথা ঘামায়। অবশ্য স্বীকার করলাম যে থানায় এসে রোগটা কেটে গেছে, বয়সের সঙ্গে রক্ত ঠাণ্ডা হয়েছে, নইলে হয়ত লক-আপে থেকে পরে কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আইনের প্রশ্নটা তুলতাম। কিন্তু শনিবার লক-আপে ঢুকলে সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকতে হবে, সেটা আমার ভালো লাগছে না! ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। তবে তার আগে ও. সি-র অনুমতি দরকার। একজন গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি নিয়ে এলেন! ভদ্রলোক তখন বললেন একটা G. D. করতে হবে (general diary ?)। এক-জনকে ডেকে মুখে মুখে বললেন, তিনি লিখে নিলেন বড়ো খাতায়। অন্য অফিসারটি বললেন যে তিনি আমাকে চালানের তালিকাভুক্ত করেন নি। ঘটনার বিশদ বিবরণ, ট্র্যামের নম্বর, কোন রুট, কোন সময় ব্যাপারটা হয়েছিল, আমার আইনগত বক্তব্য (সেটা বিস্তারিত ভাবে) প্রথম প্যারাগ্রাফে লেখা হ'ল যে ট্র্যামে কম্পানিকে ঠকাবার আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং আমার মান্থলি সঠিক। ভাগ্যিস তার আগের দিন টিকিটে আমার ঠিকানা ও সইটা বসিয়ে-ছিলাম। (ওটা না করা 'দণ্ডনীয় অপরাধ') সেহেতু আমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

তখন বেলা বারোটা। বেরিয়ে এসে অফিসে গেলাম মিনিট দশেকের জন্য। অসহ্য গরম। কেউ আসেনি। বেরিয়ে আবার ট্র্যামে উঠলাম। টিকিট? বললাম মান্থলি। কণ্ডাক্টর দেখতে চাইলেন না। মান্থলি বলার পর টিকিট দেখাতে বললে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আমাকে অবিশ্বাস? ওটা আমার পাতি-বুর্জোয়া আত্মম্ভরিতা। অনুশাসন পর্বেও বিদুরের কালিমা ওঠাতে পারিনা। প্রায় আড়াই ঘণ্টার অভিজ্ঞতার কথা পরে ভেবে দেখলাম, পনেরো থেকে পঁচিশ পয়সার টিকিট না থাকলে ২৫ টাকার মুদ্রাস্ফীতি উপশম করার ক্ষমতা

অনেকের থাকে না, বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পারলে লক-আপ ? সবচেয়ে বিরক্ত লাগে থানায় ওই দুটি ট্র্যাম কণ্ডাক্টরের কথা মনে পড়লে। নির্বিকার, প্রায় অমানুষিক ব্যবহার। তার কারণ কি এই যে ওঁরা এককালে কোনো বামপন্থী ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন, এখন অন্য ইউনিয়নে ?

১৩ এপ্রিল, ১৯৭৬

প্রস্তুতি-পর্ব

গত কয়েক মাস প্রকাশ্যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা বিশেষ শোনা যায় নি, লেখা তো দূরের কথা। এ ধরনের আলোচনার একটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দিক আছে। আপনার মতামত অত্যন্ত প্রখর হলেও শেষ পর্যন্ত কোন না কোন পার্টির মতাদর্শের সঙ্গে অল্পবিস্তর যোগ থাকে বলে আপনার কথাবার্তা ঠিক ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে না। অবশ্য তাঁদের কথা বলা হচ্ছে না, যাঁরা পার্টির নামে পুজোর বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের চাঁদা আদায় করে কিছুদিন অন্তত ফুর্তিতে থাকেন।

এখন বুদ্ধিজীবীদের ঝোঁক সংস্কৃতির দিকে। সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির যোগ না থেকে পারে না, কিন্তু আলোচনা ও লেখার সময় বুদ্ধিমান লোক সেটা উহ্য রাখতে পারে, ধান ভানতে শিবের গীত থেকে বিরত থাকা যায়। সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু কোনো উপন্যাস কবিতা বা ফিল্ম নিয়ে আলোচনার সময় বিশেষ কোনো রাজনৈতিক পার্টির কথা সরাসরি আসে না বলে নিজের মতামতকে তাঁরা আজকাল ব্যক্তিগত গুরুত্ব দেন, যাঁরা এক-কালে ক্ষমতাসীন কোনো না কোনো সরকারী শরিকের পক্ষ নিয়ে জোরগলায় আলোচনা করতেন। তাঁদের অহমিকা রীতিমত বেড়েছে এমন একটা সময়ে যখন নিজেদের অসহায়, ক্লীব অক্ষমতার কথা ভেবে আত্মগ্লানি হওয়া উচিত। এঁদের বেশির ভাগের অবশ্য আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং অবসর আছে।

নেই মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো। একটা সন্ধিক্ষণে চুপচাপ না থেকে কিছু করে যাওয়া শ্রেয়। সে কাজ অনেক ছোটখাটো পত্রিকা করে যাচ্ছে। আখেরে ফল দেবে বোধহয়। এ ধরনের পত্রপত্রিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ দেখেছি ; লেখকেরা নাক-উঁচু নন। আলোচ্য বিষয়বস্তুকে ঐতিহাসিক পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন।

যে কোন সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার জীবন, পরিবেশ, মতামত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থাকতে বাধ্য। কিন্তু পাঠকদের পক্ষে এ সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় থাকা সম্ভব নয়। তাঁদের উৎসাহ ও ঔৎসুক্য বাড়লে তখনি স্রষ্টার বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা করেন। অনেকক্ষেত্রে বিস্ময়কর পরি-

স্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। ব্যালজাকের উপন্যাস পড়ে মনে হয় না তিনি মতামতে উগ্র রাজতন্ত্রী ছিলেন; তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা এত বিরাট ছিল যে ব্যক্তিগত ঝোঁক তিনি অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর উপন্যাস অসাধারণ না হলে তাঁর মতামতের ভিত্তিতে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে অনেকে বর্জন করতেন।

আমাদের কিছু কিছু সমালোচকদের মধ্যে অন্য একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আলোচ্য গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি হিসেবে ব্যর্থ, বিশেষ করে কালের ব্যবধানের পর; কিন্তু লেখকের প্রকাশিত মতামত হয়ত জাতীয়তাধর্মী ও প্রগতিশীল ছিল। সুতরাং তাঁর ব্যর্থ সাহিত্য রচনার বিষয়ে সমালোচকেরা সহানুভূতি দেখান। এ ক্ষেত্রে 'আনন্দমঠ', 'ঘরে বাইরে' ও 'পথের দাবী'র উল্লেখ করা যায়। কারণ নানা রকম গোঁজামিল বইগুলির মধ্যে চালু করা হয়েছে জাতীয় আন্দোলনের নাম করে। তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক ও ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে 'আনন্দমঠ'। রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' নতুন কোন পথের ইঙ্গিত দিতে পারেনি বলে শেষেরটি বিশেষ করে ইংরেজ শাসকদের কাজে লাগে। 'পথের দাবী'তে সব্যসাচী অনেক উগ্র কথাবার্তা অনর্গল বলেছেন, সরকার বইটিকে নিষিদ্ধ করেন, কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এটি সার্থক নয়। এদিকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল হ'লেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সামাজিক উপন্যাস হিসাবে 'চোখের বালি' চেয়ে অনেক সার্থক রচনা। 'চোখের বালি'র শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'মেলাবেন তিনি সব মেলাবেন' গোছের একটা সমাধান করেছেন সেটা হাস্যকর। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণীর উক্তি—তার যৌবন আছে, তাকে যেন মারা না হয়—অনেক বাস্তব ও স্মরণীয়।

মতামত দিয়ে সবার লেখা যাচাই করা যায় না; অবশ্য অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকগুরুর মতামত জানা দরকার তাঁদের রচনাবলীর মূল্যায়নের জন্য।

সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবন কি আমরা উপেক্ষা করতে পারি? প্রথম কথা, দেখা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়; জানতে পারলে ভালো, কারণ জীবন-ধারার ছাপ চেতনা ও সৃষ্টিশক্তিকে গড়ে, চেতনা নয়। অপর পক্ষে এটা পরে বলা হয়েছে যে উপরিকাঠামোর প্রভাব জীবনধারার পরিবর্তনে সাহায্য করে। এটা যৌথ জীবনে যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত জীবনে ততটা নয়।

তবু দু-একটা ব্যাপারে গণ্ডগোল থেকে যায়। একজন একদা-শক্তিমান সৃষ্টিকার হয়ত লিভারের রোগে এত আক্রান্ত যে ছোট গল্প বা উপন্যাস রচনায় শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেন না, তাঁর উপরি-কাঠামো ঠিক থাকা সত্ত্বেও, যদিচ বাড়িতে বসে লেখার অবসর তাঁর ছিল। অথচ একই লিভার রোগে জর্জরিত কোনো সিনেমা ডিরেক্টর মৃত্যুর আগে সার্থক দু-একটি ফিল্ম করে গিয়েছেন, লিভারের রোগের সঙ্গে টি. বি. থাকা সত্ত্বেও। ফিল্মের ব্যাপারে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ও সংগঠনের আবশ্যিকতা অনেক বেশি।

ব্যাধিকে অতিক্রম করে কী করে তিনি মোটামুটি সার্থক ফিল্ম করতে পারেন সেটা ভাববার বিষয়। তিনি মার্কসবাদী না হতে পারেন—তথাকথিত মার্কস-বাদী ফিল্ম বিষয়ে নানা প্রশ্ন তোলা উচিত, এ বিষয়ে কী ভণ্ডামি বাজারে চালু সে-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। 'ইতিহাস একটি নদীর নাম' ঋত্বিক ঘটক কী ভাবে তুলেছিলেন সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর। 'যুক্তি তক্কো গপ্প' দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এখনো দেখিনি! কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকটি ফিল্ম দেখানোর সময় বাইরের হলে তাঁর মৃতদেহের ফটোর বুকে গীতা ছিল কি ছিল না সেটা আমার কাছে অবান্তর লাগে। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে 'কোমল গান্ধার'-এ তাঁর আতিশয্য খারাপ ঠেকে। বিশেষ করে একটি দৃশ্যে যেখানে ধর্ষিতা রমণীদের প্ররোচনায় পুরুষেরা লাঠি বল্লম নিয়ে প্রতিশোধ নেবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বেরিয়ে পড়ে। এটা কোনো মার্কসবাদীর পক্ষে অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে [ঋত্বিক] ঘটকের প্রতিভা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ—কিছুকাল আগে অনেক বয়সে তাঁর কয়েকটি ছবি দেখি। এক্ষেত্রে তাঁর অনেক উক্তি সম্প্রতি পড়েছি, যেগুলো ঠিক সংহত নয়। কিন্তু ঋত্বিক অতিরিক্ত মদ্যপান করে অকালে মারা যান, আর যাঁরা সুরাপান করেন না তাঁরা নানা অবস্থার সঙ্গে দিব্যি খাপ খাইয়ে বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রগতিকেরা তাঁদের প্রশংসায় মুখর, অবাক লাগে।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব অনস্বীকার্য; কিন্তু যৌথভাবে কাজের সময়ে অনেকে সেটা পেরিয়ে অন্যলোকে উপস্থিত হ'তে পারেন। আরো অনেকে লিভারের পীড়ায় জর্জরিত হয়ে ছোট গল্প কেন একটা সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখতে পারেন না। কেন এমনটা হয়?

কয়েকটা এলোমেলো প্রশ্ন তুলে উত্তরের অপেক্ষায় থাকা ভালো। কোন সার্থক বিপ্লবী রাজনীতি দেশে থাকলে অনেক ব্যক্তিগত দুর্বলতা এমনকি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও কাটিয়ে উঠতে পারতেন বিবেকদংশনে। সেটা যখন নেই তখন দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্ন তুলে চুপ করে যাওয়া ভালো। এখন হয়ত প্রস্তুতি-পর্ব? কিসের প্রস্তুতি? এবং কতোকাল প্রস্তুতি চলবে?

অক্টোবর, ১৯৭৬

নির্বাচন মার্চ, ১৯৭৭

চল্লিশ বছর আগে ১৯৩৭ সালে বিগত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচন উপলক্ষে আমরা কয়েকজন দু-তিনদিন আসানসোলে ছিলাম। তখন কম্যুনিস্টরা কংগ্রেসী টিকিটে দাঁড়াতেন। নেতাদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমেদ, ভূপেন্দ্র দত্ত, রাধারমণ মিত্র, মহম্মদ ইসমাইল, বঙ্কিমবাবু, ইত্যাদি।

বেশিরভাগ ভোটার কয়লাখনির শ্রমিক। নির্বাচনী এজেণ্ট হিসেবে আমরা দু'ভাই কী কাজ করেছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে কারচুপি করার অভীপ্সা থাকলেও বিশেষ সুযোগ পাইনি, কিংবা প্রয়োজন হয়নি। ভোটদান পর্বের পর সন্ধেবেলার আড্ডায় নৈরাশ্যবাদী পণ্ডিত ভূপেন দত্ত বললেন, 'বঙ্কিম তোমার জামানত মারা গেল।' রাত কেটেছিল অস্বস্তিতে।

নির্বাচনের ফলাফল বেরোতে দেখা গেল অপর পক্ষের জমিদারের জামানত বাজেয়াপ্ত। ট্রেনে ফেরার সময় প্রত্যেক স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নেমে সুপুরুষ ইসমাইলের মুখে জয়ধ্বনি, জনগণের উল্লাস। এরপর কংগ্রেস সরকার গঠন করলেন। ভিতর থেকে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে দেবার জন্য। অচিরে ভাঙনের কথা মন ও কর্মসূচী থেকে বেমালুম অবলুপ্ত হল।

এরপর আর একটি নির্বাচনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তীর নির্বাচনী এজেণ্ট ছিলাম। অম্বিকাবাবু জিতবেন তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না—কেন না পর্দার আড়ালে রাখা কোন্ বাকসে কটা ভোট পড়েছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, পর্দাটা বেশ স্বচ্ছ ছিল। মাঝে একবার বাইরে এসে দেখলাম এক ভদ্রলোক আমার সম্বন্ধে খুব আপত্তি করছেন—যে সব ভোটদাতাদের চ্যালেঞ্জ করেছি তাঁদের কয়েকজন নাকি অম্বিকাবাবুর সমর্থক।

এর পরে বিদেশে যাই। ফিরে এসে ষাটের দশকে শেষ ভোট একবার দিই। তারপর নির্বাচনে কোন আস্থা রাখিনি, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে বিশ্বাস ছিল না। এবারে কিন্তু ভোটার-তালিকায় আমার নাম আছে কি নেই সে বিষয়ে কৌতূহল ও চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোন পার্টির লোক বাড়িতে খোঁজখবর করতে আসেনি কেন জানি না। তালিকায় নাম থাকলে ভোর ছটায় ভোট দিতে খুব সম্ভব যাব। তার মিনিট দুয়েক আগে সূর্য ওঠে আজকাল।

কাকে ভোট দেব? জরুরি অবস্থার ফলে আমার আর্থিক বা নৈতিক কোন উন্নতি ঘটেনি। একটি সাপ্তাহিক চালাই। প্রথম দিকে মহাকরণে কপি পাঠাতাম, কিন্তু দু-একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পর শুধু শিল্পকলা ও তাত্ত্বিক বিষয়ে লেখা পাঠাতাম। যেসব লেখা মনে হতো 'কাটবে না', অর্থাৎ আপত্তি-কর ঠেকতে পারে সেগুলো পাঠিয়ে সেন্সরদের অভিমত অন্তত ৪৮ ঘণ্টা পরে জানলে সাপ্তাহিক চলে না। পরে নানা অসুবিধার দরুন কোন কপিই পাঠানো যেত না। শুনেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে সুব্রত-লক্ষ্মীকান্ত ইত্যাদি দল-উপদল নিয়ে মাথা না ঘামালে, "আপনাদের পত্রিকার ব্যাপার দিল্লী দেখবেন।" দেহলি দূর অস্ত্। বিশেষ ঝামেলা হয়নি। তবে সুসমাচার ছাড়া কোনো খবর না থাকায় বিষয়বস্তুর অভাবে কলম চলত না; যদি বা চলত অন্য ধরনের একটা কায়দা রপ্ত করতে হয়, যে কায়দাটা মূলত চালাকি, আর চালাকির দ্বারা মহৎকার্য সাধিত হয় না, যদিও রাজ্যশাসন চলে। ঝামেলা হতো অন্যদের,

গরীবদের। অন্য একটি পত্রিকার জন্য ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হ'ল, চল্লিশজন নিরীহকর্মী বেকার হয়ে গেলেন। প্রায় এগারো মাস পরে ছাপাখানা খালাস হওয়াতে দেখা গেল যন্ত্রপাতি অচল, অনেক অংশ উধাও, সশস্ত্র প্রহরা সত্ত্বেও। সত্যিকারের আপৎ অবস্থা বটে।

ছলে বলে কৌশলে নির্বাচিত হবার প্রসঙ্গ বারবার উঠছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, পরীক্ষায় টোকাটুকির মতো। ছল ও কৌশলের ব্যাপারে বুদ্ধি লাগে। ১৯৭২ সালে বলের প্রয়োগ বোধহয় বেশি ছিল। সে-সময়কার একটি সাপ্তাহিক থেকে কয়েকটি নমুনা :

মধ্য কলকাতার একটি ভোট কেন্দ্র : চারটি মহিলা পর পর এসে পুরুষ ভোটারদের নামে এসে ভোট দিলেন। বিরোধী দলের এজেণ্ট কড়িকাঠের দিকে চেয়ে রইলেন। আপত্তি করলে হামলা হবে। একই কেন্দ্র, বিকেল সাড়ে চারটে : ছ'সাতজন পুরুষ এসে মেয়েদের নামে নিজেদের পরিচয় দিলেন। নির্বাচনী অফিসার : "বেশ, বেশ, সব ঠিক আছে, আপনারা ভোট দিন।" বিরোধী দলের এজেণ্ট দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে নখ পরিষ্কারে ব্যস্ত রইলেন।

টালিগঞ্জের একটি কেন্দ্র : ৫৫-৬০ বছরের একটি মহিলা। একজন এজেণ্ট নির্বাচনী অফিসারকে বললেন যে মহিলাটি যেন বিশেষ একটি চিহ্নে ভোট দেন। মহিলা : "বাছা আমি পাঁচটি সন্তানের মা, কাকে ভোট দেব জানি।" এজেণ্ট : "বিয়ে হলে বাচ্চা পয়দা হয়" (অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি সহকারে), কিন্তু রাজনীতি আলাদা ব্যাপার। বলছি এই চিহ্নে ছাপ দিন।" মহিলা তাই দিলেন। চোখে অবশ্য জল এসে গিয়েছিল।

একই কেন্দ্র : খাদির কুর্তা ও সুরঙ্গী প্যাণ্ট পরিহিত তিনটি যুবকের প্রবেশ, হাতে কয়েকজন ভোটারের নামের তালিকা। একজন নির্বাচনী অফিসারকে বললেন—"শুয়োরের বাচ্চারা আসবে না, এদের ব্যালট পেপারগুলো দিন তো (অফিসারটি মধুর হেসে তাঁদের বাধিত করলেন। ব্যালট পেপারগুলো বাকসে দিয়ে বীরেরা বিদায় নিলেন। বিরোধী দলের এজেণ্ট চড়া গলায় প্রতিবাদ করাতে তরুণ তিনটি ফিরে এসে বললেন : "চেঁচাবেন না দাদা। চুপ করে বসে থাকুন। ভালো না লাগলে বেরিয়ে যান। ফের যদি চেঁচান, ওই দেখুন—" বাইরে কয়েকজন বন্দুকধারী দাঁড়িয়েছিল।

বন্দুক ও বোমার ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়েছিল বেলেঘাটা, বরানগর ও দমদমে। বেলেঘাটার একটি কেন্দ্রে একটি যুবক ভোট দিতে আসতে নির্বাচনী অফিসার তাকে পেন্সিল দিলেন। কলম চাওয়াতে একজন বলে উঠলেন, "এটা নেবেন নাকি ?" জিনিসটা বন্দুকের গুলি। ভোটদাতা টুঁ শব্দটি না করে পেন্সিল দিয়ে নাম সই করে চলে গেলেন। নির্বাচনী অফিসার রবার দিয়ে তার নাম মুছে দিলেন। অফিসারের বুদ্ধির তারিফ করে এজেণ্ট বললেন—"সাবাস"।

কাকে ভোট দেব ? বিরোধীদলকে দিলে শুনছি স্থিতি থাকবে না। নাই থাকুক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হাজার হাজার লোক বিনা কারণে বন্দী, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, মৌলিক অধিকার খর্ব, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ, সভাসমিতি, ধর্মঘট করা চলবে না, বোনাস বন্ধ, বিচারব্যবস্থা খণ্ডিত, লক্ষ লক্ষ লোকের লিবিডো (libido) ব্যাহত, রাতারাতি-নেতাদের তাণ্ডব। তিরিশ বছর 'স্থিতি' যাঁরা রক্ষা করে এসেছেন তাঁরা বিদায় নিলে সমূহ সর্বনাশ বোধহয় হবে না।

৭ই মার্চ, ১৯৭৭

জরুরী অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

জরুরী অবস্থা ঘোষণার দিন পনেরো আগে শ'দুয়েকের মতো বুদ্ধিজীবী একটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বিবৃতি প্রকাশ করেন। এঁরা ইন্দিরা সরকারকে প্রগতিশীল মনে করেন—বা করতেন। জয়প্রকাশের আন্দোলন এঁদের কাছে ফ্যাসিবাদী ছিল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী ইত্যাদি। ২৬ জুন ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাষণে এঁদের বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন। এই বিশেষ বুদ্ধিজীবী মহলে এমারজেন্সি বিশেষ উল্লাসের সৃষ্টি করে।

আভ্যন্তরীণ এমারজেন্সির খবর পাই অফিসে যাবার সময় ট্রামে, তখন কান দিইনি। অফিসে আসার পর একজন প্রখ্যাত প্রগতিশীল ফিল্ম পরিচালক অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ফোন করেন। খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত শুনি চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিয়ুর কফি হাউসে, বেলা একটার পর। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই বুদ্ধিমান লোক, সবাই বিচলিত। ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক দেখলাম না।

তার দু'সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে পড়লাম আমাদের চেনাশোনা দু'তিনজন প্রগতিশীল বাঙালি ফিল্ম ও থিয়েটারের নেতা, শ্রীমান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মস্কোর ফিল্ম উৎসবে যাত্রা করেছেন। এঁদের একজনের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ভালো—না গেলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হতো না। অন্য-জনের অবস্থা ততটা সুবিধের নয়। কিন্তু কাজ কিংবা অন্য কিছুর দোহাই দিয়ে তিনি যেতে নাও পারতেন।

প্রথমে যে শ'-দুয়েক বুদ্ধিজীবীর উল্লেখ করেছিলাম তাঁদের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সরকারের নানা স্তরে ; এঁরা সি.পি.আই. মস্কোর সমর্থক। এটা ভাববার বিষয় যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা সর্বাধিক সি. পি. আই.-তে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, পুরস্কার বিতরণ বা বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে

এঁরা কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেসীদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। নবীন কংগ্রেসীদের মধ্যে অর্ধ-শিক্ষিত মস্তানভাবাপন্ন ব্যক্তির আধিক্য।

অল্পসল্প খবর ও গুজব বন্ধ হ'ল না, সেন্সরশিপ ও সমাচার সত্ত্বেও। 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদক দীপঙ্করবাবু গ্রেপ্তার হলেন। তারও পরে কলকা। পত্রিকায় লেখার অপরাধে গৌরকিশোর ঘোষকে ধরা হ'ল। দীপঙ্করবাবু মাও-পন্থী, গৌরকিশোর ঘোষ কম্যুনিস্ট বিরোধিতা বরাবর করেছেন, কিন্তু অর্থ-লোভ বা উন্নতির জন্য নয়। বরুণ সেনগুপ্ত সিদ্ধার্থশঙ্করের চক্ষুশূল, জেলে গেলেন। তার অনেক পরে গা-ঢাকা-দেওয়া জ্যোতির্ময় দত্ত, 'কলকাতা'র সম্পাদক। সি.পি.আই.পন্থীদের মতে, বামপন্থী ও দক্ষিণ পন্থীদের এই জোট সি. আই.-এ.র কার্যকলাপ ও প্রভাবের ফল—যেটা ইন্দিরা গান্ধীরও মত। বিদেশে বিশেষ করে 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলি (চীন, উত্তর কোরিয়া ও আলবেনিয়া বাদে) ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করল, ভিয়েতনাম পর্যন্ত। কতো বামপন্থীদের ধরা হয়েছে সেটা বোধহয় এ-সব দেশগুলির জনগণের অজানা ছিল। জয়প্রকাশের আন্দোলনে যে-সব দল একত্র হয়েছিল তারা দক্ষিণপন্থী বলে পরিচিত। কলকাতা ময়দানের একটি জনসভায়, এমারজেন্সির আগে, জ্যোতি বসু জয়প্রকাশের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা দেন যে জনঅধিকার ক্ষুণ্ণ হ'লে তাঁর দল জয়প্রকাশকে সমর্থন করবেন। ভারতবর্ষব্যাপী নেতাদের গ্রেপ্তারের পর, জনসাধারণের সমস্ত অধিকার যখন ক্ষুণ্ণ হ'ল, তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনো আন্দোলনের খবর আমরা পাইনি। চু-এন-লাই-এর মৃত্যু উপলক্ষে শোকসভা ডাকা হ'ল, পুলিশ হতে দিল না, উদ্যোক্তারা মেনে নিলেন। মাও সে-তুং মারা যাবার পর অবশ্য ছোট ছোট হলে কয়েকটা শোক-সভা হয়েছিল।

দেশের অন্যত্র কী হচ্ছে জানার উপায় ছিল না। বিদেশী পত্র-পত্রিকা পৌঁছত অল্পসংখ্যক পাঠকদের কাছে। ইন্দিরা গান্ধীকে প্রথম দিকে সবচেয়ে বেশি কাজ দিয়েছে বোধহয় সেন্সরশিপ, কেননা অন্যস্থানে আন্দোলনের খবর না পেলে বিরোধীদের মনোবল ভেঙে যায়, অসহায় লাগে, মনে হয় জনগণ বাছুর বনে গিয়েছে। এ-ছাড়া যাঁরা নিজেদের সংস্কৃতিতে অগ্রগামী মনে করতেন তাঁরা রেডিও ও টেলিভিশনে এবং তথ্যচিত্রে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। রবীন্দ্রভক্তরা তাঁর নানা গানের উপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গলা খুলে অন্য গান গাইতেন। বিগত একজন লেখক বলেছিলেন তাঁর নিজের লেখা একটি নৈরাশ্যবাদী কবিতা রেডিও-তে পাঠ করতে দেওয়া হয়নি। অন্য কবিতা কেন পড়লেন, জিজ্ঞেস করিনি।

এমারজেন্সির সময়ে বামপন্থী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় নি। ঝোঁকটা ছিল—পার্টি পত্রিকা বাদ দিয়ে—সংস্কৃতির মূল্যায়নে। কিছু কবিতায় বিদ্রোহের সুর ছিল ছিল। তখন মাঝে মাঝে মনে হতো যে কড়া বাঁধানিষেধের ফলে যখন স্পষ্ট কিছু লেখা যাচ্ছে না তখন পত্রিকা বের করে কী লাভ ?

অবশ্য, নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো, যদি ভালো চোখটা সরকার-ঘেঁষা না হয়ে পড়ে।

বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নিশ্চয় আছে। কিন্তু কতোটুকু? মোটামুটিভাবে এমারজেন্সির সময় তাঁরা বিশেষ কিছু করেন নি, বিশেষ করে পূর্ব ভারতে। আমাদের দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ নিরক্ষর। রেডিও মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছানো বামপন্থীদের পক্ষে এতদিন সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এখানকার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেশের লোকের নাড়ীর সম্পর্ক বলতে গেলে নেই। তাঁরা গোষ্ঠিবদ্ধ। মতামতে প্রখর পার্থক্য নেই অথচ অসংখ্য পত্র-পত্রিকা বেরোয়—তাতে লোকবল ও অর্থবলের সম্যক্ ব্যবহার হয় না।

নির্বাচনে বুদ্ধিজীবীদের কিছু ভূমিকা ছিল নিশ্চয়ই, শহরাঞ্চলে অনেক বেশি ছিল ছাত্রদের, যাঁরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রচারকার্য চালিয়েছেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—দক্ষিণের প্রদেশগুলি বাদ দিয়ে—চাষী মজুরেরা, যাদের কাছে বুদ্ধিজীবীদের বার্তা পৌঁছয় না। মেহনতী মানুষেরা হাড়ে হাড়ে যা ভুগেছেন তার জবাব দিয়েছেন ভোটের মাধ্যমে। ভোটে অবশ্য বিপ্লব সাধিত হয় না! তার জন্য অন্য পন্থা দরকার। বুদ্ধিজীবীদের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করা উচিত—তবে সেটা এখন পর্যন্ত স্বপ্নবিলাস। যে-দেশে মাতৃভাষায় সর্বস্তরে শিক্ষা এখনো চালু হয় নি, ইংরেজির মোহ ও প্রাধান্য এখনো প্রবল, সেখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি অত্যন্ত কঠিন, বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সেখানে অনেকটা আত্মকণ্ডুয়নের মতো।

মে, ১৯৭৭

শত্রুমিত্র

বন্দীমুক্তির ব্যাপারে নানা আইনগত ঝামেলা দেখা দিয়েছে। আইনের প্রতি অতি অনুরাগ নতুন-ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা এক-তরফা। অনেকে ন-দশ বছর জেলে আছেন, মামলার ফয়সলা এখনো হয়নি। ন-দশ বছরের মধ্যে প্রশাসন মামলার ব্যাপারে এগোতে না পারলে দোষটা সরকারের। সাজা পেলেও হয়ত অনেকের এত বছর কারাদণ্ড হতো না। এর থেকে প্রমাণ হয় পুলিশের হাতে বিশেষ প্রমাণ নেই, তারা বহাল তবিয়তে কারাগারে ও অন্যত্র রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। অনন্ত সিংকে ধরা হয় ১৯৭০ জানুয়ারীতে, যুক্তফ্রন্টের আমলে। এখন তাঁর বয়স খুব সম্ভব আশির কাছাকাছি। বিচারের বৈতরণী কবে পার হবেন কেউ জানেনা। এত দীর্ঘদিন বন্দীরা মনের আনন্দে ও শারীরিক আরামে সময় অতিবাহিত করছেন না। অনেকে জেলে পুলিশের

হাতে মারা গিয়েছেন, অনেকে অকথ্য নিপীড়নের ফলে পঙ্গু। কৈশোর থেকে অনেকে যৌবনে পৌঁছেছেন জেলে, অনেকে মধ্যবয়সে পা দিয়েছেন যৌবন থেকে। কতজনের সংসার ছারখার হয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এখানে আইনী অন্তরায়ের কথা তোলাটা অনুচিত।

নির্বাচনের আগে যদি বন্দীমুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাহলে নির্বাচনের পর ক্ষমতায় এসে অন্য দলের কিছু কিছু বন্দীকে ছেড়ে নিজেদের পিঠ চাপড়ানো মানে জনসাধারণকে অপমান করা। 'ওরা আমাদের কতো কর্মীকে খুন করেছে, তবু তো ছেড়ে দিচ্ছে ওদের' এই মনোভাব সুস্থ নয়। কেননা খুনখারাপি যা হয়েছে তার শরিক ছিল বেশির ভাগ পার্টি। গণ্ডগোল প্রথমে লাগে যুক্তফ্রন্টের শরিকদের মধ্যেই, যখন প্রত্যেকটি পার্টি ক্ষমতা বিস্তারের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার সময় নয় এখন। অভিযোগ করলে প্রতি অভিযোগ ওঠে। তাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে লোকের মন আবার বিক্ষিপ্ত হয় পার্টিগত রিরংসায়। এমন একটা সময় হয়ত আসছে যখন বামপন্থী পার্টির কর্মীরা নেতাদের সম্বন্ধে মোহচ্যুত হতে শুরু করবেন, কেননা সমস্যা অনেক ও দুর্মর এবং সমাধান মনে হয় সুদূরপরাহত। অবশ্য সব রাজনৈতিক পার্টি ভাই-ভাই হয়ে যাবে, একসুরে কথা বলবে, একসঙ্গে কাজ করবে, সমস্যা সমাধানের জন্য, সেটা সম্ভবপর নয়। দলগত বিভেদ থাকতে বাধ্য। সেটা আদর্শ ও রাজনীতির লড়াই। এরই মধ্যে যদি বামপন্থী পার্টিরা এ-ওকে প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করে, তাহলে শ্রেণীশত্রুদের ঘুম কেড়ে নেওয়া কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়বে।

এখন পর্যন্ত শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, আমলাতন্ত্রের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নি—কখনো হবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে কোন প্রদেশে সীমিত ক্ষমতায় এলে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর হেরফের হয় না। হেরফের করার কোনো প্রয়াস এখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়ছে, সর্বভারতীয় একটা ব্যবস্থা না হলে কিছু করবার নেই। ১৯৬৬-তে মাছের দর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সরকারিভাবে কিছুদিনের জন্য, কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না হয়ে। বামফ্রন্ট সরকারের এখনো জন-সমর্থন আছে অথচ জনগণই ক্রমাগত মার খাচ্ছে, এ-বিষয়ে কিছু করা যায় না ? তাহলে যে নীরব বিপ্লবের কথা উঠেছে সেটা কি শেষ পর্যন্ত অ-দৃশ্য বিপ্লব থেকে যাবে ? এটা সাধারণ দুঃস্থ লোকের প্রশ্ন, যাঁরা মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট তাঁরা জানেন যে এভাবে বিপ্লব কখনো আসতে পারে না। বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন যে বড়ো-বড়ো কথা বলে লাভ নেই। সরকার গরীব ও দুঃস্থদের কিছুটা 'relief' দেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে ভাঁড়ার শূন্য, তাই দিল্লীতে যেতে হচ্ছে ক্রমাগত অর্থের ধান্দায়।

কেন্দ্রীয় সরকার জোড়াতালি সরকার। যে দুটি পার্টি কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে

তারা বামমনোভাবাপন্ন নয়। শুধু কেন্দ্র কেন অনেক প্রদেশে তাদের ক্ষমতা বেড়ে চলেছে—'নিঃশব্দ প্রতিবিপ্লব' একটা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে জনতা পার্টি ভেঙে যাবে না, কেননা কেন্দ্রে সবাই গদীয়ান হয়ে থাকতে চান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনদক্ষতার দৃষ্টান্ত এখনো দেখাতে পারেন নি। অজ্ঞাতবাস থেকে পাণ্ডবেরা ফিরে এসেছেন দিল্লীর মসনদে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মাঝে মাঝে শাস্ত্রীয় বুলি দিচ্ছেন। অর্জুন কে জানি না। ভীম পার্টি দুটি সম্বন্ধে অবহিত অনেকে, কিন্তু চুপচাপ আছেন। শাসনপর্বে পুলকিত হবার কারণ এখনো দেখিনি, যে-আস্থা জনসাধারণের মধ্যে ছিল মার্চ পর্যন্ত তার অনেকটা কমে গিয়েছে জুনের নির্বাচন প্রস্তুতির কেলেঙ্কারীতে। তারপর সমর বয়ে চলেছে, অনাহার, বেকারি, দুর্নীতি চলেছে সমানে। শ্রীমতী আবার তৎপর। অবশ্য মাথাটা এখনো গোলমেলে অবস্থায়, যেমনটা ছিল নির্বাচনের আগে। খালি জেলের কথা বলছেন, আবার বলছেন জেলে যাওয়া আমাদের ভারতীয়দের কাছে, ভয়ের ব্যাপার নয়, গর্বের।

ভদ্রমহিলার আমলে জেলে ও বাইরে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঠাণ্ডা মাথায় হয়েছে তার নজির ইংরেজ আমলেও পাওয়া কঠিন হবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নির্যাতিতদের কথা বাদ দিন। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী মহারানী গায়ত্রী দেবীকে জিজ্ঞেস করুন জেলের ব্যাপারটা গর্বের না ভয়ের?

তবু শুনেছি জনগণের স্মৃতিশক্তি শিথিল। মোহভঙ্গ হতে থাকলে তারা ভবিষ্যতে কোন দিকে ঝুঁকবে জানি না। শুধু জানি যে আন্দোলন ছাড়া কোনো বামপার্টি শক্তি অর্জন ও সঞ্চয় করতে পারে না। এরই মধ্যে আবার পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে শুরু করলে কোন পার্টির শেষ পর্যন্ত কোন ফয়দা হবে না, হবে তাদের শত্রুদের—এখন যাদের মিত্র মনে হচ্ছে।

অক্টোবর, ১৯৭৭

দেখা ছবি

সিনেমার সঙ্গে দর্শক হিসেবে যোগাযোগ প্রথম দিকে ঘটে একটু অবৈধভাবে, বারো বছর বয়সে, ১৯২৮ সালের পর। মা মারা গেছেন, বাবা নানা মহলে আড্ডায় অতি ব্যস্ত। বাড়িতে বেশ মধুর রকমের বিশৃঙ্খলা, আমরা সবাই স্বতন্ত্রী। সে-সময় উত্তর কলকাতার বাজারে যেতে বেশ ভালো লাগতো। বেচাকেনার অসম্ভব পরিশ্রমের মজুরি হিসেবে মাঝে মাঝে একটা করে সিকি পকেট থেকে যেতো। সেই সিকিগুলোর সদ্ব্যবহার হতো বায়োস্কোপে। নির্বাক যুগের অনেক নাম-করা ছবি তখন দেখি। শিবরাত্রিতে সারারাত

সিনেমা দেখা যেতো একটা সিকিতে। দুটো ছবি দেখার পর ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার প্রিয় তারকা ছিলেন জন ব্যারীমুর। দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তখনকার সবচেয়ে রোমান্টিক অভিনেতা ভ্যালেনটিনো'র-এর চেয়ে তিনি উঁচুদরের শিল্পী। মোবি ডিক, ডন জুয়ান, The Beloved Rogue-এ ফাঁসোয়া ভিলঁ, ডঃ জেকিল্ এ্যান্ড মিঃ হাইড, প্রফেসর টোপাজ্, রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট-এ মারকিউসিও, কতো ধরনের ভূমিকায় তিনি নেমেছিলেন। তার উপর, স্টেজে তাঁর হ্যামলেট্ তো লণ্ডনে আলোড়ন আনে। দুই ভাই, লাওনেল ও জন ও বোন এথেলকে নিয়ে ছবি—Royal Family of Broadway-তে তিনজনেই অবতীর্ণ হন। ব্যারীমুরের একটা রেকর্ড পর্যন্ত যোগাড় করেছিলাম—To be or not to be স্বগতোক্তি।

তখন জন ব্যারীমুর ছাড়া আরো অনেকের অভিনয় দেখেছি: এমিল জেনিংস, চার্লি চ্যাপলিন, বাস্টার কীটন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস ইত্যাদি। নির্বাক ছবির মোহ যে কতোখানি এখনো চ্যাপলিনের ছবি দেখে মনে পড়ে যায়। সে সময় হঠাৎ এমন ছবি মাঝে মাঝে এসে পড়তো যাদের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। কিন্তু ভিড় হতো না—যেমন একবার রাতের শো'তে ম্যাডান থিয়েটারসে Kameradshaft দেখি মাত্র গোটা দশেক দর্শক। আইজেনস্টাইন ও পুডোভকিনের ছবি অবশ্য দেখি অনেক পরে।

নির্বাক থেকে সবাক যুগে পৌঁছবার সময় হোঁচট খেতে হয়নি। পুরোনো অভিনেতারা হয়তো মানিয়ে নিতে বেগ পান, দর্শকদের বিশেষ অসুবিধে হয়নি।

পৃথিবীর নানা দেশের ছবি বোধহয় প্রথম দেখানো হয় ১৯৫২ সালে, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। পাগলের মতো সব ছবি দেখা সম্ভবপর ছিল না। Bicycle Thieves, Open City, Miracle of Milan এবং Kurasawa-র দুটি ছবি দেখি। Bicycle Thieves-এর কথা এখনো মনে আছে। ১৯৫২ সালের উৎসব আমাদের দেশের কয়েকজন শিল্পীর মনে গভীর ছাপ রেখে যায়।

১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী'। রাত ন'টায় ফিল্ম দেখার আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা, কেননা সন্ধের আড্ডাটা বাদ পড়ে। তবু জোর করে বিরস মুখে দেখতে গিয়েছিলাম 'পথের পাঁচালী'। ফিরেছিলাম প্রায় হতবাক হয়ে। অনেকে বলেন, বিদেশে খ্যাতি হবার আগে 'পথের পাঁচালী'র সমাদর নাকি এদেশে হয়নি। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, ছবিটি দেখার পর আমরা কয়েকজন বন্ধু চাঁদা তুলে বিশপ লেফ্রয় রোডে আই. সি. এস. অশোক মিত্রের বাড়িতে সত্যজিৎ রায়কে সংবর্ধনা জানাই। সত্যজিৎ রায় পথিকৃৎ নিশ্চয়ই। কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' অনেক বছর পরে দেখে মনে হল যে ১৯৫২-তে তোলা ছবিটি আগে মুক্তিলাভ করলে পথিকৃৎ তাঁকেই বলা হতো। অবশ্য ঋত্বিক ঘটক স্টেজ থেকে সিনেমায় যাওয়াতে প্রথম ও অন্যান্য দু-একটি ছবিতে অতি-

নাটকীয়তা আছে। 'নাগরিক'-এর নানা চরিত্র ও সামাজিক বক্তব্য ঋত্বিকের পরের কয়েকটি ছবিতে নানাভাবে এসেছে—'অযান্ত্রিক' ও 'তিতাস' বাদে। ঋত্বিকের ভঙ্গি প্রখর, সরব, এদিক থেকে 'অযান্ত্রিক' ও 'তিতাস' ব্যতিক্রম। বিরাট পটভূমিকায় তোলা 'তিতাস'-এর মতো ছবি আমাদের দেশে বিরল। ঋত্বিকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে অবস্থায় পৌঁছিয়েছিল তখন 'তিতাস' ও অন্তত কয়েকটা অংশে 'যুক্তি তক্কো ও গপ্পো'র মতো ছবি তিনি কী ভাবে তুলতে পেরেছিলেন সেটা বিস্ময়কর। সিনেমা তো গল্প কবিতা বা সম্পাদকীয় লেখার ব্যাপার নয়। নিদারুণ শারীরিক বিপর্যয়ের মধ্যেও Flowers of Evil লেখা যায়, কিন্তু সিনেমা একটা জটিল ও যৌথ ব্যাপার যেখানে সংগঠনের শক্তি থাকা চাই ; মাত্র একান্ন বছর বয়সে জীবনের অত্যন্ত যন্ত্রণাকর প্রান্তে এসে ও-ধরনের ছবি যিনি তুলতে পারেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও প্রাণশক্তি অনস্বীকার্য।

ঋত্বিকের বিষয়ে আমার বিবেক দংশন হয়। তাঁর জীবদ্দশায় যখন দেখা হতো মাঝে মাঝে, তখন তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম না, একটা নাক-উঁচু ভাব ছিল। গত বছর তিনি মারা যাবার পর তিন চারটি ছবি দেখে বিস্মিত বোধ করি। বেশ কয়েকজন শিল্পী প্রগতি ভাঙিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ঋত্বিক, অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও, ভেজাল ছিলেন না।

সত্যজিৎ রায় অন্য জগতের লোক। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। সব ছবি বা সব লেখা যে ভালো লাগে তা নয়, কিন্তু প্রতিটি ছবি দেখা অবশ্য কর্তব্য মনে হয়। একটা প্রশ্ন : তাঁর ভৌতিক গল্পে যাঁরা ভূতে অবিশ্বাসী তাঁদের অপদস্থ হতে হয়, বিশ্বাসীরা মর্যাদা পান। এটা কি আধুনিক মানসিকতা ?

বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় নিষ্ঠুরতায় অভাব আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্প (মিহি ও মোটা কাহিনী) এর বিরল ব্যতিক্রম। সত্যজিৎ রায়ের 'জন-অরণ্যে' একধরনের নিষ্ঠুরতা প্রথম আসে। সেটা আনার জন্য অবশ্য তিনি সুকুমারকে বিশেষ প্রাধান্য দেননি, যদিও সুকুমারের বেকার থাকাটা জীবন মরণের প্রশ্ন ছিল। যেটা ছিল না স্বচ্ছল উচ্চমধ্য পরিবারের সোমনাথের। হোটেলে ব্যবসায়ীর ঘরে ঢোকার আগে সোমনাথের প্রশ্নের জবাবে সুকুমারের বোন বলে যে দাদা ভালো আছে, ট্যাক্সির লাইসেন্স পেয়েছে অর্থাৎ টাকার জন্য বোন শরীর বেচার ব্যবসায়ে নামেনি। এটা এসেছে তার চরিত্র থেকে। যা হোক, সত্যজিতের এই নিষ্ঠুরতা একটা নতুন জিনিস।

গত কয়েক বছরে দেখা কয়েকটি ছবির কথা মনে আছে। মৃণাল সেন 'কলকাতা-৭১' পাঁচটি ছোট গল্পের রূপায়ণে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'পদাতিক' দেখে অস্বস্তি বোধ করেছি, নানা ধরনের অবাস্তবতার জন্য। 'কোরাস' ও 'মৃগয়া' দুটিতেই প্রগতির দ্যোতনা গায়ের জোরে চাপানো হয়েছে। 'মৃগয়া'র অনেক অবাস্তবতার মধ্যে একটি হল নায়কের প্রাণদণ্ড। স্ত্রীহরণের পর হত্যাকারীকে হত্যা করলে কি মৃত্যুদণ্ড হয় ? ভারতীয় দণ্ড-

বিধিতে ? মূল গল্পে শুনেছি এই অবাস্তবতা ছিল না।

অবাঙালী ছবি সম্বন্ধে আমাদের নাক-উঁচু ভাব একটা আছে, তার কারণ অবশ্য সাধারণ হিন্দি ছবির আজগুবি লাস্যবিলাস, নাচ-গান, অর্বাচীন কাহিনী ইত্যাদি। বাংলার বাইরে তোলা কয়েকটি ছবি বহুদিন ভুলবোনা : 'গরম হাওয়া', 'অঙ্কুর', 'নিশান্ত', 'সংস্কারম্'। ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে যবন বধের সময় ওখানে ছিলাম, বাড়িওয়ালা ছিল সুদর্শন একটি মুসলমান যুবক। সেজন্য 'গরম হাওয়া'র সংলাপ বুঝতে না পারলেও মনে হয় এমন জীবন্ত ছবি কম দেখেছি। 'অঙ্কুর' কয়েকজন বিপ্লবী সমালোচকের ভালো লাগেনি— ১৯৪৬ সালে জমিদারের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে লোকটা রুখে দাঁড়ালো না— এটি, তাঁদের মতে, প্রতিবিপ্লবী ব্যাপার। কিন্তু বেনেগালকে ধন্যবাদ তিনি বাচ্চা ছেলের ঢিল ছোঁড়ায় প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। 'নিশান্ত'-এ আবার গাঁয়ের লোকেরা জমিদার বাড়ি আক্রমণ করাতে একটা আপত্তি ওঠে, পুরোহিত কী করে জনগণকে রুখে দাঁড়াতে বলে ? লাটিন আমেরিকা, রোডেসিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় কিন্তু যাজক শ্রেণীর অনেকে প্রতিরোধে যোগ দিয়ে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন।

'সংস্কারম্'-এ স্নেহলতা রেড্ডী ও গিরিশ কার্নাদের অভিনয় ও কাহিনীর বিস্তার স্মরণীয়।

সিনেমা দেখা বড় একটা হয়ে ওঠেনা আজকাল। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, দু-এক দিন আগে গিয়ে কিউতে দাঁড়ানো, তারপর সিনেমা শেষে কোন যানবাহনে বাড়ি ফিরবো তার দুশ্চিন্তা। ফলে ছবি দেখি শখের জন্য নয়, কর্তব্যবোধে। কম দেখি বলে সন্তুষ্ট ও অবাক হই সহজে। যেমন 'সংসার সীমান্তে' একদিকে, অন্যদিকে প্যাসোলিনির 'ইডিপাস', মুড়িমিছরি দুইই ভালো লাগে।

১৯৭৭

ইন্দিরা চরিত

ইন্দিরা গান্ধীর যে পতিতপাবন মূর্তি মোরেজ্ গড়ে তুলেছেন তার সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ প্রজার পরিচয় নেই। ১৯১৭ সালে, একদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে ভয়াবহ রক্তক্ষয়, অন্যদিকে রুশ বিপ্লব ঘটেছে তখন শ্রীমতীর জন্ম। দ্বিতীয় সূত্রে ভারতবন্ধু রুশীরা তাঁকে 'দোচ্কা রেভোলিউতসিই' অর্থাৎ বিপ্লব কন্যা বলে থাকেন। শ্রীমতীর শৈশব ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক। মতিলাল, জহরলাল ও কমলা নেহরু ক্রমশ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন, জেলে যান। কমলা ছিলেন রুগ্ন। পারিবারিক সোহাগ থেকে ইন্দিরা গান্ধী অনেকটা

বঞ্চিত, যদিও আর্থিক প্রাচুর্যের অভাব ঘটেনি। তবে মতিলালের সংসারে বিদেশী বেশভূষা, খানাপিনা, জাঁকজমক, বিদেশী জীবনযাত্রার সঙ্গে হিন্দিভাষী ঘরোয়া কমলা ঠিক খাপ না খাওয়াতে তাঁকে নাকি গঞ্জনা ও কষ্ট সইতে হয়, বিশেষ করে বড়ো ননদ স্বরূপরানীর (পরে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) কাছে। কিন্তু মতিলালের স্ত্রী 'স্বরূপরানী' (মা ও মেয়ের এক নাম ?) তো স্বভাবে ও শিক্ষায় কমলার মতো ছিলেন, গঞ্জনা কি মাত্রারিক্ত হতে পারে ? ইন্দিরা গান্ধী বলেন মা'কে কষ্ট পেতে দেখে "I made up mind never to let people hurt me".

কথাটি কয়েকবার বলা হয়েছে তার ভবিষ্যৎ মানসিকতার একটি প্রধান সূত্র হিসেবে। শ্রীমতী নিঃসঙ্গ ছিলেন, বাবা-মার রাজনৈতিক কাজ ও পরে কমলা নেহরুর অসুস্থতার জন্য। কোনো একটা স্কুলে একটানা শিক্ষালাভের সুযোগ হয়নি। ১৯৩৬-এ বিদেশে কমলা দেবী মারা যান। তার বেশ কিছুদিন আগে থেকে তরুণ ফিরোজ গান্ধী কমলা দেবীর পরিচর্যা করেছেন। কমলার মৃত্যুর আগে তিনি ইন্দিরাকে বিয়ের প্রস্তাব করে সফল হননি, কিন্তু দেশে ফেরার কয়েক বছর পরে, ১৯৪২ সালের মার্চে তাঁদের বিয়ে হলো। দাম্পত্যজীবনের প্রথম দিকে আঁচলে-চাবি ইন্দিরাকে গৃহলক্ষ্মী মনে হতো। কিন্তু বেশি দিন নয়। দম্পতির মধ্যে একটা চিড় ধরে কারণ শ্রীমতীকে ঘন ঘন এলাহাবাদে গিয়ে নেহরুকে সাহায্য করতে হতো (আমরা যতোদূর জানি, ১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট থেকে যুদ্ধশেষ পর্যন্ত নেহরু জেলে ছিলেন, এ সময়ে এলাহাবাদে তাঁকে সাহায্যের কথা কী করে ওঠে ?)।

অন্তবর্তী সরকার, ক্ষমতার হস্তান্তর ইত্যাদির পরে অবশ্য স্বামীর ঘর করার সুযোগ ইন্দিরা গান্ধীর হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ওখানে তিনি সংসার দেখতেন, অতিথি অভ্যাগতদের সংবর্ধনা, দেশভ্রমণ, বিচিত্র নানা রাজনীতি-বিদের সঙ্গে পরিচয়—এই সব অভিজ্ঞতা তাঁকে বিচক্ষণ করে তোলে। ১৯৫৯-এ কংগ্রেসীদের বিস্ময় উদ্রেক করে নেহরু কন্যাকে পার্টির সভাপতি করলেন। (শ্রীমতী কিন্তু বলেছেন যে, ঐ ব্যাপারে নেহরুর আপত্তি ছিল, পন্থ "bullied me into becoming President"—পৃঃ ১১৩)।

১৯৫৯-এ কেরালার প্রথম কম্যুনিস্ট সরকারের পতন তিনি ঘটান কূট-কৌশলে। পরের বছর ফিরোজের মৃত্যু, মৃত্যুশয্যায় ফিরোজ ব্যাকুলভাবে তাঁর হাত ধরেন—এ থেকে প্রমাণ হয় যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল। দু বছর পরে চীন-ভারত সংঘর্ষ। ভ্রাতৃপ্রতিম চু এন-লাই-এর ব্যবহারে, বিশ্বাসহননে সজ্জন পণ্ডিতজীর শরীর ও মন একেবারে ভেঙে পড়ে। পিতৃদেবের প্রতি অনেকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শ্রীমতী মনে রেখেছেন—অবশ্য অনেকের মধ্যে শুধু চু এন-লাই-এর কথাটাই মোরেজ্ কয়েক বার বলেছেন। ভারতীয় বিদেশ নীতির সাফাই কীর্তনে মোরেজ্ সরকারী মুখপাত্রদের ছাড়িয়ে যান, অবশ্য প্রচারধর্মী আতিশয্য কাটিয়ে—যেটা আরো বিপজ্জনক।

নেহরুর পর লালবাহাদুর (১৯৬৪), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫) তাসখন্দে চুক্তিতে সই-এর পর লালবাহাদুরের হঠাৎ মৃত্যু, এবং ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতীর বিস্ময়কর উদয় (১৯৬৬)। তাঁর যে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে সেটা কামরাজ প্রমুখ তুখোড় কংগ্রেসী নেতারা প্রথমে জানতেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ব্যক্তিত্ব ও (কূট) বুদ্ধি প্রখর হয়ে ওঠে। ১৯৬৭-র নির্বাচনে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে কংগ্রেসী বিপর্যয় ও পরে গুটিকতক অকংগ্রেসী সরকারকে ফেলে দেবার পর ১৯৬৯-এ আশ্চর্য কৌশলে দেশাই ইত্যাদিকে হটিয়ে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, গরিবী হঠাও শ্লোগান দেশ ও দশের মন হরণ করলো। ক্ষমতার তুঙ্গে ওঠেন ৭১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানকে ভেঙে ১৯৭২-এ স্বাধীন বাংলাদেশের গদীতে মননশীল, উদারপন্থী, মুজিবকে বসিয়ে। তখন তিনি ভারতেশ্বরী।

কিন্তু ইতিহাস চপল প্রকৃতির। কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমতীর অপার মহিমা ও প্রভাব কমতে শুরু করে। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, আকাল, বন্যা অর্থনীতিকে জটিল করে তোলে। গরিবী হঠাও হল না, কেন না বাংলাদেশ থেকে আগত 'এক কোটি' লোকের উপর খরচায় 'রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায়' (যুদ্ধে খরচা হয়নি?) দু-একটা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি রটতে শুরু করে—নাগেরওয়ালার ব্যাপারে অবশ্য মোরেজের মতে, ইন্দিরা গান্ধীকে কোনোভাবে জড়ানো যায় না। 'মারুতি'কে লাইসেন্স দেওয়াতে শ্রীমতীর হয়ত হাত ছিল, কিন্তু 'যুবরাজকে' সুবিধে করে দেওয়াটা ভারতীয় রেওয়াজ। ১৯৭৪-এ জর্জ ফার্নানডেজ নামক একটি 'bitter bufoon' 'সারা দেশে রেল ধর্মঘট লাগিয়ে দিলেন':

"The railway strike···affected the people, who like trains, ('পথের পাঁচালী'র অপুর মতো), it also affected the entire economy of the country,"

কঠোর হাতে ধর্মঘটীদের দমন ছাড়া শ্রীমতীর গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু বিরোধীরা এই নিয়ে নিন্দেয় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। এর পর গুজরাটে বিক্ষোভ, মন্ত্রিসভা ও বিধানসভার পতন, জয়প্রকাশের আন্দোলন। জে পি'র জানা উচিত ছিল যে তাঁর 'সার্বিক বিপ্লব' নিরক্ষর দেশে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করবে। ১৯৭৫ সাল এলো। জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে গুজরাটে কংগ্রেসের চরম পরাজয় ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়। তারপর হঠাৎ আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা, দেশবাসীদের মৌলিক অধিকার হরণ, নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার লোকের বিনা বিচারে কারাগার, সেন্সরশিপ ইত্যাদি। মোরেজ্ মনে করেন, দেশের তখনকার পরিস্থিতিতে একমাত্র জরুরি অবস্থাই স্থিতি আনতে পারতো; পারেনি তার কারণ ইংরেজ আমলের মতো সংগঠন বা chain of command শ্রীমতীর ছিল না (ইংরেজ আমলে "people were dedicated to their work")।

দোষটা যতটা দেশের লোকের চরিত্র ও স্বভাবের ততটা ইন্দিরার নয়। বড়ো ও ছোট আমলারা মাতা-পুত্রের আদেশনামা নিয়ে বড্ডো বাড়াবাড়ি করে, বিশেষত বস্তি ভাঙা ও নির্বীজকরণের ব্যাপারে। সঞ্জয় গান্ধীর উগ্র সমালোচনা মোরেজ্ করেননি, তাঁর প্রসঙ্গে টেনে এনেছেন রুকশানা সুলতানকে। মোরেজ্ একথা বলেছেন যে, হাজার হাজার লোককে আটক করা হয়েছিল ঠিক, কিন্তু অন্যত্র তাদের সাবাড় করা হতো। যাই হোক, আমলাদের বাড়াবাড়ি ও সেন্সরশিপের ফলে শ্রীমতী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ১৯৭৭-র নির্বাচনে মাতাপুত্র ও পার্টি প্রচণ্ড আঘাতে বিপর্যস্ত হন (দক্ষিণে নয়)। আত্মকলহ-পরায়ণ, উদ্দেশ্যবর্জিত জনতা পার্টির কাণ্ডকারখানার সুযোগ নিয়ে শ্রীমতী আবার সিংহাসনে কেমন করে ফিরে এলেন তার বর্ণনা মোরেজ্ সোল্লাসে দিয়েছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে নানা সময়ে সাক্ষাৎকার, খানাপিনা, শেষে ভুল বোঝাবুঝি ও নাটকীয় সমাপ্তি যুবাদের ভালো লাগবে।

মোরেজ্ কবি-সাংবাদিক। জন্ম ভারতে, ব্রিটিশ পাসপোর্ট, কাহিনীটি লিখেছেন বিদেশীদের জন্যে। তাঁর ভাষা সজীব, সরস ও সংযত—প্রথম ও শেষের দিকে যখন শ্রীমতীর আসন্ন বিপর্যয়ের পূর্বাভাসে তাঁর টনক কিছুটা নড়ে। কিন্তু শ্রীমতীর প্রধানমন্ত্রীত্ব পর্বের বর্ণনায় মোরেজের রচনাভঙ্গি ও ভাষা প্রায়ই সস্তা ও খেলো ও কাব্যিপনা পীড়াদায়ক। কয়েকটি মন্তব্যে রুচির অভাব—চৌহান জগজ্জীবনের মাঝে ইন্দিরা বনমানুষের মধ্যে যেন ছরিণী। মোরেজের নিরপেক্ষতার মুখোশ এসময় অনাবৃত। কমলা নেহরুর প্রতি ফিরোজের নির্মল আসক্তি ছিল, ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি মোরেজের মোহ প্রায় 'জুনুন'-এর পর্যায়ে পড়ে। শ্রীমতীর সম্পর্কে তাঁর বিশেষণগুলি উপভোগ্য —'শেকিনা', 'জোন্ অব আর্ক', 'অগ্নিশিখা' 'জনদরদী', 'অস্থিমজ্জায় বামপন্থী'। শ্রীমতীর কথা ও কাজের গরমিল তিনি মাথা ঘামান না। কোনো কারণে খুশি বা উত্তেজিত হলে ইন্দিরা গান্ধীর ডান চোখের পাতা পিটপিট করে। 'কখনো প্রধানমন্ত্রী হতে চাইনি', 'কখনো বিরোধীদের দমন করিনি' 'কখনো কোনো অকংগ্রেসী সরকারকে হটাইনি', 'কখনো কাউকে অবিশ্বাস করিনি'—এসব বলার সময় তাঁর চোখের পাতা কিন্তু অনড়। হয় তিনি আপনভোলা মানুষ, নয় এত বিনয়ী যে নিজের কথায় গুরুত্ব দেন না। শেষের দিকে মোরেজ্ লিখেছেন, "To me, she is a good and gentle woman who lost part of her heart on the way to wherever she is now."

RAW-র সংগঠন, জরুরী অবস্থার আগে থেকে (বেশ কিছুদিন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন), 'সশস্ত্র সংঘাতে' ও জেলে অসংখ্য কিশোর ও যুবক হত্যার অন্যতম হোতা, বাঙ্গালোরে স্নেহলতা রেড্ডীর নির্মম কারাবাস ও মৃত্যু বিষয়ে উদাসীন, স্নেহলতার মেয়ে নন্দনার উপর পুলিশী আক্রমণের নির্লিপ্ত প্রত্যক্ষ দর্শক—তিনি নরম মানুষ! মা'র কষ্টের শোধ তিনি দেশের উপর নিয়েছেন বোধ করি।

দু তিন দশক আগে পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে জীবনীকাররা ব্যক্তিবিশেষকে বোঝার ও বিশ্লেষণের প্রয়াস করতেন। মোরেজের ঝোঁক ব্যক্তিবিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের সহজ পাঠ। ফলে যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা সুখপাঠ্য নেহরু পরিবারের ইতিহাস ততটা নয় যতটা রম্যরচনা। এই বীরাঙ্গনা কাহিনীর রচয়িতাকে মাঝে মাঝে ইন্দিরা-দরবারের পারিষদ মনে হয়। ডাঙ্গেপন্থী ও রুশী ভাষ্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল আছে।

Mrs. Gandhi by Dom Morais, Vikas, Price Rs. 150

অক্টোবর, ১৯৮০

উড়ো খৈ

প্রথমেই প্রদেশের নাম নিয়ে গণ্ডগোল। দু বছর আগে ঢাকার একটি সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনার সময় 'বাংলাদেশ'-এর রাজনীতি, পার্টি ও নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করায় ভদ্রলোকটি বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি মুজিব-বাদী ছিলেন না, কিন্তু বলেছিলেন যে মুজিব ছাড়া দুর্ভাগ্যক্রমে আর কোন নেতা নেই, মুজিব বেশ কিছুদিন চালিয়ে যাবেন। দিনটা ছিল ১৪ আগস্ট। তার পরদিন সপরিবারে মুজিব বিগত হন। সাংবাদিকের ভারাক্রান্ত মুখ দেখে মনে পড়ল আমি পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সমালোচনা করছি, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় আমরা পশ্চিমবঙ্গ না বলে বলি 'বাংলাদেশ'। তাই গণ্ডগোল।

পূর্ব পাকিস্তান হবার পর প্রথমে ওখানকার বাংলা ভাষায় বহু অপ্রচলিত উর্দু, ফারসি ইত্যাদি শব্দ জোর করে ঢোকান হয়, উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার চেষ্টা চলে। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে ওখানকার জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীরা সে-সব শব্দ আবার বরবাদ করে নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার শুরু করেন। সুতরাং ১৯৭১ সালের পর নিজেদের দেশের নামকরণে (বাংলাদেশ) ওদের দ্বিধা বা অসুবিধা হয়নি। দেশ বিভাগের পর আমরা বাংলাদেশ বলে পরিচয় দিলে সেটা ভবিষ্যতে পররাজ্য গ্রাসের একটা মতলব বলে মনে হতে পারত। কিন্তু 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটা জনগ্রাহ্য নয়। এ-বিষয়ে জ্যোতি বসু কিছু করতে পারেন, অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে। বোশ দেরি করা অনুচিত, কিছুদিন পর তাঁকে এ-বিষয়ে হিন্দিতে আলোচনা করতে হবে। আর একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্যার আলোচনা করা এই প্রবন্ধ-লেখকের ক্ষমতার বাইরে। কেননা কোন জিনিসের 'গভীরে' ঢোকা আমার স্বভাবে নেই। বেশ কিছুদিন ধরে বাঙালিরা ফিচ্‌লে, আড্ডাবাজ ও উন্নাসিক। তাছাড়া তিরিশ-চল্লিশ দশকের আড্ডায় তবু যা গুরুগম্ভীর, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চা-সিগারেটের সাহায্যে অল্পস্বল্প চলত তা এখন সম্ভব নয়। চা আজকাল বুদ্ধি শানায় না। অথচ তরল মাদকদ্রব্যে ফুর্তির ভাবটা যত বাড়ে, আলোচনার সার পদার্থ তত কমে। এর ব্যতিক্রম আছে। অনেক ছোট পত্র-পত্রিকার বিষয়-বস্তু তার প্রমাণ। কিন্তু এদের সংখ্যা বড় বেশি। অর্থ ও লোকবল একত্র করে যদি মোটামুটি সহধর্মী বুদ্ধিজীবীরা অসংখ্য পত্র-পত্রিকার পরিবর্তে কয়েকটির দিকে মন দেন তাহলে তাঁদের বার্তা বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছবে। গোষ্ঠির সংখ্যাধিক্য পশ্চিমবঙ্গের আর একটি সমস্যা।

১৯৪৭ ও তার পরেকার পর্যায়ে ফেরা যাক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এখানে এসেছেন। একসঙ্গে নয়, খেপে খেপে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন কিছু করেন নি যতটা করেছেন উত্তর ভারতে। এখানে কিন্তু একটা দুটো কথা বলা দরকার। দেশবিভাগের সময় লেখক দিল্লীতে ছিলেন। পাঞ্জাব, দিল্লী ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীভৎস নরমেধ চলে, লক্ষ লক্ষ লোক আদিবাস ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন, নতুন জায়গায় গিয়ে যে সমস্যার মুখোমুখি হন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তবু তো বলা হয় Peaceful transfer of power! একহিসেবে সঠিক। যাঁরা ক্ষমতা পেলেন তাঁদের কোন ক্ষতি হয়নি, তাঁরা মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে উত্তর ভারতের মতো ভয়াবহ তাণ্ডব ঘটেনি: মাঝে মাঝে গণ্ডগোল বেঁধেছে। লোক মরেছে, আতঙ্কে অনেকে এখানে চলে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা, কাগজে পড়েছি ৪০ লক্ষ। এখান থেকে কতজন পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছেন? এখানকার উদ্বাস্তুরা সবাই কলকাতায় বা আশেপাশে নেই. অনেককে বাইরে পাঠানো হয়েছে, যেমন দণ্ডকারণ্যে। অবশ্য অনুর্বর জমিতে, কঠিন পরিবেশে যেখানে ডাল ভাত ইলিশ মাছ খাওয়া নদীনির্ভর প্রাণীদের জীবনযাত্রা দুরূহ। উদ্বাস্তুদের আগমন পশ্চিমবঙ্গের ওপর চাপসৃষ্টি করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৭১ সালে, ইন্দিরা গান্ধীর মতে, এক কোটি শরণার্থী এখানে হু হু করে এসেছিলেন। বিয়ের দিনে, জামাইষষ্ঠীতে যেখানে বাজারদর হু হু করে চড়ে সেখানে এক কোটি বাড়তি লোক সত্ত্বেও জিনিসপত্রের দাম তেমন বাড়েনি। এটা ভাববার বিষয়।

অনেকে বলেন 'বাঙালীরা' অলস তাই তাঁরা নতুন করে সংসার গড়ে তুলতে পারেন নি। আসলে পশ্চিমবঙ্গের অনেকের মনোবৃত্তি উন্নাসিক, উদ্বাস্তুরা সরকারী বেসরকারী ভাবে যথেষ্ট সহানুভূতি পাননি। আলস্যের প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে হ'ল। ১৯৪৭-এ দিল্লীতে কনট প্লেসে একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে বিকেল বেলায়, আমাকে বলল ওখানকার একটি দৈনিক পত্রিকা কিনতে। ছেলেটি উদ্বাস্তু। বললাম পত্রিকাটি আমি সকালে পড়েছি, ওটার দরকার নেই, দামটা দিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটি নিল না। কিছুদিন পরে দেখা গেল উদ্বাস্তু পরিবারের অনেক মেয়েরা জামাকাপড় ধোওয়া, সেলাই, গরম রোটি সরবরাহের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন অনেক স্থানীয় বাসিন্দের সঙ্গে। ওদের মধ্যে আলস্য চোখে পড়েনি। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর পয়সা ঢেলেছেন, সম্পত্তির বিনিময় হয়েছে। এখন দিল্লীর পুরনো মুঘল আদব-কায়দা, আদাব, সেলাম আলেকম সংস্কৃতি প্রায় মুছে গিয়ে পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখদের প্রবল আধিপত্য। শুনেছি ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে পাঞ্জাবী ঠিকেদার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর পয়সা করেছে। গৃহনির্মাণ যে ভাবে

এগিয়েছে তাতে আগেকার দিল্লী আর নেই, এমন কি ওখানকার ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নের বেশির ভাগ আধুনিক ঘড়বাড়ি অফিসের আধিক্যে ও চাকচিক্যে প্রায় চোখে পড়ে না।

দিল্লী থেকে এসে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে হতাশা বেড়ে চলে। দিল্লী বম্বের তুলনায় কলকাতাকে মফস্বল শহর মনে হয় যদি, তাহলে সত্যিকার মফস্বল শহরগুলির অবস্থা অনুমান করা সহজ। তবু এই শহরের পিছনে যা অর্থব্যয় হয়, যে-সব পরিকল্পনা চালু করার প্রচেষ্টা চলেছে তা ভস্মে ঘি ঢালা। সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো, বিত্তবানদের মনোভাব, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মুনাফাপ্রীতি এমন যে টাকার মা-বাপ নেই। তিরিশ বছর কংগ্রেসীরা বেশ কিছু কামিয়ে নিয়েছেন দেশ ও দশের নামে। দেশের সমান অগ্রগতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ভারত শোষণের যে ব্যবস্থা চালু করে গেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে সব ব্যাপারে—সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিহার, ওড়িশ্যা, আসাম। দেশের সর্বত্র ইস্পাতের দাম সমান, অন্য দ্রব্যমূল্য সাধারণত নির্ণয় করে মুনাফাখোরেরা। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন রণজিৎ রায়, মার্কসবাদী আমার কয়েকজন বন্ধু অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত নন। কিন্তু বাঙালির, শিক্ষিত বাঙালির একটা অভিমান ও আক্রোশ বেড়ে চলেছে। পাতাল রেলওয়ে, স্টেডিয়াম, হাওড়ায় দ্বিতীয় ব্রীজ, হলদিয়া, টেলিভিশন নিয়ে অর্থব্যয় চলেছে। পাতাল রেলওয়ের টাকাটা মফস্বলে ঢাললে পশ্চিমবঙ্গের নিঃসন্দেহে উন্নতি হত। গ্রামাঞ্চলের কথা তোলা বাতুলতা। কেননা বেশির ভাগ লোক সেখানে থাকেন, জমিতে খাটেন দৈনিক মজুরিতে বা ভাগচাষী হিসেবে। তাঁরা মহাজন ও জোতদারদের মুখাপেক্ষী, ধর্মঘট তাঁরা করতে পারেন না। বছরের বেশির ভাগ সময় কোনো কাজ থাকে না। কিছু কিছু পরিবার কলকাতায় এসে পথে-ঘাটে সংসার পাতেন, কিছু লোক কাজ পায়। মেয়েরা ভিক্ষা করে। তবু তাঁরা বলেন গ্রামের চেয়ে শহরের ফুটপাত ভালো। গ্রামে সাহায্য করার কেউ নেই। এখানে বাবুরা দু-এক পয়সা দেন, ছোটখাটো রেস্তোরাঁয়, খাবার দোকানের, গৃহস্থালির উচ্ছিষ্ট বা বাড়তি খাবার পাওয়া যায়, বর্ষার সময় কপাল ভালো থাকলে গাড়ি বারন্দায় মেলে আশ্রয়। চালের চোরাকারবার আছে।

গ্রাম বাংলার সমস্য আমূল ভূমি সংস্কারের সমস্যা। আসলে পশ্চিমবঙ্গ কেন, গোটা দেশের সমস্যা জট পাকিয়ে এমন জায়গায় এসেছে যে স্তোকবাক্য, গান্ধীবাদ, যোগ, হঠযোগ, জোড়াতালি দিয়ে কিছু করা যাচ্ছে না। একটা জিনিস ঘটেছে, যেটা শাসক শ্রেণীর পক্ষে ভালো নয়। বিভিন্ন নেতা ও দলের আসল চেহারাটা আজকাল জনসাধারণ চটপট ধরে ফেলে। 'জনতা ঢেউ' এসেছিল মার্চের নির্বাচনে। তারপর এলো জনতা পার্টির খেয়োখেয়ি, অনৈক্য, বড়লোক প্রীতি, গ্রামে হরিজন ও অন্যান্য শ্রেণীর প্রতি জনতা জোতদারদের প্রচণ্ড অত্যাচার। ফলে উত্তর প্রদেশে মার্চের তুলনায় জনতার ভোট ১৫ শতাংশ

কমেছে, বিহারে ও অন্যান্য অঞ্চলেও কমেছে। বিপদের লক্ষণ হলো কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধি। শ্রীমতীর আনাগোনা, বেদান্ত ভক্তি, অনুশাসন পর্বের সন্তের সঙ্গে তিন দিনের আলাপ-আলোচনা। প্রিয়দর্শিনী ক্ষমতায় ফিরে এলে আশা করি আচার্য মুষল পর্বকে অভিনন্দন জানাবেন। বিপদের কথা উঠত না যদি কংগ্রেস বা জনতার বিকল্প কোন বামপন্থী পার্টি মাথা তুলে দাঁড়াত। অন্যথা বিভিন্ন জায়গায় খণ্ডযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে দু-একটা জায়গায় নাকি চলেছে। এটা অন্য পথ। সাংবিধানিক পথ নয়। তবু হয়ত শেষ পর্যন্ত জনগণ এই পথের দিকেই ঝুঁকবে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম নয়। যাহোক ততদিন আমরা ভাঙা হাটে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে যাব। আমাদের আছে সত্যজিৎ রায়, জ্যোতি বসু, বিশ্বকবিপুষ্ট সাচ্চা সংস্কৃতি। আমরা মধ্যবিত্তরা, যারা বেকার নই, চালিয়ে যাব। ভারতচন্দ্র বলে গিয়েছেন :

ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে।

যোগাভ্যাস করলে ভয়টাও থাকবে না।

৩ অগস্ট, ১৯৭৭

২

একটা বয়সে, সমাজব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের আশু সম্ভাবনা না থাকলে, ভবিষ্যতের কথা ভাবা যায় না। মনে হয়, এইভাবে কেটে যাবে কাল। হতাশার ভাব মাঝে মাঝে হয় ; সব সময় হলে তার থেকে একটা কিছু বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ক্ষণিক হতাশা আর অভ্যাসবশে দিনগত পাপ-ক্ষয় করে গেলে অবস্থাটা হয় হাফ্-গেরস্তের মতো।

কৈশোর ও যৌবনে নানা প্রত্যাশা ছিল। ব্যক্তিগত আশা-অভীপ্সার কথা তোলা বোধহয় নিরর্থক, কেননা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের ভাবনা-চিন্তায় বিশেষ ফারাক থাকে না। পরীক্ষা পাশ করা, ভালো চাকরি পাওয়া, সুন্দরী স্ত্রী (ফর্সা রং মানে আমাদের দেশে সুন্দরী), ছেলেপিলে বেশি নয়, কয়েকজন বন্ধুবান্ধব (অন্দরে তাদের ঘন ঘন আনাগোনা অবশ্য উচিত নয়), বার্ধক্যে পেনশন, অল্পদিন ভুগে মহাপ্রস্থান ইত্যাদি। এ-সব অবশ্য আশা-অভীপ্সা, অনেকের জীবনে বাস্তবে পরিণত হয় না, শেষেরটা বাদে। বাস্তব বড়ো হিসেবী, নির্মম। বাস্তবকে বদলানো মানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বদলানো। ভাবতে ভালো লাগে কিন্তু অনেকের সাধ্যে কুলোয় না।

শারীরিক কারণে যৌবন বড়ো যন্ত্রণার কাল। তখন ফ্রয়েডকে ঋষি মনে হয়,

কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাপে সে-যন্ত্রণা কেটে যায়, সঙ্গম অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষ শরীর সর্বস্ব নয় তার প্রমাণ যৌবনে দেহগত জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হন।

ছেলেবেলায় ভাবতাম, এই শালা গোরাদের হাত থেকে কবে রেহাই পাবো। মিশনারি কলেজে ভর্তি হয়ে সাহেব অধ্যাপকদের ব্যক্তিগতভাবে খারাপ লাগত না, কিন্তু সাহেবদের রাজত্ব থেকে মুক্তি, অর্থাৎ স্বাধীনতার চিন্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। মুক্তিলাভের পথ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমাদের চরিত্রে সন্ত্রাসবাদের প্রভাব বেশি, তাই গান্ধীপন্থা হাস্যকর মনে হতো, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ম্যাজিস্ট্রেট নিধন মনে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করত। ১৯৩০-৩১-এ একবার দেশবন্ধু পার্কে পুলিশের লাঠির তাড়নায় গান্ধীপন্থীদের মুক্তকচ্ছ পলায়ন এখনো মনে আছে। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত না থাকলে নাক-উঁচু ভাব সহজেই আসে। তাছাড়া ছেলেবেলায় মেয়েদের সভায় মা সোনার বালা খুলে গান্ধীজীকে দেওয়াতে তিনি আমাকে একটি মাত্র কমলালেবু দিয়েছিলেন—সেই অসম বিনিময়ের ব্যাপারটি কখনো ভুলিনি।

কিছুদিন পরে আন্দামান-ফেরৎ সন্ত্রাসবাদীদের অনেকে মার্কসবাদী হলেন, লাল ঝাণ্ডার কথা শুনলাম, সিডনি ও বিয়েট্রিস ওয়েবের রাশিয়া বিষয়ক বই পড়লাম, তার আগে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ; অনেকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সাম্যবাদী পথ ছাড়া দেশের মুক্তি অসম্ভব। 'রাশিয়ার চিঠি' ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয়। তার বছরখানেক পরে রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে তাঁর নাতি নীতিনকে নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন কিছুতেই মানুষখেগো বলশেভিকদের পাল্লায় না পড়ে। অল্প বয়সে নিতুর মৃত্যু হওয়াতে সে বিপদ তার ঘটেনি। আমরা অবশ্য বরাবর রাশিয়া ও স্তালিনের ভক্ত। রুশ-জার্মান যুদ্ধের সময় মনে হয়েছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন হঠকারিতা, যদিও যাঁরা সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, মারা গিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে কোনো বিরূপ ভাব ব্যক্তিগতভাবে আমার ছিল না। তাঁরা আন্তরিক মানুষ, কিন্তু রাজনীতি তো অন্য ব্যাপার, লেনিন বলেছেন 'there is no sincerometer in politics.' তখন মনে হতো, রুশ-জার্মান যুদ্ধের পরিণতি দেখার জন্য অন্তত বেঁচে থাকা দরকার। স্তালিন বলেছিলেন যে মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদ কখনো পড়বে না। পশ্চিম ইউরোপে নাৎসি বাহিনীর প্রবল পরাক্রম ও প্রথমদিকে রাশিয়ায় বিদ্যুৎগতি—ইত্যাদি কারণে স্তালিনের ঘোষণা সম্বন্ধে মনে একটা খটকা ছিল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনি। স্তালিন কম কথা বলতেন, প্রথম বিপর্যয়ের পর মাঝে মাঝে যুদ্ধের গতি বিষয়ে যা বলতেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে। এখন অনেকে স্তালিনের নিন্দায় মুখর। তিনি ভুলভ্রান্তি করেছেন, অকারণে অনেকের প্রাণহানি করিয়েছেন, সন্দেহবাতিকে ভুগতেন, কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর মতো পুরুষ ছিল বলে রাশিয়া বেঁচে গেছে। একটা কথা মনে হলে এখন মাঝে মাঝে মাথা

চুলকোই। চীনের খবর কিছু কিছু আসতো, Edgar Snow-র Red Star over China পড়েছিলাম, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা—বা অশিক্ষার ফলে আমরা বড়ো বেশি ইউরোপমুখী ছিলাম। মাও সে-তুং-এর রচনাবলীর প্রতি তেমন একটা ঝোঁক ছিল না তখন যতোটা ছিল স্তালিনের লেখার প্রতি। তাছাড়া রাশিয়ার স্বার্থে আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেদের নীতি নির্ধারিত করত। তখন মনে হতো সব ঠিক, রাশিয়া বাঁচলে বাপের নাম। মূলত হয়ত তাই, কিন্তু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা বোধহয় ঠিক ছিল না। অবশ্য যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব পাশ করে কংগ্রেস নেতারা হাঁপ ছেড়ে জেলে চলে গেলেন, পুলিশ আসতে নেহরু বলে উঠেছিলেন—'Hurrah, they have come!' জাপানী বাহিনীর নিকটবর্তিতা গান্ধীজীর ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল, তাতে অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এখানে একটা জিনিস স্বীকার করি নির্ভয়ে, কেননা মার্চের নির্বাচনের সময় থেকে আমাদের নির্ভীক হতে বলা হয়েছে—নেতাজীর প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। একটা কারণ, ভারত ত্যাগের পর ওঁর বিষয়ে তথ্যের অভাব। তিনি, পরে জেনেছি, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের বিরোধী ছিলেন। আরো কিছু তথ্য পরে বেরোবে। ১৯৩৭ সালে, কংগ্রেস সভাপতি তখন, নেতাজী মুসোলিনীর সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের চেষ্টা করেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। ভেবে দেখলে ব্যাপারটা খারাপ নয়। নেতাজীর প্রতি বিরাগের একটা ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। শরৎবাবুর বাড়ির একজন বললেন যে তাঁর মেয়ের বিয়েতে আমাকে ডাকা হবে না কেন না জাতে আমি তাঁতী। মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে আমাকে কাঠ ও তাঁতের কাজ শিখতে হতো। তাঁতী শুনে খটকা লাগল। বাড়িতে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি খেপে আগুন—আমরা বদ্যি, প্রায় বামুনের সমান, অশৌচের কাল আমরা কমিয়ে দিয়েছি, আমরা পৈতে নিই ইত্যাদি (নেড়া হবার ভয়ে আমি নিইনি, দিল্লীতে বিয়ের সময় শ্বশুরমশায়ের পৈতে ধার করেছিলাম)। কিন্তু শরৎবাবুর মেয়ের বিয়েতে আমার নিমন্ত্রণ হলো না। আমার বাবা অবশ্য সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন, সেজন্য জেলেও যেতে হয় যুদ্ধের সময়। যাই হোক বেঁচে থাকা সার্থক হ'লো, লাল বাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করল।

তারপর উঠল আমরা কিভাবে স্বাধীন হবো তার কথা। গণ-আন্দোলনের বদলে গণহত্যা, কলকাতার নরক, মারীর বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নেতাদের কচকচানি হিসেব-নিকেশের অন্ত নেই, এদিকে বহু নরনারী শিশু স্বর্গলোকে চলে গেল 'স্বাধীনতা'র হত্যাকাণ্ডে। কলকাতায় ১৯৪৬-এ গণ্ডগোল শুরু হবার দিন দুয়েক আগে দিল্লী চলে যাই, কর্মস্থলে। সাম্প্রদায়িক হত্যার নমুনা দেখেছি দিল্লীতে ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির হপ্তা দুই দিন পরে। স্বাধীনতা দিবসে আমার পুলক হয়নি।

এখনো প্রতি বছর ১৫ অগস্টে দিল্লীর তাণ্ডবের কথা মনে পড়ে। তার ওপর দিনটা অ-তরল।

স্বাধীনতার পর কম্যুনিস্ট পার্টি আবার অবৈধ হ'ল, তেলেঙ্গানায় অভূতপূর্ব আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও রাজাকাররা। সেসময় একজন কম্যুনিস্ট, যাঁর যুক্তি-তর্ক প্রখর, আমাকে দিল্লীতে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে, জয়লাভের দেরি নেই। কলকাতায় চাকরি নিয়ে ফিরলাম। কাগজে পড়লাম যে, বাসে ট্রামে পটকা ছোঁড়া হচ্ছে ইত্যাদি। রনদিভের 'হঠকারিতা'র যুগ। তিনি তখন মাও-বিরোধী।

কম্যুনিজমের জয়লাভ দেখার জন্য বেঁচে থাকার সার্থকতা তখন ছিল, বুদ্ধির দিক দিয়ে। অন্যান্য ব্যাপারে অবশ্য এমন কিছু খারাপ ছিলাম না।

কলকাতায় ফেরার কিছু দিন আগে মাও সে-তুং-এর বাহিনী অভূতপূর্ব-ভাবে চীনে নতুন যুগের প্রবর্তন করল। তার কিছুদিন পর শুরু হ'ল কোরিয়ার যুদ্ধ। ফলাফল সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তারপর অত্যন্ত বিচলিত করেছিল ১৯৫৬ সালে স্তালিনের প্রতি আক্রমণ। 'দেখিলাম থাকে না কিছুই'। ১৯৫৭ সালে চাকরি নিয়ে মস্কো যাই। সেখানে রুশদের কাছে স্তালিনের প্রতি আমার অনুরাগ কখনো গোপন করিনি। মধ্যবয়সীরা বিশেষ কিছু মনে করতেন না, একলা থাকলে। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ছিল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। এরাই এখন আমেরিকানদের আদর্শে জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর, বেঁচে থাকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম, ভিয়েতনামে যুদ্ধের সময়। প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে কীভাবে লড়ে ভিয়েতনাম শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করল তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

যখন ভাবছি যে ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে এমন কিছু একটা করুণ ব্যাপার হবে না (নকশালপন্থী আন্দোলনের সময়কার তীব্র বিশ্বাস ও আগ্রহ কমে এসেছে। পার্টির বাইরে থাকলে মধ্যবিত্তদের যা হয়), তখন এল ২৬ জুন, ১৯৭৫! গাইবাছুরের যা দাপাদাপি, যেভাবে ভদ্রমহিলা ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাতে মনে হ'ল পরিণাম দেখার জন্য অন্তত টিঁকে থাকা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা ছিল ওঁদের পরিণতি হবে মুজিবের মতো। যে-ভাবে 'সুরিয়া অস্ত হো গিয়া' সেটা অবাক কাণ্ড। ভদ্রমহিলা শুনছি এখন মাঝে মাঝে দুর্বল মুহূর্তে ভাবেন যে মানুষ যদি করতেই হয়, একটার বেশি মোটেই নয়।

অধুনা বেঁচে থাকার কী মানে অনেক সময় বুঝতে পারি না। যে পার্টিতে বিশ্বাস ছিল সেটি খণ্ডবিক্ষিপ্ত, অনেককে মারা হয়েছে নৃশংসভাবে, অনেকে কারাগারে, মাও সে-তুং-এর দীর্ঘ যাত্রা শেষ। যদি বলেন সি. পি. এম. নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলবে সেই আশায় থাকুন, সে গুড়ে বালি। পার্টির নেতারাই বলেছেন যে এদেশে কেন্দ্রই সর্বেসর্বা, সব ব্যাপারে 'দিল্লী চলো' নীতি গ্রহণ না

করে উপায় নেই। এই বিশাল দেশে আমূল পরিবর্তন কবে এবং কীভাবে হবে, মাছের দাম কবে কমবে, পরম ব্রহ্ম পর্যন্ত জানেন না।

২৪ অগস্ট, ১৯৭৭

৩

গঙ্গামাটি কিংবা অন্য কোনো গ্রামে এক ব্রাহ্মণ নেমন্তন্ন করাতে রাজলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বিস্মিত শ্রীকান্ত ভাবলেন হিন্দুধর্ম এবং সমাজে খাওয়া ব্যাপারটা যে কতো বড়ো সংস্কার সেটা কি বুদ্ধিমতী বাঈজী রাজলক্ষ্মী জানেন না? শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হ'ল সহজে, কী একটা ব্রত উপলক্ষে রাজলক্ষ্মীর সেদিন উপবাস। ভোজন করলেন শ্রীকান্ত ও অন্য ঘরে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নতুন করে পড়তে গিয়ে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। কতো নারী শ্রীকান্তকে মনপ্রাণ—দেহ নয়—উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন দেখা-মাত্র, আমরা কেন তাদের মতো করুণাময়ী দেখি না প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও। মেয়েদের ব্যাপার আজকাল বড়ো জটিল, ওদের কথা না হয় এ-বয়সে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারটা তো ভুলতে পারি না, ওটা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায় একটা অনুষ্ঠান। শরৎচন্দ্র কি ভোজনবিলাসী ছিলেন? কিংবা অপরকে, বিশেষ করে নায়কদের খাওয়ানোটা বাঙালি নারী চরিত্রের একটা অতি সুমধুর দিক? রাজলক্ষ্মী যখন একটা সময় শ্রীকান্তের ভোজনের তদারকে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন তখন শ্রীকান্তের অভিমান আমাদের রীতি-মতো বিচলিত করে। বাঙালি সংসারে এমন নির্মমতা সম্ভবপর? বাড়িতে গণ্ডগোল হলে পরিবারকে জব্দ করার জন্য এখনো তো না খেয়ে বেরিয়ে যাই।

একটা অভিযোগ আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু করে প্রায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত কী কী ব্যঞ্জন প্রিয়জনের পাত্রে পরিবেশিত হতো তার বিস্তারিত বিবরণ শরৎচন্দ্র দেননি। রাত্রে লুচি বা 'নুচি'? মাছ মাংস দুই-ই? শাকসব্জি কতো ধরনের? মোন্ডা মিঠাই? দই-রাবড়ি? পুরনো বাংলা সাহিত্য প্রায় ভুলে গিয়েছি, কিন্তু কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীতে আহার্যের মনোহরা বর্ণনা আছে। কতো রকমের চাল হতো, আরো কতো কী। আমার এক বন্ধু বইটা মেরে দেওয়াতে ঠিক বলতে পারছি না। সতীগণের পতি-নিন্দার মতো আহার্যের ফিরিস্তি দেওয়া পুরনো বাঙালি কবিদের বিশেষত্ব ছিল। শরৎচন্দ্র এই ঐতিহ্যের রেশ টেনে চললে তার একটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকতো 'এটা খাও, নইলে আমার মাথা খাও' এখনো মাঝে মাঝে মেয়েদের মুখে শুনি। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা দেহ দিতে নিতান্ত নারাজ ছিলেন বলে

হয়ত মনের মানুষদের ভুরিভোজন করিয়ে এক-ধরনের মুক্তি পেতেন, যাকে বলে sublimation। দেহ দেওয়া-নেওয়াটা মন-দেওয়া-নেওয়ার মতো সহজ হয়েছে শুনি। কিন্তু পৈটিক ক্ষুধা মেটানো দুঃসাধ্য ব্যাপার, জিনিস-পত্রের যা দাম!

একটা সময় পানের সঙ্গে লবঙ্গ, মাথার সঙ্গে কানের মতো একাঙ্গ ছিল। পানের নেশা না থাকলেও গৃহস্থর বাড়িতে বড়ো ও ছোট এলাচ, মৌরি, দারুচিনি লবঙ্গ ভাজা মশলা থাকতো খাবার পর মুখশুদ্ধির জন্য। সর্দি-কাশিতেও কাজে লাগতো। কতো দিন হয়ে গেল বাড়িতে ও-সবের বালাই নেই। সুপুরি এখন ভালো লাগে না, কেউ দিলে অস্বস্তি লাগে, কারণ নকল দাঁতে শক্ত সুপুরি ভাঙা কষ্টসাধ্য। অনেক কথার মানে হয় না এখন। মুড়ি মিছরির এক দর? মুড়ি যদিচ দেখা যায় মিছরি চোখে পড়ে না। কথায় বা লেখায় খৈ ফোটে, জিনিসটা বাড়িতে আসে না। ছেলের হাতের মোয়া—বিরল ব্যাপার। ডাল-ভাতের মতো সহজ, এটা বলার দুঃসাহস কার আছে? ডাবের দাম এতো হবে কেউ কল্পনা করতে পারতো? আমার এক বন্ধু ডাব খাওয়ার ঘোরতর বিরুদ্ধে। ডাব পেকে নারকেল হলে নানা ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে ওঠে—যেমন হয়েছে কেরালায়—কিন্তু এখানে আমরা বাবুরা দুপুর বেলায় টিফিনের সময় পেট ঠাণ্ডা করার জন্য ডাব খেয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের সর্বনাশ করছি, রাস্তায় জঞ্জাল বাড়ছে। আমাদের মুশকিল হ'ল অনেক জিনিসকে পাকতে দিই না। চা-পান তো বিষপান, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আগেই সাবধান করেছেন।

এদিকে বাজার অগ্নিমূল্য, ওদিকে ফুচকা ভেলপুরি, আলু কাবলী ইত্যাদির কী চাহিদা। রাস্তায় রাস্তায় খাবারের দোকান আর ব্যাঙ্কের ছড়া-ছড়ি। ফুটপাথে-থুড়ি 'পেইভমেণ্টে'—টিফিনের খাবার সস্তা। রেস্তরাঁয় ছেলেমেয়েরা যুগলে গিয়ে কতোটা নিজেদের মাথা আর কতোটা খাবার খান জানি না। একদিকে জনসাধারণের ভাঁড়ে মা ভবানী, অন্যদিকে প্রাচুর্য—শহর ও শহরতলির কথা বলছি, গ্রামাঞ্চলের নয়। সেখানে প্রাণধারণের আশ্চর্য শক্তি নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলতে পারে। ঘাসে প্রচুর ভিটামিন আছে, এখনো সেটা গ্রামের গরিবদের মধ্যে চলতি নয়, হয়তো ঘাসের অভাবে গরু ছাগল মারা যাবে বলে। বাংলাদেশ, মানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, আদিবাসী বা হরিজনরা মেঠো ইঁদুর খায় অভাবের সময়। সাঁওতালরা সাপ খায় ও নাগারা কুকুর বর্মার অবস্থাপন্ন মানুষেও উচ্চিংড়ে খান, স্বচক্ষে দেখেছি। আমার নিজের ধারণা, খাবার হিসেবে বিষদাঁত বাদ দিয়ে সাপের মাংস খুব নরম ও সহজ পাচ্য হবে। বাড়িতে পোষা কুকুর আছে, ভেড়ার মত নিরীহ। কুকুরের মাংসের কথা তুলছি না। 'বড়ো মাংসের' কথা তোলাটা পাগলামি। গিন্নীরা খচে যাবেন। লিভারের ব্যামোয় ডাক্তারি মতে 'বড় মাংস' খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে যদিচ গৃহিণীদের কিছুটা বোঝানো যায়, বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেলে ঝি-চাকর ভাগবে। তাছাড়া, আমরা গোমাংস খেতে শুরু করলে গরিব

মুসলমানরা বিপদে পড়বেন। এখনো শিককাবাব ও বিশেষ চাপাটি বিশেষ বিশেষ পাড়ায় সস্তা, চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে।

মহাবলিপুরমে পাথরে গরুর অপূর্ব মূর্তি, নীরদ চৌধুরীর Continent of Circe-তে আমাদের আর্যাবিস্থা থেকে পতনের জন্য সন্ধেবেলায় পূর্ব বাংলার গোয়ালে ফেরা গরুদের চোখে জল-এর পর কী করে অবলাদের মাংস খাবেন ?

সত্যি যারা মধ্যবিত্ত (আবার বলি গ্রামাঞ্চলের কথা বাদ দিচ্ছি), যাদের উপরি রোজগারের উপায় বা ইচ্ছে নেই, তাঁদের খেয়ে পরে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। পান থেকে চুন না হয় খসলো, কিন্তু মাছ সবুজি—প্রোটিন ভিটামিন —বাদ দিয়ে কতোদিন চালাবেন ? তার ওপর ছেলেমেয়েদের ওপর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচণ্ড চাপ। একে গরমের দেশ, তায় পুষ্টিকর জিনিস পেটে যায় না, মুখস্থ করে মনের পুষ্টি কেমন করে হবে ? ঘরে ঘরে আজকাল দাম্পত্য কলহ বেড়েছে। কেননা যে মেয়েরা আগে অভ্যাগতদের খাইয়ে প্রচুর আনন্দ পেতেন, তাঁরা বিরাট বিশ্বের খবর রাখেন না। তাঁরা জানেন না যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা দেশে, এবং সারা দেশ কেন, সমস্ত দুনিয়ায়। এমন কি অনেক চতুর অর্থনীতিবিদ্ প্রমাণ করেছেন যে সমাজতান্ত্রিক দেশেও প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। তবে পুঁজিবাদী দেশে অনেকের আয় বোধহয় আমাদের চেয়ে একটু বেশি। তবুও তাঁরা চেঁচামেচি শুরু করেছেন। আমাদের দেশে এখনো হট্টগোল শুরু হয়নি। এদেশে কথায় চিঁড়ে কিছুটা ভেজে। কিন্তু চিঁড়ে না থাকলে কতোদিন ?

মন্ত্রীরা কী করবেন ঠিক করতে পারছেন না। ওঁদের অনেক প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য শত্রু। এসময় মাছ, তেল ইত্যাদির দামের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করলে শত্রুরা পেয়ে বসবে। জ্যোতিবাবু তাই বলে যাচ্ছেন, আমলাদের পুলিশের বাড়াবাড়ির কথা তুলে লাভ নেই, সবই ঘটেছে মহান নেত্রীর আদেশে নিউরেমবার্গে ভাগ্যিস জ্যোতিবাবু বিচারপতি হয়ে যাননি, গেলে বেশির ভাগ কর্তব্যপরায়ণ আজ্ঞাবাহী নাৎসিরা বেকসুর খালাস পেতো।

বিদ্যুৎ ছাঁটাই, যানবাহন বিরল, রাস্তাঘাট এতো এবড়ো খেবড়ো যে হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে কোন এলোকেশীকে দেখতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। এখন একটা কিছু করা দরকার যাতে অন্তত কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের দাম কমে। যদি অল্পবিস্তর তুলকালাম হয়, সদাশয় দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ীরা বেঁকে বসে, যোগান বন্ধ হয়ে যায়, আমরা মাসখানেক-দুয়েক ওসব জিনিস বাদ দিয়ে থাকতে পারবো। এমনিতেই এখন ওগুলোর সঙ্গে পুরাতন আমলের ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক কালেভদ্রে চোখাচোখি হয়।

জেলে এখনো অত্যাচার চলেছে। রাজ্যপাল শেষ পর্যন্ত সই করলেও দন্ডপ্রাপ্ত বন্দীরা মুক্তি পাচ্ছে না। কেননা শেষ পর্যন্ত পুলিশ আমলা পেশকার ইত্যাদির কর্তৃত্ব কমেনি। আলিপুর, প্রেসিডেন্সি জেলের খাবার

অনেকটা—আনন্দবাজার পত্রিকার ভাষায় 'সিংহভাগ'—চলে যায় চেতলার নানা হোটেলে। সিংহসুলভ জেলরের বাড়িতে অনুষ্ঠান থাকলে অসুস্থ রোগীরা বরাদ্দ দুধ মাছ পায় না। আপত্তি করলে পাগলা সেলে পাঠানো হয়। মারপিট তো আছেই। ইংরেজ আমলে মাথাপিছু বরাদ্দ টাকা নিয়ে রাজবন্দীরা নিজেদের খাবারের বন্দোবস্ত নিজেরাই করতেন। নিজের চোখে দেখেছি দুবলা লোক স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে বেরিয়ে এসেছেন। কয়েকজন জেলে বসে আত্মজীবনী লিখেছেন অতি সুন্দর ইংরেজিতে। স্বাধীন ভারতে সে-ব্যবস্থা উঠে গেছে? জেলে যৌথভাবে বাজার রান্নাবান্না চালালে মাওবাদের প্রসার ঘটবে? আসল ফ্যাকড়া হ'ল ঠিকেদার ব্যবস্থা। ঠিকেদারেরা সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের সর্বত্র বিপর্যয় এনেছে। দুর্নীতির একটা প্রধান উৎস এরা, এবং সেইজন্যই কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঠিকেদারদের এতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। Social contract-এর কথা শুনেছি, Social contractor-দের নয়। এদেশ ঠিকেদারদের ভূস্বর্গ।

কিছু যদি করতে না পারেন, অন্তত চুনোপুঁটির দাম কমাতে না পারেন, মোলায়েম বোষ্টমী বাণী তাহলে বন্ধ করুন। গণ্ডগোল বাঁধুক। কিন্তু বোষ্টমী কীর্তনে বছরের পর বছর সধবার একাদশী অতিবাহিত করা কঠিন হবে। বাধা অবশ্য অনেক। উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে নীচের তলা পর্যন্ত টাকার খেলা (ব্যতিক্রম অবশ্য আছে)। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রেণী চরিত্র, বিদেশী পুঁজির অঢেল প্রবেশ, দুই বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতা ও সমঝোতা, প্রধান contradiction কী, এ-সব নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে, চলবে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে বই-এর অভাব নেই, কিন্তু কোথায় যেন একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। মোদ্দা কথায় আসতে আমরা চাই না। বিগত একটি বন্ধুর ভাষায়, সবকিছু 'গুবলেট' হয়ে যাচ্ছে।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

৪

আট বছর বয়সে বর্ণ পরিচয় হলে ছেলেরা এঁচোড়ে পাকে তাড়াতাড়ি। বছর দুয়েক যেতে না যেতে লুকিয়ে 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' পড়া শেষ। একটি বিশেষ রাত্রির পর অচলার মুখচোখ এত কালি হয়ে গেল কেন? সাবিত্রীর মতো ঝি তো আশেপাশে দেখলাম না। যাকে দেখতাম সে একটি সুঠাম, লাস্যময়ী মেয়ে দু-এক বাড়িতে ঠিকে কাজ করে, নাম সুখদা। বড়োদের মধ্যে দু-একজন বলতেন নামটা সার্থক! কেন সার্থক? অনেক কিছু বুঝতাম না।

বয়স আর একটু বাড়লে কবিতার দিকে মন গেল। রাজনীতিতে তখন

গরম হাওয়া। রবীন্দ্রনাথকে মনে হতো জোলো। ফৌজী কবি যিনি জেল খেটেছেন, যাঁর কয়েকটি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছে—অর্থাৎ নজরুল—আমাদের বিপ্লবী নায়ক ছিলেন। এদিকে বয়সের দোষে কল্লোল কালিকলম ইত্যাদি পত্রিকা চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে শুরু করল। এঁদের লেখকরাও তো এক হিসেবে বিপ্লবী, স্থবির ভণ্ড সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। অনেক পংক্তি মুখস্থ হয়ে গেল : 'কাহার চুম্বন কাহারে দিয়াছি কিছু তো নাই মনে' (চুম্বনের পাত্রী অবশ্য তখন বড়ো একটা পাওয়া যেত না)—যা সমাজব্যবস্থা, 'ক্ষয়হীন রাতি গোঙাইনু দোঁহে অক্ষয় তৃতীয়ায়'। সবচেয়ে বিচলিত করল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' : 'রতিক্লান্ত রমণীর কেশের মতন', 'রমণী-রমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি' (বিনয় কেন ?), বেপাড়ায় গিয়ে 'কটুগন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা'। অবিস্মরণীয় সব পংক্তি। লেখকদের বিষয়ে দু-একটা মুখরোচক গল্প ছিল। একজন ফুলশয্যার রাত্রে পকেট থেকে দশ টাকার নোট বের করে নববধূকে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ও, তোমাকে তো দিতে হবে না'। দশ টাকা তখন অনেক টাকা, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বেপাড়ার রেট।

হামসুনের হাওয়ায় অনেক লেখক চুল লম্বা রেখে আদ্দির পাঞ্জাবি অনেকটা ছিঁড়ে ফেলে বারবধূদের ওখানে নানারকম অনিয়ম করে যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতেন। ওঁদের নিয়ে ঠাট্টা করতে পারেন, কিন্তু নিজেদের ক্ষতি করে সাহিত্যাদর্শ ও জীবনযাত্রার সমন্বয়ের প্রয়াস আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না। আমরা এখন বড় হিসেবী।

কালক্রমে সাহিত্যিকদের আড্ডায় ঢুকে পড়লাম। প্রায় প্রতি শুক্রবার শ্যামবাজারে সুধীন দত্তের বাড়িতে 'পরিচয়'-এর আড্ডা। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি আসতেন, বিভিন্ন মতামত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো[যি]। আড্ডায় নিয়মিত যেতেন সুরেন গোস্বামী, নীরেন রায় হিরণ সান্যাল, হীরেন মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অপূর্ব চন্দ, সুরাবর্দী (রাজনীতিবিদের ভাই), শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, গিরিজা ভট্টাচার্য, হমফ্রে হাউজ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুশোভন সরকার, হারীতকৃষ্ণ দেব ; ছুটির সময় ধূর্জটিপ্রসাদ ; মাঝে মাঝে আসতেন সত্যেন বসু ও অবাঙালি ও বিদেশী অতিথি। স্মৃতিশক্তি এখন এতো দুর্বল যে আরো অনেকের নাম এখুনি মনে পড়ছে না। কী কী বিষয়ে বিতর্ক হতো মনে নেই, মাথায় ঢুকতো না। এক কোণে বিজ্ঞের মতো বসে বোঝার চেষ্টা করতাম, জাতে ওঠার চেষ্টায়। বিষ্ণুবাবু তার্কিক ছিলেন না, মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটতেন। সভা আমার কাছে অন্তত জমতো যখন অপূর্ব চন্দ ও সুরাবর্দী যুগলে হাজির হতেন। ওঁদের খিস্তিতে আবহাওয়া স্তব্ধ হয়ে যেতো। আর একজন ছিলেন ব্যারিস্টার অরুণ সেন, যাঁর godlike appearance নিয়ে সুপুরুষ সুধীনবাবু ঈর্ষা প্রকাশ করতেন। কথাবার্তায় অবশ্য godlike ছিলেন না অরুণবাবু। অপূর্ব চন্দের স্ত্রী বিয়োগের পর শোকাচ্ছন্ন বৈঠক-

খানায় ঢুকে তিনি চেঁচিয়ে বলেছিলেন—'Apurba, some people seem to have all the luck in the world and you're one of them !'

আর একবার স্নেহাংশু আচার্যের বাড়িতে এড্‌গার স্নো চীনে যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জাপানীরা ভারত আক্রমণ করলে আমরা কী করবো ? অরুণবাবু বললেন, ওদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ট্রেস্‌পাসের মামলা ঠুকে দেবো। গুরুগম্ভীর হীরেন মুখোপাধ্যায় রসিকতাটা পছন্দ করেন নি। তখনকার দিনে অন্তত রাজনীতিতে গুরুচণ্ডালিকা দোষটা খারাপ লাগতো না।

বুদ্ধদেববাবুর 'কবিতা' আড্ডা ছিল অন্য ধরনের, অনেক বেশি ঘরোয়া, তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। বুদ্ধদেববাবু ছোটখাটো মানুষ ছিলেন কিন্তু কোন কারণে যখন হেসে উঠতেন তখন ঘরে যেন বাজ পড়তো। ওঁর অট্টহাসি থেকে বোঝা যেত যে মনে কোন ময়লা বা বিদ্বেষ নেই। নবীন লেখকদের অবাধ সুযোগ ও উৎসাহ দিতেন। কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল যখন হীরেনবাবু ও আইয়ুব 'কবিতাভবন'-এর উদ্যোগে আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে মন দিলেন। কোন্ কবির ক'টা কবিতা যাবে এই নিয়ে গাত্রদাহ। সংকলনে হীরেনবাবু ও আইয়ুব বিভিন্ন মতাদর্শে আলাদা আলাদা ভূমিকা লেখেন।

বিষ্ণুবাবুর বুদ্ধি ও জিহ্বা প্রখর, অবশ্য বেশি কথা বলতেন না। একবার আমরা তিন বন্ধু (অশোক মিত্র—অর্থমন্ত্রী নন—চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় ও আমি) ঠিক করলাম বিষ্ণুবাবুর স্নায়বিক বৈকল্য ঘটাতে হবে ; তাতে যদি উনি কৈবল্য সন্ধান থেকে বিরত হন। প্রতিদিন বেলা দুটো নাগাদ ওঁর বাড়িতে গিয়ে রাত আটটার আগে উঠতাম না, কারণ পশ্চিমী ধ্রুপদী সংগীত সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ এবং বিষ্ণুবাবুর লম্বা-চোঙা ই. এম. জি. গ্রামোফোন ও রেকর্ড সংগ্রহ তো প্রায় বিশ্ববিখ্যাত। প্রথম দিন সাতেক জলযোগ ও সিগারেট মনের মতো ছিল। তারপর জলযোগের পরিমাণ ক্রমশ ক্রমে ক্রমে শুধু চায়ে দাঁড়ালো, সিগারেটে স্বাবলম্বী হতে হ'ল। মাসখানেক পরে দেখলাম বিষ্ণুবাবু অবিচলিত, কিন্তু আমাদের তিনজনের মধ্যে তুচ্ছ কারণে খিটিমিটি লেগে যাচ্ছে, এ-ওকে দেখলে চটে উঠতাম। নিজেদের মধ্যে স্নায়বিক বৈকল্যের লক্ষণ দেখে রণে ভঙ্গ দিলাম।

বিষ্ণুবাবুর পাশের বাড়িতে থাকতাম বলে দু-একটা ঘটনা ঘটতো। আমার দ্বিতীয় কবিতার বই ওঁকে দিলাম। কিছু দূরে বসা ওঁর স্ত্রী দেখতে চাওয়াতে বিষ্ণুবাবু বইটা পায়ের দুটো আঙুলের মধ্যে গুঁজে ওঁকে এগিয়ে দিলেন। ওঁর স্ত্রী বিস্মিত হয়ে প্রতিবাদ করাতে বিষ্ণুবাবু বললেন, পা দুটো নানাভাবে ব্যবহার করতে পারি বলেই আমরা বাঁদর হয়ে থাকিনি। এখন মাঝে মাঝে ভাবি, পা দিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করলে কেমন হতো ? একবার অবশ্য বিষ্ণুবাবু অল্প বিচলিত হয়েছিলেন। বিয়ে করে প্রথম ওঁর বাড়িতে গেলে

আমার স্ত্রীকে বলেছিলেন, কমবয়সী মেয়ে বিয়ে করার পেছনে আমার উদ্দেশ্যটা কী? আমার স্ত্রী বলে উঠলেন 'ও, আপনি সেই বিষ্ণুবাবু যিনি 'ঝড়জলে ছাতা মাথায় দিয়ে অন্যদের নিন্দে করতে বেরিয়ে পড়েন!' বিষ্ণুবাবু আমার দিকে তাকালেন. আমি অন্যদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

বিষ্ণুবাবুকে কখনো কোট প্যাণ্ট, বুশ সার্ট পরতে দেখিনি। অনেকবার নিমন্ত্রিত হয়েও কখনো বিদেশে যাননি। সবই ভালো, সি. পি. আই. প্রেমটা বাদে।

দেশে গরম হাওয়া চলেছে। বিদেশে ফ্যাসিবাদ রোখবার জন্য এদেশে দু'একটা সংগঠন গড়ে উঠেছে। ১৯৩৮ সালে সর্বভারতীয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের একটা অধিবেশন কলকাতায় হ'ল। সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সাজ্জাদ জাহির, মুলকরাজ আনন্দ ইত্যাদি অনেকে ছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির পর সভ্যতার সংকট ঘটতে পারে বলে সুধীনবাবু বুদ্ধদেববাবু এবং আরো কয়েকজন সংগঠনগুলি থেকে সরে দাঁড়ালেন। বেশির ভাগ লেখক কিন্তু মলোটভ-রিবেনট্রিফ্ চুক্তিতে একেবারে বিচলিত হননি। ইংরেজ ও ফরাসীরা এতোদিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারকে লেলিয়ে দেবার ফন্দি করেছে, এবারে ঠেলাটা সামলাক। তারপর ১৯৪১'র ২২ জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করাতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রাতারাতি জনযুদ্ধে পরিণত হ'ল। ব্যাপারটা ছকে ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল! ছক ঠিক হবার পর সব ঠিক। নবীন উদ্দীপনায় জনযুদ্ধের কবিতা লেখা চলল। দিল্লীতে কলেজে পড়াবার সময় সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯৪৪-এর জুন মাসে মিত্রশক্তিরা পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলাতে বিবেক হালকা হয়ে গেল, সরকারী চাকরি নিয়ে রেডিও'র সংবাদ বিভাগে ঢুকলাম। সংবাদের চাপে, দেশের দাঙ্গাহাঙ্গামায় আস্তে আস্তে কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে এলো—ছক মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছিল।

এখন দেখছি কবিতা লিখে বেশ দু-পয়সা হয়, পত্রিকাবিশেষে ছাপা হলে।

১৯ অক্টোবর, ১৯৭৭

৫

শাকসব্জি মাছ, মাংস, ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাবে বিস্তর ভদ্রলোক বলছেন তাঁদের শরীরে যুৎ নেই। ক্যালোরির অভাব তো সম্প্রতি ঘটেছে। এ-সব বলতে পারেন, একটা ছুতো। আসলে বয়স বাড়ছে, বয়সকালে শরীরের ওপর অনেক অত্যাচার অনাচার করেছেন, বেশ কিছু কুখাদ্য ও পানীয় দেহযন্ত্র আস্তে আস্তে বিকল করে দিয়েছে—মাইকেলের ভাষায় 'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে

বয়সে কাঙালী।' তাই হবে হয়ত।

দু রাত্রি অনিদ্রার ফলে সেদিন বেজায় মাথা ধরেছিল। আমার মাথা ফাঁকা বলে কদাচিৎ ধরে। সেদিন কিন্তু অফিসে গিয়ে মাথাটা পাকা রুই-এর মুড়োর মতো ভারী হয়ে গেল। পাকা রুই-এর কথা মনে পড়াতে মুখ বেজার করে সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আতঙ্কে কিন্তু ঘুম এল না প্রথমে। বেলা আড়াইটে নাগাদ শুরু হবে পাড়ার সর্বত্র নানা ধরনের রেডিওতে সপ্তগ্রামে শীল্ড ফাইনালের ধারা বিবরণী।

ঘুম ভেঙে দেখলাম সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে। অথচ সমস্ত পাড়া নিঝুম। উঠোনে অন্য ফ্ল্যাট, দোতলা, পান বিড়ি মুদীর দোকান—কোথাও সাড়াশব্দ নেই। খেলাটা তা হলে বানচাল হয়ে গেছে? কোনো মহানায়ক কি মহাপ্রয়াণ করেছেন? স্কুল-কলেজ তো বেলা একটার আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে—শীল্ড ফাইনালের জন্য এ-ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা চিন্তার অতীত। সাড়ে চারটের একটু পরে নাতনি ঝোড়ো কাকের মতো জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভগ্নকণ্ঠে জানালো ইস্ট বেঙ্গল একগোলে হেরেছে। পাশের বাড়িতে টি ভি দেখে ফিরছে। খবরটা শুনে বেশ চাঙা লাগলো। কিন্তু পাড়ায় হৈচৈ হয়নি কেন? দুঃসহ বেদনায় গুরুগুরু একটা মেঘ গুমরে ওঠাতে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যারা টিকিট পেয়েছে তারা সবাই গিয়েছে মাঠে। যারা পায়নি তারা রেডিও না শুনে আশেপাশে টি ভি-বাড়ির ভেতরে বাইরে ভিড় করেছে।

এর থেকে বোঝা গেল লোক আজকাল শুধু কানে ধারাবিবরণী শুনে সন্তুষ্ট হবার পাত্র নয়, চোখে দেখতে চায়, দেখে ও শুনে যাচাই করে নিতে চায়। ফলে ও-দুটি ইন্দ্রিয়ের একটা অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটছে, ঘটবে। এই কারণে সম্ভবত প্রকাশ্যে কবিতা পড়ার ধুম চলেছে। আরও প্রমাণ হল যে টি ভির সংখ্যা বেশ বেড়েছে, তার মানে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সচ্ছলতার কিছুটা চুইয়ে (percolation তত্ত্ব) গরিবদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। টি ভি নিজেদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখেন না ভদ্রলোকেরা, গরিবদের প্রতি মায়ামমতা দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ কিনা গত কয়েক মাসের মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন নীরবে ঘটে গিয়েছে। হিন্দি ফিল্ম তো শ্রেণীবৈষম্য—অন্তত দেখা ও শোনার ব্যাপারে—কমিয়ে দিয়েছে অনেকটা।

অবশ্য ব্যাপারটা এত সহজ নয়। টি ভির হিন্দি ছবিতে শারীরিক লাস্য যখন প্রখর হয়ে আসে তখন বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকাদের সঙ্গে একত্র বসে দৃশ্যগুলি দেখা কর্তা-গিন্নী ইত্যাদির পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে শুনেছি। ছোট ছেলেমেয়েরা এখন অনেক পাকা, তাদের রোখা দায়, তাদের কথা ছেড়ে দিন। পড়াশুনোর ক্ষতি হয়। কিন্তু কী করবেন? আর একটা অসুবিধে—শনি রবিবার বাড়িতে আড্ডা দেওয়া অসম্ভব টি ভি থাকলে, এতো হিতৈষী আগন্তুক এসে পড়েন। ফলে যাদের বাড়িতে টি ভি নেই সেখানে আড্ডা বসে,

সে-রকম বাড়ির সংখ্যা অবশ্য ক্রমশ কমে আসছে। হিন্দি ছবি রাষ্ট্রভাষায় প্রসার বাড়িয়েছে। তাছাড়া সিনেমার স্বপ্নলোকে বড়োলোক গরিব লোক, শিল্পপতি ও মজুর সবাই মশগুল হয়ে পড়েন, শ্রেণী-ব্যবধান কমে। কিন্তু অনেকের মতে, হলিউড ও বম্বের পর—মার্কস তখন নেই, লেনিন শুধু সংগ্রামী ছবি বোধহয় দেখেছেন—বিপ্লব করাটা মুশকিল হয়ে পড়েছে, কেননা আজগুবি জগাখিচুড়ি একটা অবাস্তব কল্পনালোকে শ্রমিকেরা উপনীত হলে সংগ্রামী ক্ষমতা কমে যেতে বাধ্য। তখন শ্রেণী-হিংসার বদলে আসে শ্রেণী-ঈর্ষা। ইউরোপে বোধহয় সেই জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিরা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের কথা বরবাদ করেছে।

গ্রামাঞ্চলে সিনেমার প্রসার ততটা ঘটেনি বলে গ্রাম থেকে শহর ঘেরাওর সুযোগ এখনো উবে যায়নি। কিছু গণ্ডগোল ঘটেছে অবশ্য। গ্রাম থেকে উঠতি বয়সের মেয়েরা যারা শহরে কাজ করতে আসে সিনেমা টি ভি ইত্যাদি দেশে শুনে তাদের হাবভাব, বিয়ের সম্বন্ধে ধারণা বদলে যাচ্ছে। গেঁয়ো ভূত বিয়ে করতে চায় না, অনেকে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে শহুরে চালাক চতুর ছেলেদের সঙ্গে ঘর পাতে। দোষ দেওয়া যায় না। গ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ ও বিধানসভার সদস্যরা যদি শহরের যাদুতে ধরা দেন তাহলে গ্রামের বোনদের সমালোচনা করা তাদের পতিদের শালা বলা অনুচিত। তাছাড়া দেশের বিরাট গ্রামাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকায় মধ্যবিত্ত হিন্দুর রীতিনীতি, সমাজ-সংস্কার কখনো চলেনি। ওখানে বিয়ের বয়স, বহু বিবাহ, একজনকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে ঘর করা সমানে চলে আসছে। সেটা এই স্থবির মোরারজি, বিনোবা ভাবের জগৎএ একটা বৈপ্লবিক আশার কথা। অথচ বামনাই বা বেনিয়া হিন্দুরা ভাবে যে তাদের মতাদর্শই হচ্ছে সারা দেশের মতাদর্শ। গান্ধীজী এ কথা ভেবে অনেক ভুল করেছিলেন, দেশ ভাগ হয়ে গেল। তিনি শেষ বয়সে স্বধর্মীর হাতে প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন। কিন্তু তাঁর নাম ভাঙিয়ে যারা চালাচ্ছেন তাঁরা দিব্যি আছেন।

বিরাশি বছর বয়সে মোরারজী সুরাপান সম্বন্ধে এত উত্তেজিত কেন? সুরাপান নিরোধে তাঁর উৎকট আগ্রহ জন্মনিরোধে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের আগ্রহের মতো অনেকটা। অন্য সব সমস্যার সমাধান করতে না পারলে মতিভ্রম হয়। সুরাপান কি অভারতীয়? কলকাতার একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে সম্প্রতি একটি সুপণ্ডিত তথ্যবহুল প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, সুরাপান ভারতীয় বা অভারতীয় কোনোটাই নয়। বামুন ও বেনিয়ারা (প্রকাশ্যে) এর বিরুদ্ধে, শাসক ও শোষিত শ্রেণী কিন্তু সুরাপান করে গিয়েছেন। শেষের দুটি শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দি সিনেমা সম্বন্ধে তাদের আচরণগত ঐক্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যাঁরা নিজেদের মার্কসবাদী বলেন, তাঁরা পর্যন্ত মোরারজীর ব্যাপারে নীরব।

দেশের অসহনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার সমাধানে অপারগ হলে নেতারা

হুজুগের দিকে মানুষদের চালান। হিলারি, পেলে, শীল্ড ফাইনাল—এসব নিয়ে উৎকট আগ্রহের অন্ত নেই। পেলের হোটেল থেকে ইডেন গার্ডেনস এর রাস্তা মেরামতের জন্য মন্ত্রীরা ছোটাছুটি করেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। স্বনামধন্য কোন ব্যক্তি মরে গিয়ে দৈনিক পত্রিকায় যতখানি জায়গা দখল করেন জীবদ্দশায় কখনো সেটা তিনি ভাবতে পারেননি। দিন থেকে অন্য দিন, এক হুজুগ থেকে অন্য হুজুগে আমাদের যাত্রা। এরি মধ্যে ডালের দাম এক হপ্তায় এক টাকা বেড়েছে? জানি। ফুটবলের টিকিট কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে? জানি, কিন্তু শোধন করার যন্ত্র যথেষ্ট এখানে নেই, বিহার থেকে আনার কথা ভাবছি। দু-একজন বড়ো চাকুরের চাকরি খাওয়া হয়েছে অবশ্য। এদিকে যেসব পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগ আছে তারা বহাল তবিয়তে চরে বেড়াচ্ছে। বন্দীমুক্তি? ডাকাত অনন্ত সিং-এর দল বাদে সবাই ছাড়া পাবে, আদালতে মামলা উঠলে। কিন্তু জামিনে খালাস এক বন্ধু দিল্লী থেকে বর্ধমান কোর্টে এসে শুনলেন মামলা প্রত্যাহারের কোন আদেশ আদালতে আসেনি। দু মাস পরে আবার আসতে হবে, এ-বিষয়ে চেঁচামেচি করলে শত্রুপক্ষের মধ্যে পড়বেন।

পেলে কেন সেদিন জমকালো খেলা দেখাননি? শুনেছি যে খেলার আগের দিন নামকরা এক নেতা তাঁকে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গের রণকৌশল হ'ল কিছু না করা। কিছু না করলে আখেরে মেওয়া ফলে, অনেক ভোট পাওয়া যায়। পেলে তাই নড়াচড়া বিশেষ করেননি মোটে। তাঁর একটা পাস-এ একটা গোল হ'ল, অবধারিত পেনাল্‌টিতে আর একটা। জনপ্রিয়তা তাঁর কমে যায় তার কারণ তিনি কয়েকটা তৎপর পাস করেছিলেন।

সম্প্রতি পুরনো কবিতার কিছু কিছু পংক্তি মনে পড়ে বলে দুশ্চিন্তায় আছি। এ-বয়সে কবিতার ব্যামো আবার ধরবে না তো? একটা পংক্তি—সুধীন দত্তের—'অতিকায় কৃকলাস অস্থিসার রুদ্র পরিপাকে।' অতিকায় ও অস্থিসার কথা দুটো আমাদের দেশ সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু রুদ্র পরিপাক? কীসের পরিপাক—হুজুগ ছাড়া? তার চেয়ে অনেক সহজবোধ্য—'ফাটা ডিম আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?' সুধীন দত্ত তখনকার দিনে নিজের শ্রেণীর প্রাচুর্যে ভুলে গিয়েছিলেন যে ফাটা ডিম দিয়ে অন্তত 'মামলেট' করা যায়, যেটা ক্ষুদ্র পরিপাকের পক্ষে মন্দ নয়। এখন ফাটা ডিমের দাম বেশ চড়া। 'পরিচয়'-এর শুরুতে শহরে তিন পয়সায় জোড়া ডিম পাওয়া যেতো, আড়াই টাকায় এক মণ চাল।

৪ নভেম্বর, ১৯৭৭

৬

১৯৭১ সাল বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন লোকের মনে থাকবে অনেকদিন। ফিলড মার্শাল ম্যানেকশ সেদিন বম্বের রোটারি ক্লাবে বলেছেন (টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, বম্বে, ১৭ নভেম্বর) যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ (ডিসেম্বর ১৯৭১) শুরু হবার মাস কয়েক আগে (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ ও দমন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাঁকে তলব করে বলে যে ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'অ্যাকশন' নিতে হবে। ম্যানেকশ বলেন, অ্যাকশনের অর্থ হ'ল যুদ্ধ। 'Go to war then', মন্ত্রিসভার মন্তব্য। ম্যানেকশ রাজী হননি, কেননা তখন যুদ্ধ লাগলে ভারতের পরাজয় নিশ্চিত, সৈন্য সমাবেশের জন্য অন্তত মাস খানেক লাগবে, তারপর বর্ষা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছু সময় ও সর্বপ্রকারের সাহায্য চান ম্যানেকশ। তখনো ইন্দিরা গান্ধী এ-দেশের সাম্রাজ্ঞী হননি, এই যা রক্ষে। ম্যানেকশর স্মৃতিশক্তি প্রখর। কিন্তু তাঁর কথার মানে এই দাঁড়ায় যে অগণন শরণার্থীর ভিড়ে রুদ্ধশ্বাস ভারতকে রক্ষা করার জন্য আমরা যুদ্ধে নামিনি।

ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে আভ্যন্তরীণ অবস্থার মোকাবিলা করা দরকার। নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা ১৯৭১-এ তুঙ্গে ওঠে। বীরভূমে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। কলকাতা ৭১। অগস্টের একটি করাল রাত্রে সরোজ দত্ত নিখোঁজ হন। শেষের সেই ভয়ংকর মুহূর্তের মুখোমুখি কীভাবে তিনি হন শুধু ত্রিকালজ্ঞ পুলিশ জানে।

সরোজবাবুর সঙ্গে শেষ দেখা কবে হয়েছিল? খুব সম্ভব তিরিশের দশকের শেষে, দিল্লী যাবার আগে? একটি বন্ধু সবিস্ময়ে মনে করিয়ে দিলেন, ১৯৬৬-র জানুয়ারিতে একটি বৌভাতের নিমন্ত্রণে সরোজ দত্তের সঙ্গে আমার গল্পগুজব হয়, খেতে বসেছিলাম পাশাপাশি। মনে না থাকাটা অহমিকার দরুণ নয়, ক্ষীণ স্মৃতিশক্তি প্রায়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অনেকদিন অদেখা প্রিয় বান্ধবীদের মুখ পর্যন্ত অস্পষ্ট ধূসর হয়ে আসছে।

একটি বাংলা পত্রিকায়* সেদিন সরোজ দত্তের কলমের তীব্র ধার আবার অনুভব করলাম। অতি আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধের সমালোচনা, ১৯৪০-এ লেখা। সরোজবাবুর সংক্ষিপ্তসার ও তাঁর ভাষা অনুযায়ী আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য হ'ল: "১. ধনতন্ত্রী সমাজে যে প্রগতি স্তব্ধ হইয়াছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রগতি অব্যাহত চলিবে, অতএব

---

* দ্র. 'সংযোজন' অংশ। প্রকাশক

প্রবন্ধকার আশাবাদী ও প্রগতিতে বিশ্বাসী, ২. ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ decadent অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। নজীর ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টের কাব্য; ৩. ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসার শূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি; ৪. কিষাণমজদুর লাল ঝাণ্ডা ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া নাকি তাহাদের উত্তেজক সাহিত্য রচনার নির্দেশ অথবা ফরমাইস দেওয়া হইতেছে এবং ঐ সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের না থাকায় রোমাণ্টিক হইবার ভয়ে ঐ নির্দেশ বা ফরমাইস তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না।"

সংক্ষিপ্তসার দেবার পর সরোজ দত্ত জোরালো ভাষায় বলেন যে :

> ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি নয়, living, passionate ও sensitive মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে। আন্তরিকতার খড়্গাঘাতে নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক-বিলাস সেখানে মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একদা যখন রোঁমা রোলাঁ গান্ধী রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী ছিলেন তখনও তাঁহার সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য ছিল, অহিংস টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের প্রশংসোচ্ছ্বাস তো বহুবিদিত।...মন যেখানে জাগ্রত ও জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রবহমান পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ সেখানে আন্তরিকতায় উদ্বেল এবং ক্রমবিবর্তনের বেদনাময় পথে সত্য উপলব্ধির অভিমুখে গতিমান। এই সত্য উপলব্ধির পথে পরিবর্তনশীল ভাবাদর্শের প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক, বেদনায়, উৎকণ্ঠায় আর্তক্রন্দনে নিবিড়। 'Decadence'-এর প্রতিটি বন্ধনরজ্জু ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাহার আর্ট হইতে যন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে। শেষরজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। এই অশান্তি, উদ্বেগ ও আর্তনাদ মহাভুজঙ্গের নির্মোক পরিহারের এই প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক...ইহা নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কজীবীর বিলাপ-বিলাস নহে।

সরোজ দত্তের বক্তব্য বলিষ্ঠ। উপসংহারে তিনি কবি-প্রবন্ধকারকে নির্বোধ, প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলেছেন।

বহুদিন পরে লেখাটি পড়ে মনে হল সরোজ দত্ত ঠিক লিখেছিলেন। তিরিশের দশকে অনেক লেখক বোধহয় বিপ্লবীর অভিনয় করে বাহবার চেষ্টায় থাকতেন, তাঁদের আসল চেহারা সরোজ দত্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

কিন্তু পরের দু-তিনটি পৃষ্ঠায় আক্রান্ত প্রবন্ধকারের জবাব পড়ে মনে হ'ল ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রবন্ধকার বলেছেন যে নিজেকে তিনি কখনো

'বিপ্লবী' বলেননি। তার কবিতায় যে টাইপের জীবন এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে, সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক। অবক্ষয় এদের আকর্ষণ করে তার কারণ বোধ হয় এই যে উদীয়মান কোন শ্রেণীর প্রাণশক্তি এদের নেই, বরং পাতিবুর্জোয়ার গভীরে এদের শিকড় ইত্যাদি। অবক্ষয় বিষয়ে সচেতনতা এক ধরনের শক্তি, কিন্তু এমন একটা সময় আসছে যখন সেই শক্তিটুকু দিয়ে চলবে না, তখন মন স্থির করতে হবে। যে কবি তাঁর ব্যক্তিসত্তা অটুট রাখতে পেরেছেন গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলে তাঁর উপকার নিশ্চয় হবে। আর···He who is bent on living in a little cell, all will be dying with a little patience." প্রবন্ধকারের জবাবটা বালখিল্যসুলভ নয়, যদিও কোথাও একটা ফাঁকি রয়ে গিয়েছে। সরোজবাবুর প্রত্যুত্তরটা কিন্তু অনেকটা উকিলসুলভ। যেমন, কবিপ্রবন্ধকার যে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সেই পত্রিকায় তাঁকে এবং অন্যদের মাঝে মাঝে বিপ্লবী বলা হয়েছে; প্রবন্ধকারের কবিতায় বিপ্লবী সুলভ উক্তি আছে অতএব বিপ্লবী শব্দটি আরোপ করা অযৌক্তিক হয়নি ইত্যাদি; সে সময়কার মনোভাব বিষয়ে সরোজ দত্ত যা লিখেছিলেন তা উপভোগ্য—'এখনও তাঁহারা আলগোছে গণস্পর্শ বাঁচাইয়া, 'dozen or so' হাত ধরাধরি করিয়া কিছুকাল আত্মপরিক্রমায় অতিবাহিত করিবেন; তারপর গণ আন্দোলন আরম্ভ হইলে···তাহারা রাতারাতি স্বগতোক্তি পরিত্যাগ করিয়া গণ-কবি হইয়া বসিবেন।' তবু নির্বোধ প্রবঞ্চক কথাগুলি অস্বস্তিকর ঠেকল, কেননা প্রবন্ধটি আমার লেখা ১৯৩৮ সালে; এম. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি পেয়ে তখন জীবনটা মন্দ কাটছিল না।

তারপর অনেক কাল অতিবাহিত হয়েছে। সাহিত্য বিষয়ে বিতর্ক নানা রূপ নিয়েছে, চল্লিশ দশকের শেষার্শেষি রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব উঠেছে, তারপর গান্ধী রবীন্দ্রনাথ আবার কম্যুনিস্টদের অনুরাগ আকর্ষণ করেছেন, নকশালপন্থীরা আবার তাঁদের বর্জন করেছেন। তিরিশ দশকের বেশ কিছু লেখক এখন বিগত। গণ-আন্দোলনে যোগ দিলেও অনেকে লেখক হিসেবে মহান হতে পারেন নি; পার্টির ভাবাদর্শ অনেক সময় বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য গণ-আন্দোলন নয়, 'লাইন' বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখক পার্টির প্রভাবে কোনো মহারচনা করতে পেরেছিলেন? তাঁর বিচ্ছিন্ন ডায়েরিতে একটা অবিশ্বাসের ভাব তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিরিশের দশকে ও পরে কবিদের মধ্যে সহজ ও বলিষ্ঠ ভাষায় লেখেন সুভাষ, সুকান্ত, পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু মাও থেকে মেয়াওতে সুভাষের উত্তরণ যুগান্তকারী কিছু একটা হয়নি এবং সুকান্ত বেঁচে থাকলে মস্কো-মুখী সি.পি.আই-এর জালে আটকে পড়ার যথেষ্ট ভয় ছিল। সি.পি.এম-এ অবশ্য সাহিত্যিক ও বিলেতফেরতের সংখ্যা অনেক কম, সাংসারিক বিবিধ ক্ষেত্রে

সি.পি.আই-এর মতো সি.পি.এম তাই গুছিয়ে নিতে বড়ো একটা পারেনি।

তিরিশের দশকের শেষে নবীন কবিদের ভাষা স্বচ্ছ হওয়াতে আশার কারণ ছিল। তার আগে কবিদের অনেকেই ইংরেজির ছাত্র ও পরে অধ্যাপক হওয়াতে পেশার দোষে বড়ো বেশি পাউণ্ড-ইয়েট্স্-এলিয়ট-অডেন চর্চা করতেন, কবিতার ভাষা ও ভাবভঙ্গি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হতো না। কিন্তু কিছুদিন কিছু কবির সহজ ভাষার পর ব্যাপারটা আবার গোলমেলে হয়ে গেল, খুব সম্ভব অনেকটা জীবনানন্দ দাশের ক্রমশ প্রসারিত প্রভাবের ফলে। জীবনানন্দের অসাধারণ শক্তি যাঁদের নেই তাঁদের সান্ধ্য ভাষা হজম করা কঠিন। তাঁরা গণআন্দোলনে গেলে দেশের দশের সুবিধে হবে না।

৩০ নভেম্বর, ১৯৭৭

৭

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় লোড-শেডিং। মোমবাতির আলোয় বিদেশী ভদ্রলোকটি বলছিলেন কী করে তিনি ভারত সরকারের একটি ফেলোশিপ পেয়ে এদেশে আসেন ১৯৭৫-এর শেষাশেষি। ইন্দিরা সরকারের ধারণা ছিল, বিলেতে লেবার পার্টির যে কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তাতে তিনি, জেনি লি ও মাইকেল ফুটের মতো জরুরি অবস্থার তাৎপর্য বুঝবেন। ভারতে থাকার সময় অবশ্য তাঁকে নজরে রাখা হয়েছিল, সকলের সঙ্গে অবাধ দেখাসাক্ষাৎ, আলাপআলোচনার সুযোগ সর্বদা মিলত না, কেননা সঙ্গে থাকতো 'সাহায্য' করার জন্য কেউ-না-কেউ। নিত্যসঙ্গীদের ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সতর্ক হন দু-একটি ঘটনার পর। বিশেষ একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্যমান্যদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন 'কর্মচারী'। ট্র্যাফিক পুলিশ হাত দেখাতে গোটা চারেক গাড়ি থামে। তারপর তাঁদের গাড়ি যখন এগোয় তখন 'কর্মচারী' ও ড্রাইভারকে বড় একটা সেলাম জানায় পুলিশ। এরপর একদিন কর্মচারীটিকে তিনি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হাত পা কেটে ভিখিরি যারা বানায় তাদের বিষয়ে জানতে চাইলে কর্মচারীটি এতো তথ্য বিতরণ করে যে তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি এতো খবর পেলেন কী করে?' কর্মচারীপ্রবর জানালেন পুলিশীসূত্রে পেয়েছেন। গোয়েন্দারা মাঝে মাঝে অসাবধান হয়ে পড়ে, হাজার হোক দ্বিপদ জন্তু তো।

ভদ্রলোক এ দেশের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। দিল্লীর অবস্থা তখন থমথমে। বেশি রাত্রে এক ভদ্রলোকের দরজায় অনেকবার টোকা দেবার পর একজন বেরিয়ে এসে বলল, "ও, আপনি!" গৃহকর্তা তখন ছোট ব্যাগে টুকিটাকি জিনিস ভরছিলেন—তাঁর ধারণা পুলিশ এসেছে। অনেকের সঙ্গে

দেখা হয়নি—'out of station'। দেখা যাঁদের সঙ্গে হয়েছে তাঁদের অনেকে জরুরি অবস্থার সমর্থক—এঁদের বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতি আছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইত্যাদি। উচ্চপদস্থ একজন সরকারী অফিসার বলেন – দেশের দু-কোটি মানুষ মারা গেলে কিছু এসে যায় না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন কথাবার্তার সময় চার পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন। একজন বললেন যে কলকাতায় কিন্তু আতঙ্ক ছিল না। এটা ঠিক যে অনেকে গ্রেফতার হন, কিন্তু বঙ্গদেশে, পথিকবর, গ্রেফতার হওয়া, বাড়িতে, মাঠে-ঘাটে জেলে খুন হওয়া তো বেশ কিছু বছর ধরে চলে আসছে। সুতরাং কয়েক শ ব্যক্তি জরুরী অবস্থার সময় গ্রেফতার হলে বাবুরা বিচলিত হন নি—আটক ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মীরা ছাড়া। জরুরি অবস্থায় আমরা কিছুটা সতর্কভাবে অবশ্য থেকেছি। কিন্তু উত্তর ভারতের সেই ব্যাপক ত্রাস ছিল আলাদা ব্যাপার। বাঙালি মধ্যবিত্তদের চালচলন থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ১৯৬৯ সাল থেকে অল্পবয়সীদের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। এক দিকে অসমসাহসী অনেকের জীবন-মরণ সংগ্রাম, অন্যদিকে এক শ্রেণীর 'যুব' ছাত্রদের হঠাৎ আবির্ভাব ও তান্ডবলীলা। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই শ্রেণীর যুবশক্তির পিছনে ছিলেন ইন্দিরা ও সঞ্জয় গান্ধী। পরে গৌহাটিতে এই যুব শক্তিকেই কংগ্রেসের উপর স্থান দেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। যুব ও ছাত্রদের অসামান্য প্রাণশক্তির ফলে আমরা দুর্গা, কালী, সরস্বতী, মনসা, দোল ইত্যাদি নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সিনেমা থিয়েটার যাত্রা উচ্ছল হয়ে ওঠে। অনেকের মন থেকে ভয় মুছে যায়। পুজা ও অন্যান্য উৎসবে আগ্রহ অবশ্য এখনো কমেনি, এ বিষয়ে, জনজোয়ারকে বাধা দিতে বর্তমান সরকারও চায় না। যা হোক জরুরি অবস্থার সময় বাঙালি বাবুদের ভূমিকা উজ্জ্বল নয়।

ইন্দিরা সরকারের বড়ো একটা হাতিয়ার ছিল রুশমার্কা সেন্সরশিপ। গুজব অবশ্য রটে। বড়ো কোনো একটা ঘটনা ধামা চাপা পড়েনি। আমাদের দেশে কীভাবে সেন্সরশিপ সত্ত্বেও খবর রটতো সেটা জানা দরকার। যেমন ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্সি না আলিপুর জেল থেকে ঠিক ক'জন পালিয়েছিলেন সেটা অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। উল্টোডিঙিতে পুলিশের গুলি চালানো চাপা পড়েনি। এ ধরনের ঘটনা ব্যাপক ও বর্বরভাবে উত্তর ভারতে হওয়াতে 'গুজব' রটেছিল আরও ব্যাপক-ভাবে। এখন তো মনে হয়, 'যাহা রটে তাহা কিছু বটে' শুধু নয়, এমন অনেক ব্যাপার ঘটে যা বোধ করি এখনও রটেনি।

আলো জ্বলে ওঠাতে বুদ্ধিজীবীদের কথা বিশেষভাবে উঠল, বোধহয় বুদ্ধি জিনিসটা আলোকের ব্যাপার বলে,—কথায় আছে 'আলোকপ্রাপ্ত' জীব। একজন বললেন যে Voice of Dissent নিয়ে বেশ কিছু লেখা হয়েছে, এখন আয়োজন চলছে Voice of Consent নামে একটা সংকলন বের

করার, যাতে হঠাৎ ভোল-বদলানো পন্ডিত, সাহিত্যিক, শিল্পী ইত্যাদির আসল চেহারা লোক কালক্রমে ভুলে না যায়। অর্থাৎ তাঁদের কথা যাঁরা জরুরি অবস্থার প্রবক্তা ছিলেন।

শা কমিশন আমলাদের তিনটি পর্যায়ে ফেলেছেন : যারা বাধ্য হয়েছে, যারা বিশেষ কিছু না বুঝে উৎসাহিত হয়, এবং যারা সবকিছু জেনেশুনে নিজেদের উন্নতির জন্য স্বেচ্ছায় বাড়াবাড়ি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে। শুনানির সময় জরুরি অবস্থার কর্মকর্তারা প্রায় সবাই ইন্দিরা ও সঞ্জয় গান্ধীর কথা তুলে বলছে, কী করবো স্যার, কথা না শুনলে চাকরি খেতো, মিসায় ধরতো, মোগল আমলে যেমন গর্দান যেতো। আইন মান্য করার, আদেশ অমান্য করার কোনো উপায় ছিল না। মহাভারতে সঞ্জয় ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের দুঃসংবাদ দিতেন ধৃতরাষ্ট্রকে, নয়া ভারতে সঞ্জয় গান্ধী ছিলেন অধর্মের কারণ, মহিলা-ধৃতরাষ্ট্র বিরূপ সংবাদে কর্ণপাত করতেন না, জয়লাভে কোনো সংশয় তাঁর ছিল না। ব্যাপারটা অনেকটা সেরকম দাঁড়ায়। আমাদের মধ্যবিত্ত চরিত্রে ডান্ডার প্রভাব অস্বীকার করে লাভ নেই। বিশেষ করে এমন একটা অবস্থায় যেখানে প্রতিকারের কোনো উপায় নেই—কোর্টে পর্যন্ত যাওয়া যায় না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের উপর—কয়েকটি অসামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া—ডান্ডা কি খুব চলেছিল ? তখন যাঁরা চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বোঝা যায়, কেননা বক্তৃতা বা লেখা-টেখার সুযোগ ছিল না। কিন্তু যাঁরা জরুরি অবস্থার গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, সহকর্মীদের বিপদে ফেলেছিলেন ? তাঁদের মুখোশ খুলে দিলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁরা পার পেয়ে যাবেন। কেননা, লোকে জানে এ দেশে এঁদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। এঁদের তারা অবজ্ঞা করে। অবশ্য শাসকগোষ্ঠি বদলালে এঁরা আবার পাত্তা পাবেন, 'সৎ' বুদ্ধিজীবীরা আবার চুপ করে যাবেন।

তাছাড়া বাড়াবাড়ি বর্বরতা ১৯৭৫-র ২৫ জুনের পর শুরু হয়নি। এদেশের গত তিরিশ বছরের ইতিহাসে বর্বরতা যাঁরা চালিয়েছেন তাদের বিষয়ে অনেক 'সৎ' বুদ্ধিজীবী এখনো মোহ বিস্তার করেন। সেই যুগের ইতিহাস লিখতে গেলে তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ, নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম, ভোজপুর ইত্যাদি স্থানের বিবরণ খুঁটিয়ে দেখতে হবে, বুঝতে হবে যে ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের কাহিনী ও জরুরি অবস্থার কার্যকলাপ অঙ্গাঙ্গি। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি।

২৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৭

পরিশিষ্ট

উড়ো খৈ

১.

ইলশে-গুড়ি বৃষ্টি, চিলেরা চুপচাপ,
রাস্তায় কমে পিচের উত্তাপ।
মনের ঝামেলা কেন বাড়ে
ঝাপসা-তামাটে অন্ধকারে ?
অনেকে বলছে চল্লিশের পরে
বাস করা ভালো মথুরা-নগরে।

২.

মেয়েটি বললো নতুন বন্ধুকে
'যা খুশি রটাক নিন্দুকে
ক্লান্ত মাথা রাখুন আমার উরুতে।'
কিসের ইশারা ঝলকায় তার ভুরুতে ?
আকাশে বাদশা চাঁদ
খোলে তারার হারেম,
দূরে জাগে নদীর বাঁধ,
পিকনিকের পরে প্রেম
শুধুই কি শরীরের ভেলকি ?
ভোর হতে এক প্রহর বাকি,
হলুদ ঘাস লাগে শাড়ির পাড়ে
গাঁয়ের কুকুর ডালে বারে বারে।

৩.

কারো কারো চোখে দেখি
আলোর কুহেলিকা,
ভুরুর রেখা
নদীর ওপারে বলাকা,
দেহ মদির কবিতা
খোঁয়াড়ির ভোরে লেখা।

৪.

মৃত্যুর পরে সব শেষ।
কিছু আহা-উহু, বেশি
দুর্নাম,
চেলারা নতুন গুরুকে
করে প্রণাম,
বিধবার ঠোঁটে থাকে পানের রেশ।

স্মৃতিতে

ওরা কাজ করে,
দুমুঠো তোলে ঘরে,
তবে দুবেলা মুখে নয়।
রোজ ভাত ভালো নয়, ভালো নয়
পাঁচসালায় বৃথা অপচয়।

কেটেছে বিশ বছর,
রাত কত হল
এ প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।
অনেকের দেহ মেদোচ্ছল,
অনেকের মনে পড়েছে কড়া।
ভারা ভারা ধান কাটা হয়নি সারা।

সংযোজন

পৃ. ২২ 'ক্রন্দসী' এবং 'উত্তর ফাল্গুনী' সুধীন্দ্রনাথের দু'টি কবিতা-সংকলনের সমালোচনা করেছিলেন সমর সেন, যথাক্রমে 'পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকায়। প্রাসঙ্গিক বোধে সমালোচনা দু'টির অংশ উদ্ধৃত হল। 'পরিচয়' ও 'কবিতা'-র পাঠ অনুসরণে পুনরুদ্রিত। অবশ্য বানান সংশোধিত।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা প্রসঙ্গে

১. ক্রন্দসী

অষ্টাদশশতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশশতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি ঐতিহাসিক, সুতরাং নৈতিক, ভিত্তি ছিল। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী ভূতকে ঘাড় থেকে নামানোই হলো আজকের দিনের প্রধান সমস্যা। বর্তমান পৃথিবীতে তাই সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈতিক ভিত্তি আর নেই। সুধীন্দ্রনাথ মৃতপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কবি; কিন্তু আজকের বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খলার কথা এবং কারণ তাঁর অজ্ঞাত নয়। তবু জ্ঞানের চেয়ে মোহ বড়, এবং আভিজাত্যটা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার রক্তে মেশানো। সেজন্য বারেবারে তাঁর মন পুরাতন স্বাতন্ত্র্যের অসম্ভব আদর্শের দিকে ছোটে, এবং ব্যর্থতায় ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে। এরি ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা। দুটি পৃথিবীর মধ্যে তিনি দণ্ডায়মান, তার একটি মৃত, আর একটি জন্মাবার ক্ষমতাহীন। মৃত পৃথিবীর বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নবজন্মের সম্ভাবনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মানসিক যন্ত্রণা শেষ পর্যন্ত ফাঁপা বলে ঠেকলে অবিচার হবে না। তিনি এসে পড়েছেন বিনষ্টপ্রায় বণিক-বিশ্বের প্রান্তে, উত্তরকালে তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, পূর্বকালের স্মৃতি তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে। প্রাক্তন, জাতিস্মর ইত্যাদি কথা এবং পৌরাণিক কল্পনার প্রাদুর্ভাব তাঁর কাব্যে সেজন্যই হয়ত বেশি। রানীকে মৃত জানলেও বাঁদীতে তাঁর কোন আসক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমি আস্থাহীন, তবু ফীড্রাসের উদ্ধৃতিকে শ্রদ্ধা করতে পারি, কারণ এটা তো সহজে কল্পনা করা যেতে পারে যে 'অন্তরঙ্গ-সৌন্দর্যে'র আদর্শ আর তার বাস্তব সম্ভাবনার মাঝখানে আছে অনাগত সমাজ-বিপ্লবের ব্যবধান। ততদিন অন্তরঙ্গ-সৌন্দর্য আনাটা নেহাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার; আধুনিক আভিজাত্যের এই ধ্রুপদী অভীপ্সার প্রতি প্রবল অনুরাগ আনাটা ততদিন শক্ত, কারণ বহুদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই আদর্শ আত্মকেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার খোলস হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক্রন্দসী' পড়ার সময় উপনিষদের বৃক্ষের পরিবর্তে চোখের সামনে ভাসে শূন্যমুখী শিকড়, উৎপাটিত গাছের ছবি। "What are the roots that clutch, what

branches grow"—এই প্রশ্নের উত্তর 'ক্রন্দসী'তে মেলে না।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় আকর্ষণের অনেক জিনিস আছে আঙ্গিকের এবং মননের দিক দিয়ে। তার কবিতার মেরুদণ্ড অত্যন্ত দৃঢ়, যেটা অধিকাংশ বাঙালি কবিতে একান্ত বিরল। আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছন্দের বলিষ্ঠ এবং বেগবান ঝংকার 'ক্রন্দসী'র প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর লেখায় কয়েকটি বর্জনীয় উপাদান বর্তমান, যেমন স্থানে স্থানে পুনরুক্তির এবং অতি-কঠিন শব্দের প্রাচুর্য। এখানে দুটি জিনিস উল্লেখ করা উচিত। প্রথমত ছন্দের গতিবেগে অধিকাংশ কঠিন শব্দই নিজেদের বোধগম্য করতে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সঠিক শব্দ ব্যবহারের সতর্কতা 'ক্রন্দসী'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুধীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটি পংক্তিও বিস্ময়কর এবং বেগবান সংহতি আছে। দু-একটি পংক্তিতে তিনি যা প্রকাশ করেছেন তা অন্যান্য কবিদের হয়ত একটি সম্পূর্ণ কবিতার খোরাক জোটাতে পারে। তবু তাঁর দীর্ঘরচনার কয়েকটিতে পংক্তিগত সংহতি সত্ত্বেও অসংগতি দোষ বর্তমান।

'ক্রন্দসী'র পটভূমিকা প্রধানত ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্য, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানের রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাকে বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত করেছে। এতদিন বাঙালি সাহিত্যিকেরা রামায়ণ ও মহাভারতের মূল উপাখ্যান এবং বহুবিধ ঘটনাবলীকে চলতি ভাষায় 'গল্প' হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। বর্তমান সমাজ এবং ইতিহাসের আলোয় যাঁরা উপরোক্ত ঘটনাবলীকে নবরূপ দিতে পেরেছেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তথাকথিত প্রেমের কবিতা 'ক্রন্দসী'তে একটিও নেই, এ-ব্যাপারটি উল্লেখযোগ্য। 'ক্রন্দসী'র মূলভাবের কথা প্রথমেই লিখেছি। ধ্বংসপ্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশ্ব সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যর্থতাবোধ এনেছে, এবং এটিই 'ক্রন্দসী'র বিশিষ্ট বৈচিত্র্য।···

'ক্রন্দসী'র শেষ কবিতা 'প্রার্থনা'র মতো ব্যঙ্গরচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। আশা করি সুধীন্দ্রনাথের ব্যর্থতাবোধ ভবিষ্যতে বেদনাবোধ দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। মহাভারতে-কথিত জরৎকারু পূর্বপুরুষদের দুর্দশা দেখে তাদের দুঃখমোচন করেছিলেন; তখন সেটার চেষ্টা না-করে মূষিকরূপী কাল দ্বারা ছিন্নপ্রায় শীর্ণসূত্রের জন্য বিলাপ করতে শুরু করলে যে-ছবিটা আমাদের মনে আসে তার সঙ্গে 'ক্রন্দসী'র অধিকাংশ কবিতা তুলনীয়।

পরিচয়: ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, পৃ. ৪৯৮-৫০০

২. উত্তর ফাল্গুনী

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বোধ হয় মহৎ কবিতা রচনার অন্তরায়। এ-মহত্ত্বের অনেকগুলি বিশেষত্বের মধ্যে একটির অভাব সহজেই আজকালকার লেখায় চোখে পড়ে। আগেকার কবিদের সঙ্গে অধিকাংশের একটি অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। সে যোগসূত্র নানাকারণে এখন ছিন্ন। সমাজে দুর্দিন আগত, এবং

দুর্দিনে লেখকেরা গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয়প্রয়াসী হন। সেটা হয়ত স্বাভাবিক, এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের কাপুরুষ কিংবা পাতিবুর্জোয়া বলে সম্বোধন করলেই শেষকথা বলা হয় না। বিক্ষোভের যুগে narrow strictness-এর চর্চা অনেকেই করছেন, এবং চর্চাটা কিছু পরিমাণে ফলপ্রসূ। তবে এ চর্চার জের টানতে থাকলে অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ নির্ঘাৎ প্রকাশ পায়! তখন লক্ষণগুলিকে স্থান, কাল, পাত্রের রূপনির্দেশক হিসেবে নেওয়াই ভালো, সাহিত্যের মূল্যবিচারের শেষ সামাজিক মাপকাঠি হয়ত তারা, কিন্তু সে মাপকাঠি প্রয়োগ করার সময় নির্ণয় করা কঠিন, এবং প্রয়োগকর্তাদের যোগ্যতাও বিচার্য। ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে decadent সাহিত্য অনেকসময় ভবিষ্যৎ রচনার পথ নির্দেশক হয়েছে। এ ঘটনার উলেখ করে আমরা বলতে পারি যে, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অবক্ষয়ের অনেক লক্ষণ বর্তমান, কিন্তু তাঁর কবিপ্রতিভা অনস্বীকার্য।

সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনদর্শন আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ইতিহাস কম্বুরেখায় চলে না, চক্রবৎ ঘোরে। সে-জন্য প্রগতির কল্পনা তাঁর কাছে অর্বাচীন ঠেকে। তাঁর মতে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। অতীতের ঐতিহ্যে তাঁর আসক্তি বেশি। এ বিশ্বাস ও মনোবৃত্তি সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকে কাব্য হিসেবে সার্থক করেছে, কিন্তু তাঁর অধুনাতন রচনায় কয়েকটি বিপজ্জনক লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর বিশ্বাসের দার্শনিক মূল্য হয়ত থাকতে পারে, সেটার বিচার বর্তমান সমালোচকের আয়ত্তের বাইরে, কিন্তু এটা ঠিক যে বিশ্বাসকে কাব্যের পর্যায়ে আনতে গেলে দার্শনিকতা ছাড়া অন্য আরো কিছুর প্রয়োজন আছে, কাব্যে বিশ্বাসের নাটকীয় প্রকাশ আবশ্যক, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিত্তিতে নাটকীয় রূপ ধারণ করলে ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের কাব্যশক্তি প্রমাণিত হয়। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সম্প্রতি obsession-এ পরিণত, এবং বিশ্বাস যখন আবেগে পরিণত হয় তখন তার কাব্যশক্তি কমে আসে, শেষ পর্যন্ত লেখক একটি বিষণ্ণ গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন, যেখানে মহৎ সত্যের সাক্ষাৎ মেলে না, যেখানে দেখি শুধু নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনাকে পরিপাক করতে ব্যস্ত। মুদ্রাদোষ পুনরাবৃত্তির বিষচক্রে লেখা তখন ভারাক্রান্ত হয়। অবশ্য এ কথা আগেই বলেছি সুধীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা তাঁর দর্শনের ভিত্তিতে শক্তিবান, কিন্তু দর্শন সেখানে পরোক্ষভাবে আছে।…

কবিতা: ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা পৌষ ১৩৪৮, পৃ. ৩১-৩৪

পৃ. ২৩ 'বাবু বৃত্তান্ত'-র প্রথম সংস্করণ থেকে দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত প্রথম পাদটীকাটি বর্জন করা হল বর্তমান সংস্করণে। কারণ টীকাটি সমর সেন লেখেন নি—তাঁর অনুরোধে বর্তমান সংকলক লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' (জুন ১৯৩৮) সম্পর্কে আগ্রহী

পাঠক বিশদ তথ্য পাবেন শঙ্খ ঘোষের 'উর্বশীর হাসি' গ্রন্থের "রোমাঞ্চকর এক সংকলন" প্রবন্ধে।

দে'জ ২য় সংস্করণে ২নং পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা সমর সেনের চিঠিটি মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগে লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের পক্ষে সংকলকের আলাপ-আলোচনায় চিঠিটি উদ্ধৃত করবার প্রস্তাব তিনি বিবেচনা করবেন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ অভিপ্রায় জানা আর সম্ভব হয়নি। কিন্তু অসতর্কতাহেতু চিঠিটি মূল-এর পাদটীকায় মুদ্রিত হয়। যা গর্হিত অন্যায়। সেকারণে বর্তমান সংস্করণে চিঠিটি পাদটীকার পরিবর্তে 'সংযোজন' অংশে মুদ্রিত করা হল।

সাগর মান্না রোড, বেহালা
২২.৪.৩৮

শ্রীচরণেষু

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে এসে অশান্তিতে সময় কাটছে! ওখানকার কাঁকড়ের রক্তলাল সৌন্দর্য্য আপনার সৌম্য শান্তমূর্ত্তি এবং ললিত মধুর ব্যঙ্গ বরাবর মনে থাকবে।

অদূর ভবিষ্যতে আশা করি আপনার সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য আবার হবে। আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে এবারে আপনাকে অনেক বিরক্ত করে এসেছি জানি, তবু ভবিষ্যতে আবার বিরক্ত করার সৌভাগ্য এবং আনন্দ হতে নিশ্চয় বঞ্চিত হ'ব না। জানেন ত আমরা পদ্মাপারের লোক, একবার প্রশ্রয় পেলে আর ছাড়তে চাই না। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

ইতি
প্রণত
সমর

পৃ. ২৪ 'বাবু বৃত্তান্ত'র মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রথম বন্ধনীতে নভেম্বর, ১৯৫৪ এবং 'স্পেনর সাম্যবাদ কাটিয়ে···ব্যবহার করেছিলাম।' অংশটি নেই। প্রথম সংস্করণে লেখক প্রুফে (নভেম্বর ১৯৫৪) যোগ করেন এবং দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য প্রেস কপিতে পরবর্তী অংশ যোগ করেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯৭৭-এ প্রকাশিত শ্রীঅরুণ সেনের 'সুধীন্দ্রনাথ/বিষ্ণু দে : এই মৈত্রী! এই মনান্তর' 'বাবু বৃত্তান্ত'র প্রুফ দেখার সময় সমর সেন পড়েন। শ্রীঅরুণ সেন-এর মন্তব্য স্পেণ্ডর সম্ভবত ১৯৬০-এ কলকাতায় এসেছিলেন—পড়ে তিনি পুরনো চিঠিপত্র থেকে তাঁকে লেখা একটি চিঠি দেখিয়ে বলেন (যতদূর মনে আছে চিঠিটি লিখেছিলেন বিষ্ণু দে এবং জানতে চেয়েছিলেন 'কী হয়েছিল সেদিন') স্পেণ্ডর ১৯৫৪ সালেই কলকাতায় আসেন—তাই

তারিখটি বসিয়েছেন। দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য পরবর্তী অংশ লিখেছিলেন।

পৃ. ৫২ শারদীয় বেতার জগৎ ১৯৬৩ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং শ্রীসব্যসাচী দেব ও শ্রীসোমেশ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'অনুষ্টুপ' থেকে প্রকাশিত 'সংকলিত সমর সেন'-এ পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধটি শ্রীসুলেখা সেনের অনুমতিক্রমে মস্কো-অধ্যায়-এর পরিপূরক বিবেচনায় সংযোজিত হল।

৩. মস্কোর জীবন

ভোর কত হল? শীতকালে মস্কোয় ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হয়। লণ্ডনের মতো কুয়াশার দুর্ভেদ্য আবরণ কদাচিৎ চোখে পড়ে বটে সোবিয়েত রাজধানীতে, কিন্তু সকাল আটটা-নটা পর্যন্ত আলো অত্যন্ত ক্ষীণ। অথচ কাজে পৌঁছতে হবে ঘড়ি ধরে নটায়। বেশিরভাগ সংসার একটা ফ্ল্যাটের, হয়ত একটা ঘরে—বাথরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি একটা। তাই তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নেওয়া দরকার, নইলে অন্য বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে থাকবে। খাবার কিছু খেয়ে ওভার-কোট মুড়ি দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডায় পদার্পণ। বরফ পড়ে ক্রমাগত, গাছপালা পত্রহীন, বিগত বসন্তের কঙ্কাল। জল পড়ে পাতা নড়ে—ভাবার কোনো সুযোগ নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখবেন দলবেঁধে বাচ্চা আর কিছু বড়োরা স্কুলে যাচ্ছে, পরনে ইউনিফর্ম, টকটকে গাল, হাসিখুশি সবাই। সেদিন হয়তো ক্লাশ বেশিক্ষণ করতে হবে না, দলবেঁধে লোহার টুকরো, ভাঙা জিনিস কুড়োবার পালা। ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ নয়। স্কুলের ছেলেমেয়েদের কোড়ানো কাবাড়ি মাল দিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক লোকোমোটিভ।

অফিস প্রথমে ছিল নটা থেকে ছটা, লাঞ্চের ছুটি একঘণ্টা। পরে কাজের দিন আরো ছোটো হয়েছে—একঘণ্টা কম। অফিসে যে মুখ গুঁজে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হয় তা নয়। উপরওয়ালারা না-থাকলে গল্পগুজবের সুবিধে। তবে খুব বেশি ঢিলে দিলে চলবে না—সবকিছু টার্গেটে বাঁধা, গাফিলতির কৈফিয়ৎ দিতে বেগ পেতে হয় বিস্তর।

অফিসে মিটিং থাকে প্রায়ই—কাজ নিয়ে, ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে। অবশ্য বিদেশিদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নয়। আমরা বাংলা বিভাগের (বিদেশি সাহিত্য প্রকাশালয়ের) কাজ নিয়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছি অনেকবার, ট্রেড ইউনিয়নের সভায় ডাক পড়ে নি কখনো। এ-ধরনের সভায় যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে না রুশিরা। হয়ত সভা-সমিতিতেও

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় অনুবাদকদের নিয়ে একটি সভার কথা মনে আছে, (এখানে বলা দরকার ভারতীয় অনুবাদকদের বাছাই করেন ভারত সরকার—তাঁরা কম্যুনিস্ট নন—দু-একজন ছাড়া) সভার আলোচনার বিষয় ছিল আমাদের দ্রুত অনুবাদ-শক্তির ফলে বিশৃঙ্খলা। বিদেশি ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়ের বিভিন্ন ভাষা-বিভাগের কত বই বেরোবে তার টার্গেট আছে—কিন্তু আমাদের অনুবাদের হাত এত জোরে চলতে থাকে যে বিভাগটি দমবন্ধ হবার উপক্রম। আমাদের অনুবাদের রেট এত দ্রুত হবার কারণ—কখানে কাজের মাত্রা হিসেবে পারি-শ্রমিকের ব্যবস্থা যাকে বলে Piece-rate system। ভারতীয় বিভাগের প্রধান কর্তা বক্তৃতা দিলেন—অনেকের নাম উল্লেখ করে বললেন যে তাঁরা কোয়ালিটির দিকে নজর দেন না মোটে, অনুবাদে হাস্যকর ভুল থাকে, শুধু পাতার সংখ্যা বাড়ালে চলবে না ইত্যাদি। স্বল্পবক্তা কমরেড। কিন্তু জবাব যাঁরা দিলেন তাঁদের কয়েকজন অন্তত কম স্বল্পবক্তা নন। অন্যদেশ হলে হয়ত মনোমালিন্য অনেকদিন থাকত, কিন্তু মস্কোয় ব্যতিক্রম দেখলাম। সঙ্ঘবদ্ধ আলোচনা ও সমালোচনার মূল্য আছে অনেক।

যৌথজীবনে রুশিরা অভ্যস্ত বাল্যকাল থেকে। তিন-চারবছর বয়সে কিণ্ডারগার্টেনে দিনের বেলা কাটানো, সেটা না-হয় ছেড়ে দিন। সাতবছর বয়সে স্কুলে প্রবেশ। সেখানে পাইওনীয়র হলে অনেক জিনিস দলবেঁধে করতে হয়, তবে সাংঘাতিক ভারি জিনিস কিছু নয়। সমাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। বাড়ির সামনের আঙিনা পরিষ্কার রাখা, স্কুলের পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ, আর আগে যার উল্লেখ করেছি, লোহার টুকরো ইত্যাদি আহরণের মধ্য দিয়ে সে-দায়িত্বজ্ঞান ক্রমশ বাড়ে। গ্রীষ্মের অবকাশে পাইওনীয়র শিবিরে অনেকে যায়। সেখানকার ব্যবস্থা চমৎকার : খেলাধুলো, গানবাজনা, নাটক আর কাজের অপূর্ব সমন্বয়। সারাদেশ জুড়ে আছে এ-ধরনের শিবির।

বয়স বাড়লে পাইওনীয়র পর্যায় পার হয় ছেলেমেয়েরা। তারপর কমসো-মোল—যুব কম্যুনিস্ট সঙ্ঘ। এদের কাজের পরিধি আরো-অনেক বিস্তৃত, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা নিরন্তর চলে, ঘন ঘন সভা বসে। নির্বাচনের সময় ছাত্রছাত্রী ভোটাররা ঠিকমতো হাজিরা না-হলে অনেকসময় জবাবদিহি তলব করে কমসোমোল। গ্রীষ্মের ছুটিতে দলে দলে তরুণ-তরুণী দেশের নানা নির্মাণক্ষেত্রে বা খেতে-খামারে যায়। কয়েকটি নতুন শহর গঠনে কমসোমোলের অবদান অসামান্য। কমসোমোল নামে তো একটি শহর আছে, এবং এই শহরের পত্তন বিষয়ে অনেক গল্প, উপন্যাস ও কবিতা রচিত হয়েছে।

যদি ভাবেন যে প্রত্যেকটি পাইওনীয়র বা কমসোমোলের সভ্য নিরন্তর দেশ ও দশের চিন্তায় জর্জরিত, তাহলে অবশ্য ভুল করবেন। এমনকী রুশ-দেশেও হাওয়া বদলেছে এবং বদলাচ্ছে। আজকালকার তরুণ-তরুণীরা মনে

হয় আগের চেয়ে বেশি আত্মকেন্দ্রিক। জীবনযাত্রার উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শবাদে ভাটা পড়ে খানিকটা।

আদর্শবাদে কতটা ভাটা পড়বে সেটা ভবিষ্যতের কথা। শাসনযন্ত্র ও সংস্কৃতির কর্ণধাররা সে-বিষয়ে সজাগ। মাঝে-মাঝে ঢিলে দিয়ে তাঁরা আবার ঠিকপথ নির্দেশের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। ঠিকপথটা কী সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকে যায় আজকাল। লোকেরা, বিশেষ করে কমবয়সীরা আগেকার মতো চুপচাপ থাকে না। সম্প্রতি চিত্রকলা ও সাহিত্যে নানা সন্দেহ দেখা দিয়েছে; আলোচনা প্রকাশ্যে চলে। রাস্তায় বা জনসভায় কাব্যপাঠের রেওয়াজ যথেষ্ট বেড়েছে, এবং রুশকবিতা অদেহী নয়, সমসাময়িক নানা সমস্যা —স্বাধীনতার সমস্যা, স্তালিনযুগের দায়ভাগের সমস্যা, ব্যক্তিজীবনের নিতান্ত ব্যক্তিগত নানা সমস্যা—কবিতায় প্রখর ছাপ ফেলে। সে-কবিতার বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, প্রাচীনপন্থীরা হয়ত সরবে ঘোষণা করেন যে এ-ধরনের কবিতার প্রচার বাড়লে দেশের সমূহ সর্বনাশ হবে। নবীনেরা মুখ বুজে থাকেন না।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত অবস্থাটা অনেকটা অন্যরকম ছিল। একথাটা মনে মনে রাখা দরকার যে, খবরের কাগজ রাশিয়ায় জনমতকে যে-পরিমাণে গড়ে তোলে অন্যদেশে ততটা সম্ভব নয়। এবং খবরের কাগজের সাধারণ চরিত্র সোবিয়েত রাশিয়ায় অনেকটা একধাঁচের; নানামুনির নানামতের বাহন সোবিয়েত সংবাদপত্র নয়। ফলে যখন পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলো তখন কোনো কাগজে তাঁর বিষয়ে দ্বিরুক্তির অবকাশ ছিল না। ডঃ জিভাগো রাশিয়ার কোনো ভাষায় ছাপা হয় নি, তার মানে রুশরা এইসব পড়েন নি। কিন্তু কি যৌথখামারে কি কারখানার সান্ধ্য-আসরে গানবাজনা-নাচ শুরু হবার আগে কেউ-না-কেউ দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার শেষের দিকে পাস্তেরনাকের নামোল্লেখ করে একবার নিন্দে করে নিতেন। তরুণ-তরুণীদের জিজ্ঞেস করলে অনেকে স্বীকার করতেন যে ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু প্রকাশ্য-সভায় এ-মতের প্রচার অসম্ভব ছিল। পরে পাস্তেরনাকের মূল্যবিচার হয়েছে নতুন করে, তাঁর অবদান এখন স্বীকৃত। কবি পাস্তেরনাকের অবদান, উপন্যাস-লেখক পাস্তেরনাকের নয়। রাশিয়ার বাইরেও অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি অবশ্য ডঃ জিভাগোর অনুরাগী নয়।

অনেকে বলেন যে যেখানে যৌথ-উদ্যমের দরকার, যেমন সমাজ-সংগঠন, উৎপাদন, কৃষি, ব্যালে, নাটক, সিনেমা, সেখানে সোবিয়েত রাশিয়ার উদ্দাম প্রাণশক্তি সার্থকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি নিজের উদ্যমের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল (বাহ্যত) যেমন চিত্রকলা, সাহিত্য সেখানে গত শতাব্দীর বিরাট রুশ-ঐতিহ্যের তুলনায় আধুনিকরা এখনো পিছিয়ে আছেন। এরেনবুর্গ একবার বলেছিলেন যে উপন্যাসের মালমশলার জন্য সুটকেশ হাতে করে কোনো যৌথখামার বা কারখানায় যাওয়াটাই সব নয়। আরো-কিছুর

দরকার।

এখানে একটা বৃহত্তর প্রশ্ন তোলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যে-কোনো দেশে কালবিশেষে কয়েকটি শাখার উৎকর্ষ ঘটে, জীবনের সব শাখার নয়। একদেশে একযুগে হয়ত সাহিত্য বিরাট একটা স্তরে পৌঁছল, প্রগতির অন্যান্য শাখা হয়ত তত বাড়ল না। বোধ করি সাহিত্য বর্তমানে সভ্যতার প্রকাশমাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো অঙ্গ নয়।

সাদা মাটিতে ফিরে আসা যাক। মস্কোয় ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে প্রথম বাড়িভাড়া কোথায় জমা দেব নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। ব্যাঙ্কে জমা দিতে হলো। দোকান ঘুরে দেখলাম জিনিসের দামের তারতম্য নেই, সব দোকানে সমান। অবশ্য বাজার আছে, সেখানে যৌথখামারিরা তাদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন বেচে। সেখানে দর-কষাকষির সুযোগ আছে। সরকারী দোকানের তুলনায় দর চড়া, কিন্তু জিনিস অনেক টাটকা। ধরুন, ভেড়ার মাংস এককিলো প্রায় বিশ রুবল (প্রায় দশ টাকা, পুরনো হারে)। কিন্তু বছরদুয়েক পরে বেশিরভাগ বাজারে সরকার থেকে ছোটো একটা স্টল খোলা হলো, সেখানে দাম বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে যৌথখামারিরা দাম অনেক কমিয়ে দিল।

খরিদ্দারের তুলনায় উৎপন্ন এখনো কম, তাছাড়া লোকের কেনার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। সেজন্য দোকানে-দোকানে প্রায় সমস্তক্ষণ ভিড় লেগে থাকে।

শুধু দোকানে নয়। ব্যালে, থিয়েটার, সিনেমা সর্বত্র ভিড়। সন্ধেবেলায় মনে করলেন একটা ব্যালে দেখে আসি, সেটা হবার নয়। বেশ-কিছুদিন আগে টিকিট কেটে রাখতে হয়। কপাল ভালো থাকলে 'লিশনি বিলিয়েত'—ফালতু টিকিট হয়ত পাবেন, কিন্তু সে-রকম কপাল কদাচিৎ ঘটে।

পার্কে পার্কে মুক্তাঙ্গন আছে। সেখানে থিয়েটার, গণনৃত্য চলে গ্রীষ্মকালে। পার্কে যাওয়ার একটা বিপদ, রেডিওর গান। চুপচাপ একটা কোণে বসে থাকা মুশকিল। প্রত্যেক অফিস ও কারখানায় প্রায়ই 'দেচের' হয়। 'দেচের'-এর আক্ষরিক মানে সন্ধ্যাবেলা, এক্ষেত্রে সান্ধ্য-সম্মেলন। বক্তৃতা, নানারকমের অনুষ্ঠান, বলরুম-নাচ দেচের-এর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ। একটা ইনস্টিটিউটের এ-রকম একটা দেচের-এ গিয়ে ভারতীয় বলে প্রথম সারিতে জায়গা পেয়েছিলাম। হঠাৎ স্টেজে আবির্ভাব হলো মায়া প্লিসেৎস্কায়ার। নাচলেন The Dying Swan। সে-সন্ধ্যার কথাটা চিরকাল মনে থাকবে।

সাংস্কৃতিক সুযোগের জন্য মোটা টাকা লাগে না। বলশয়, মস্কো আর্ট থিয়েটার ইত্যাদিতে চড়া দামের টিকিট আছে, কিন্তু আগেভাগে কাটলে কম দামের সিট দুর্লভ নয়। তাছাড়া, পয়সা খরচ করার ক্ষমতা দিনে দিনে বাড়ছে। একটা কারণ, বাড়িভাড়া অসম্ভব কম, মাইনের শতকরা পাঁচভাগের বেশি নয়। প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। স্কুল থেকে বেরিয়ে ইনস্টিটিউট (কলেজ) বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে ঢোকার পর প্রত্যেকে বৃত্তি পায়। পাশ করে চাকরির জন্য বিনিদ্র রাতযাপনের দরকার

নেই, কেননা সোবিয়েত সংবিধানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক যুবক বা যুবতীর কর্মাধিকার স্বীকৃত।

আমাদের দেশে অসুখ হলে অনেকসময় দমকা খরচ হয়ে যায়, ধার করে হয়ত ধাক্কা সামলাই। সোবিয়েত রাশিয়ায় চিকিৎসায় খরচ লাগে না, ওষুধের দাম ছাড়া। ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকলে বাড়িতে বিশেষজ্ঞকে ডাকতে পারেন, কিন্তু হাসপাতালে একই বিশেষজ্ঞ দেখাশোনা করেন বলে লোকে সেখানেই যায়। লোকে প্রথমে যায় পলিক্লিনিকে, শহরের প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য পলিক্লিনিক আছে—শিশুদের জন্য আলাদা। পলিক্লিনিক থেকে দরকার হলে রোগীকে হাসপাতালে পাঠায়।

চিকিৎসার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। শীতকালে মস্কোয় পৌঁছবার কয়েকদিন পর বড়ো মেয়ের নিউমোনিয়া হয়, সঙ্গে হাঁপানি। ওষুধ ছাড়া অক্সিজেন-ব্যাগের কথা ডাক্তার বলেন। ভাষা তখন কিছুই বুঝি না, ডাক্তার-খানা থেকে অক্সিজেন-ব্যাগ আনতে অনেক টাকা লাগল। আরো দু-তিনবার আনার পর যখন শেষ ব্যাগ ফেরত দিলাম তখন আগেকার দেওয়া সমস্ত টাকা ফিরে পেলাম! টাকাটা ডিপোজিট। নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় খরচ দশ-রুবলের বেশি হয় নি (অর্থাৎ পাঁচটাকার কম) [য]।

বাড়িভাড়া কম, শিক্ষা ও চিকিৎসার খরচ নেই, সুতরাং মাইনে অপেক্ষাকৃত কম হলেও দুশ্চিন্তা সে-অনুপাতে প্রখর নয়। তাছাড়া এক-একটি সংসার শুধু গৃহকর্তার আয়ের মুখাপেক্ষী নয়; হয়ত স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করেন ও বড়ো ছেলে বা মেয়ে কলেজে বৃত্তি পায়। সব মিলিয়ে চলে যায়; ক্রমশ রেডিও, গ্রামোফোন, এমনকী রেফ্রিজেরেটর কেনার মতো পয়সা জমে। যেটা অস্বস্তিকর সেটা হলো গৃহসমস্যা। এক ফ্ল্যাটে ভাগাভাগি করে থাকার অসুবিধা আছে। কিন্তু কোনো রুশকে জিজ্ঞেস করলে সে আপনাকে হয়ত বলবে, 'আমাদের আগে কিছুই ছিল না। এখন তবু তো বড়ো বড়ো শহরে মাথা গোঁজার জায়গা আছে, আছে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা, সেণ্ট্রাল হিটিং। তাছাড়া যুদ্ধ না-বাধলে বছরকয়েক পর আলাদা ফ্ল্যাট পাব নিশ্চয়ই। বুদিত, বুদিত।' বুদিত কথাটার মানে 'হবে', এবং কথাটি রুশদের খুব প্রিয়।

গৃহ-সংস্থানের ব্যাপারে এ-কথাটির প্রয়োগ প্রায়ই করতেন আমাদের প্রতিবেশী একটি মধ্যবয়সী পাইলট। একটি ঘরে চারজন প্রাণী, স্বামী, স্ত্রী, ইনস্টিটিউটের ছাত্রী তাঁদের বড়ো মেয়ে ও বারো বছরের আর-একটি। পাইলটটি বিমানবিদ্যার বিষয়ে বইটই লিখতেন; কলম চালাতে সময় লাগত বেশ, কাজের পর ফিরে এসে নিরালায় কোনো জায়গা পেতেন না বলে। মাঝে-মাঝে সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করলেও তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে বছর পাঁচেক পরে আলাদা ফ্ল্যাট পাবেন।

ফ্ল্যাটের আরো-দুটি ঘরের একটিতে থাকতেন স্বামী-স্ত্রী (দুজনেই কর্মী) এবং আরেকটিতে স্বামী-স্ত্রী ও দুটি বাচ্চা ছেলে। এদের মধ্যে গুরুতর মনো-

মালিন্য কখনো দেখি নি। শুধু বাচ্চাদুটির বাবা রবিবারে একঘণ্টা ধরে স্নান করতেন বলে অন্যরা হাসাহাসি করতেন, বলতেন 'ঘণ্টাখানেক ধরে স্নান না-করলে ও চুল ঠিকমতো বাঁধতে পারে না।' ভদ্রলোকটি ট্যাঙ্ক-রেজিমেণ্টে কাজ করলেও চুলের পাতা কাটতে বড়ো ভালোবাসতেন।

মস্কোয় 'তাজা হাওয়া'র জন্য সবাই ব্যস্ত। কেন প্রথম প্রথম বুঝতাম না। রাস্তাঘাট চওড়া, পরিষ্কার, ধোঁয়া বা ধুলো নেই, শীতকালে আবহাওয়া তো ক্ষুরধার। পরে মনে হলো একটা ঘরে একটা সংসার থাকলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, লোকে চায় খোলা জায়গায় যেতে। এমনকী প্রচণ্ড শীতেও দেখবেন বাচ্চারা বাড়ির ('দোম', যেখানে কয়েকশো লোক থাকে) অঙ্গনে বরফে লুটো-পুটি খাচ্ছে; কোলের শিশুরা পেরাম্বুলেটরে শুয়ে কিছুক্ষণ হাওয়া খায়। গ্রীষ্মকালে শনিবার রবিবার দলে দলে লোক কাছাকাছি বনজঙ্গলে বেড়াতে যায়; অনেকের 'দাচা' অর্থাৎ কটেজ আছে। 'দাচা' রাষ্ট্রের সম্পত্তি নয়। শীতকালে শিইং ও স্কেটিং।

প্রত্যেক কর্মী মাইনেসমেত বছরে ছুটি পায় দু-তিন সপ্তাহ বা একমাস। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ছুটি কাটাবার বন্দোবস্ত করে নিতে পারেন। নিজেরা বন্দোবস্ত করলে খরচ বেশি। আয় কম হলে অনেকসময় ট্রেড ইউনিয়ন থেকে খরচার অনেকটা পায় লোকে। মাঝে-মাঝে সমস্তটাই দেয় ট্রেড ইউনিয়ন। 'তুরিস্তকায়া পুতিওভকা' বা টুরিস্ট টিকিট কিনে বিশজনের দলে ভিড়ে গেলে ব্যয় অনেক কম। অবশ্য এ-টিকিট থাকলে বড়ো হোটেলে থাকবেন না। পাকাবাড়ি বা তাঁবুতে থাকার বন্দোবস্ত আছে। ট্রেনভাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় পৌঁছবার পর থেকে খাওয়াদাওয়া ঘোরাফেরার জন্য কোনো খরচ লাগে না।

যদি দল বেঁধে ভ্রমণে স্পৃহা না-থাকে তাহলে Rest House-এ থাকতে পারেন। রেস্ট হাউসের সংখ্যা অগুণতি। বিভিন্ন সঙ্ঘের, সাহিত্য, শিল্প বা বিজ্ঞান সঙ্ঘের আবার নিজস্ব রেস্ট হাউস আছে। এমন-একটি বিখ্যাত এলাকার নাম পিরিদেল্‌কিনো। মস্কোর কাছে এই সাহিত্যিক এলাকায় অনেক সাহিত্যিক বাড়ি করেছেন। সরকারী রেস্ট হাউসও আছে। পাস্তেরনাক মারা যান পিরিদেল্‌কিনোয়।

শরীরে কোনো গ্লানি বা ব্যাধি থাকলে স্যানাটোরিয়াম। জারের আমলের অনেক প্রাসাদ এখন স্যানাটোরিয়াম। কৃষ্ণসাগরের কূলে বিখ্যাত শহর সোচিতে এমন অনেক স্যানাটোরিয়াম আছে যেখানে পা দিতে প্রথম প্রথম সংকোচ হয়।

প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষাধিক লোক যায় বাইরে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য। সোবিয়েত সরকার স্যানাটোরিয়াম, রেস্ট হাউস, ক্লিনিক এবং বোর্ডিং হাউসের তত্ত্বাবধানের ভার ছেড়ে দিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়নের হাতে।

সোবিয়েত রাষ্ট্রনেতারা বলেন যত বেশি ব্যাপার জনগণের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় তত ভালো। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার মিলিৎসিয়ার হাতে,

সরকারি মতে মিলিৎসিয়া হলো জনসাধারণ দ্বারা চালিত। এ-ছাড়া ছোটো-খাটো ছিঁচকেমি, পাড়ার বখাটে ছেলেদের ব্যবহার বা বিদেশিমুদ্রা নিয়ে অবৈধ কারবারের মতো গুরুতর ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামানোর জন্য আরো-একটি দল সম্প্রতি গড়ে উঠেছে; নাম দ্রুজনিকি।

লোকের ব্যবহার নিয়ে প্রাচীরপত্রে কার্টুন বেরোয় প্রায়ই। উদ্দেশ্য, জন-মতের চাপে ব্যক্তিবিশেষের বিবেকবোধ জাগানো। বাসে কণ্ডাক্টার নেই, টিকিটের পয়সা একটা বাক্সে ফেলতে হয়। যদি পয়সা না দেন, এবং সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়; তাহলে হয়ত একদিন দেখবেন আপনার একটা ছবি বাসে টাঙানো আছে কিংবা যে-পাড়ায় থাকেন তার প্রাচীরপত্রে।

সাধারণত রুশদেশে লোকজনের ব্যবহার সহজ স্বচ্ছন্দ এবং অতি আন্তরিক। প্রতিদেশের জনগণের প্রতি অনুরাগ সোবিয়েত রাশিয়ার বিশেষত্ব। শৈশব থেকে শেখানো হয় এ-ব্যবহার। কোনো দেশের সরকার হয়ত পুঁজিবাদী ও অত্যাচারী, কিন্তু সে-দেশের সাধারণ মানুষ তো আলাদা—এ-ধারণাটা রুশিদের বদ্ধমূল। এমনকী জার্মানদের প্রতি প্রকাশ্য-বিদ্বেষ কখনো দেখি নি।

উনতিরিশে সিড্‌নি ও বিয়েট্রিস ওয়েব্‌ একটি বৃহদাকার বই লেখেন। নাম 'Soviet Communism : A New Civilisation ?' পরের সংস্করণে প্রশ্ন-চিহ্নটি তাঁরা বাদ দেন। বইটির মালমশলা তাঁরা পান স্তালিনযুগের রাশিয়া থেকে। তারপর অনেক ঘাটে অনেক জল গড়িয়েছে এবং এমন-অনেক তথ্য স্বয়ং ক্রুশ্চভ প্রকাশ করেছেন যা ওয়েব্‌দের (পরে লর্ড এবং লেডি প্যাস্‌ফিল্ড) হাতে পড়লে তাঁরা হয়ত বইটির নামকরণে দ্বিতীয়বার এত নিশ্চয়তা দেখাতেন না।

অতীত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে, নইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতে অনেক গলদ থেকে যাবে। সে-আলোচনা রাশিয়ায় বর্তমানে চলেছে অনেকটা একতরফা ভাবে। নিজেদের বক্তব্য পেশ করার কোনো সুযোগ নেই স্তালিন-পন্থীদের। দু-পক্ষের আলোচনা ও সমালোচনায় ছবিটা পরিষ্কার হতো।

রাশিয়ায় দৃঢ় বিশ্বাস, ও-দেশে নতুন মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এ-কথা সত্যি, বিপ্লবের পর গৃহযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—সমস্ত প্রবল বাধা অতিক্রম করেছে ও-দেশের মানুষ, রাশিয়া পরিণত হয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় শক্তিতে। পুরুষকারের প্রচণ্ড ছাপ রাশিয়ায়। কিন্তু স্তালিনযুগের দায়ভাগ দশবছরে কমিয়ে নতুন মানুষের উদ্ভব কি এত সহজ ?

শারদীয় বেতার জগৎ : ১৯৬৩

পৃ. ১১৮ সমর সেন-সরোজ দত্তর অতি আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে বিতর্কটি কৌতূহলী পাঠকদের জন্য সরোজ দত্তর প্রবন্ধ-সহ সংযোজিত হল শ্রীসুলেখা সেনের সৌজন্যে। 'In Defence of the Decadents'-এর পাঠ 'সংকলিত সমর সেন'-এ মুদ্রিত পাঠ অনুসারে এবং সরোজ দত্ত ও সমর সেনের

'অগ্রণী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধর পাঠ 'অগ্রণী' ও 'সংকলিত সমর সেন' মিলিয়ে বানানের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

৪. IN DEFENCE OF THE 'DECADENTS'

Certain critics point out with a sneer that 'Progress' is a Victorian word. Perhaps they are right : the Victorian belief in progress was based upon security and a rising level of production. Forebodings and uneasy apprehensions shadowed the late-Victorian period, because it was an age of finace unlike the early Victorian age of production. The relation between production and distribution is far less apparent in our age of finance, hence the sense of frustration marking the closing years of the last century. To the sceptical critics of progress it may be pointed out that though the present century has widened the gap between productive forces and social relations and to a certain extent justifies their enlightened scepticism, the latest powers of world production still permit a rational belief in progress. We find that the production power of man has still immense possibilities. So we are still for progress. It is not desirable in our day to reaffirm the medieval conception of human life, to declare that man's fate is inevitably targic and all notions of progress an illusion. To assert this under the painful pressure of circumstances is a subterfuge, a means to to shrink responsibility.

It is rather easy to talk about our belief in progress with reference to past history. But the moment we come to consider the present, to define the meaning of the progressive movement in literature, we seem to be in a melting pot, and confused voices of lamentation, denunciation and warning strike the ear. The modern Bengali poet is between two fires. If he tries to be honest with regard to the vices of his own class and voices his sense of decay, he falls under, and is found guilty of the charges of obscenity and obscurity. The eternal principles of art, he is told, are beauty and truth, truth and beauty, to deny which is bad taste, a perversion. On the other hand he is told from the progressive quarter, which emphasizes his defeatism and obscu-

rity, that he is a decadent and damned petty-bourgeois. The damning is thus complete. He then thinks of perhaps a dozen or so of his admirers and continues to use a medium of expression whose beauties commend themselves only to the dozen or so, with confusing results both for the moralist and the progressive critic. A gentleman, sceptical of the progressive demands on poetry, when politely told that he was a decadent bourgeois retorted : "you can call me a swine if you like, but I am what I am."

It is certainly time to clear up a host of m sunderstandings. A really progressive critic will be a great force today. But a certain notion is gaining ground, fanned by some of the progressives and by the newspapers which have their own sentimental ideas about literature, that to be progressive means to write about mazdoors and kisans in a broad, sentimental vein, to depict all the glories of a possible proletarian revolution and to do all these in a way which would be understood by the man in the street. Away with defeatism and all bourgeois subtleties of expression ! Nothing is more important than direct propaganda. It may be that the results will be slightly disappointing for some time, but all will be will in the future society.

The progressive who proceeds in this manner is not an objective critic. He is a sentimental humanist. We must not forget in our new-born enthusiasm for the cause that literature has a tradition of its own and that there are many invisible gaps between the economic basis and the cultural superstructure. If we consider the changes effected in Bengali poetry in the last fifteen years we must admit that it has definitely 'progressed.' The best of it has almost got clear of that sickening vice bequeathed by the Tagorean tradition—sentimentalism. It has improved and made considerable changes in technique. From a loose and ineffective language to a highly polished and flexible one, from a mere turning loose of emotion to a consciousness of the disruptive forces threatening society,—these are considerable achievements. To sacrifice all these in order to widen the appeal and rouse the people by direct propaganda will be a

dangerous sacrifice. It will mean a swing backward in literary tradition and will revive the sentimental age in a changed garb. Such demands on poetry, backed by the newspapers and the progressives, will have dangerous consequences for the rising generation, which has every chance of being taken in by these easy methods of cheap and quick popularity. The critic who asks for such a literary change in the name of progress, we repeat, is at best a sentimental humanist.

What can be achieved if, in the immediate present, the Bengali poet tries to widen his appeal ? Mass-appeal is indeed a tremendous thing. It can at least help to fill up the empty pockets of the unfortunate writers. But how do the masses come in ? The vast majority of them is illiterate. The reading section consists entirely of the middle-classes. To appeal to them is to pander to the tastes of a demoralised class, to turn poetry into simple wish-fulfilment. Consider the plight of the Indian fflm-industry and the Radio, both of which are middle-class and popular. If the middle-class had any vitality left it would have at least created something significant during and after the Civil Disobedience Movement. But nothing of that kind happened, because at this late hour in history the colonial bourgeoisie has no life at all. With huge and vital sections of our population illiterate and dim in the background, we cannot really hope to effect a revolution with our writings. That would be putting the cart before the horse. We can at present only soliloquise, we cannot address the real audience.

To be really progressive in our time and in our country, where only a fraction is literate, is to preserve the integrity of what is good in our past tradition, to be true to oneself and at the same time to realise that poetry is medium through which the individual tries to adjust his relations to society, to be conscious of the complex forces which are changing our world. To be able to preserve one's personal integrity as a poet will help the progressive cause in the long run. People consider Hopkins and Eliot to be among the real pioneers of modern English poetry. And it will not be superfiuous to remind that Eliot is

often condemned for his obscurity, and is the one poet who is convinced to his bones of the decay of all civilisation. In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and the horror, rather than glory of life, is our immediate reality. Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralised petty-bourgeoisie and lack the vitality of a rising class. It is best to admit this and write about the class you know well than to exult in the future glories of a classless society. Consciouness of decay is also power. We believe that mankind will undergo a far-reaching transformation in a classless society, that only in a changed social order, politically free, and based on emancipation and equality of the peasant and the worker, will it again be possible to establish the vital links between literature and the people which have snapped, but at present we find ourselves unable to translate that belief into good poetry. We cannot do that unless we act. In the meantime we draw a distinction between the poetry of revolntionary struggle and the poetry of revolution as a literary fashion.

Consciousness of decay is certainly a power. But a critical situation arises when we find that at a certain stage this also is not enough even from the point of view of poetic integrity. We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are continue as living writers, This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity. He will be able best to combine literary tradition with social content and will act as a releasing force. He will then perhaps cease to soliloquise and will begin to be representative. Such a reconstruction of living is not an easy job for the present generation of Bengali poets, most of them settled in life and approaching the critical age of thirty. It would have been easier with the Congress out of office, and an active body in the anti-imperialist front. But now the problem is infinitely more complex in an atmosphere thick with sheepish pacifist slogans of truth and non-violence and all the accumu-

lated rubbish of an out-of-date, constitutional nationalism. But no task is too difficult when it is a vital affair. If the modern Bengali writer fails to make this difficult choice, we can take leave of him and ask him not to mourn any longer for the decay of society but rather to mourn for himself.

১৯৩৯ প্রথম প্রকাশ : *New Indian Literature* : ২য় সংকলন

৫

অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা

সরোজকুমার দত্ত

১৯৩৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীসমর সেন আপন আপন সাহিত্য-রচনার বৈপ্লবিকতা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু-র প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা প্রথম বর্ষের 'অগ্রণী' দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি, উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুত সমর সেনের রচনার সমালোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ, প্রথমত ঐ-প্রবন্ধটি (In Defence of the Decadents) নাকি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী উদীয়মান এক লেখক-সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক অভিমত সুসম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ উহা কোনো সুসম্বন্ধ দলবিশেষের সরকারী ইস্তাহারের সামিল এবং দ্বিতীয়ত উহা আলোচ্য কাব্যপুস্তকার [সমর সেনের গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা : প্রকাশক] গ্রন্থকারের আত্মসমর্থন—*In Defence of the Decadents*। সমালোচকের সময়াভাব ও 'অগ্রণী'র স্থানাভাববশত প্রবন্ধটি হইতে বিস্তৃত আক্ষরিক উদ্ধৃতি সম্ভব নহে। সংক্ষেপে উহার মুখ্য বিষয়গুলি এই : (১) ধনতন্ত্রী সমাজে যে-প্রগতি স্তব্ধ হইয়াছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রগতি অব্যাহত চলিবে, অতএব প্রবন্ধকার আশাবাদী ও প্রগতিতে বিশ্বাসী : (২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। নজির ইংরেজ কবি T. S. Eliot এর কাব্য : (৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি : (৪) কিষাণ-মজদুর লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া নাকি তাঁহাদের উত্তেজক সাহিত্যরচনার নির্দেশ অথবা

ফরমাইস দেওয়া হইতেছে এবং ঐ-সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের না থাকায় রোমাণ্টিক হইবার ভয়ে ঐ নির্দেশ বা ফরমাইস তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না।

কবির (১) অভিমত সম্পর্কে কবির সহিত আমাদের কোনো বিরোধ নাই, আমরাও আশাবাদী ও সাম্যবাদী সমাজ ও প্রগতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু (২) অভিমতে কর্মভীরু বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ (আমাদের সমাজ কি সম্পূর্ণরূপে ধনতন্ত্রী?) যে decadent, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের (as they are) সাধনা অসম্ভব, স্বীকার করি। কিন্তু বিগতপ্রাণ সত্যশিবসুন্দরের পুনরুজ্জীবনের (Revival-এর নহে) সাধনাও কি অসম্ভব? এ-সাধনা চক্ষু মুদিয়া, শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া পণ্ডিচেরি-মার্কা সাধনা নহে, কিংবা মাঘোৎসবের সাংবাৎসরিক শান্তিপাঠ ও মানবকল্যাণ কামনাও নহে। এ-সাধনার অর্থ—সংগ্রাম, struggle। সমাজ যেখানে decadent, সামাজিক কোনো আন্দোলনকে সেখানে বিপ্লবীরূপ পরিগ্রহ করিতে হইলে আপনার অঙ্গ হইতে decadence-এর শেষ দাগ পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে, সেইজন্য decadent-সমাজ হইতে উদ্ভূত, সামাজিক বিপ্লবী আন্দোলন communism-এ হতাশা, অবসাদ, আত্মবিলাপ, সাফল্য-স্বপ্নভীরু পরাজিতের ক্লীব-কান্নার স্থান নাই। চিন্তা, কর্ম ও উৎপাদনের উদ্দাম বিশৃঙ্খলার মধ্যে classical শৃঙ্খলাই এই আন্দোলনের উপজীব্য ও justification, decadence-এর অবলুপ্তি প্রচেষ্টাই communism-এর সার্থকতা। বর্তমান decadent যুগের যদি কোনো আন্দোলনে যুগধর্মের অজুহাতে decadence প্রবেশ করে এবং যুগধর্মের দোহাই পাড়িয়া কায়েমি হইয়া বসে, রাষ্ট্রিক হোক, সাহিত্যিক হোক, সে আন্দোলনকে decadent অতএব reactionary বলিবার নিষ্ঠুর কর্তব্যজ্ঞান যেন আমাদের থাকে। কোনো সাহিত্যিক যদি ক্ষয়িষ্ণু গলিত সমাজের উপদংশ ক্ষতগুলিকে যথাসম্ভব যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে, এবং তথাপি উদ্দেশ্যবিহীন হয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে উহা যান্ত্রিক ও জড়ের জঞ্জাল হইতে বাধ্য এবং সাহিত্যিকের পক্ষে উহা এক নিকৃষ্টশ্রেণীর লালসা নিবৃত্তির উপায়ও বটে। উপায় ও ভাবাদর্শই সাহিত্যের অন্তর, ইহাদেরই যুগল নিকষে সাহিত্যের আন্তরিকতার পরীক্ষা হয়। Decadent সমাজের সাহিত্যে decadence আন্তরিকতার লক্ষণ নহে, ইহা কর্মবিমুখতা ও গোপন বিপ্লব-বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। ইহা subiective initiative-এর অস্বীকার এবং আত্মনিষ্ক্রিয়তা সমর্থনকল্পে ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস। ইহা Marxism নহে। বর্তমান জগতে Marxism ভিন্ন অন্য কোনো ভাবাদর্শ যে বৈপ্লবিক নহে এ-কথা আমি বলিতে চাহি না: আমি বলিতে চাহি যে, যাহা Marxism নহে তাহাকে marxism বলার মধ্যে বিপ্লব বা প্রগতির নামগন্ধও নাই। নিজের কাব্যের বৈপ্লবিকতা সপ্রমাণের জন্য শ্রীযুক্ত

সেন ইংরেজ কবি T. S. Eliot-এর নাম করিয়াছেন কিন্তু এ-কথাটি সুকৌশলে চাপিয়া গিয়াছেন যে T. S. Eliot নিজেকে কোনোদিন Marxist বলেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার সাম্যবাদবিরোধিতা যে Roman Catholic Church ও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে বিশ্বাসে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। এ উক্তি তাঁহার সাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। ব্রিটিশ decadence-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা T. S. Eliot নিষ্কলুষ decadence-এর সুদীর্ঘ পদাবলী রচনা করিয়া গেলেন অথচ তিনি Roman Catholic Monarchy-তে বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, সাম্যবাদের শত্রু, চিরজীবন ধরিয়া তিনি decadence নিঙড়াইয়া গেলেন, একফোঁটা বিপ্লব পাওয়া গেল না। শ্রীযুত সেন হয়ত বলিবেন যে তাঁহার সাহিত্যের objective মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন নহেন, প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকের সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু তিনি গলিত ক্ষত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া পাতার পর পাতায় তার বর্ণনা-বিলাস করিলেন, গলিত ক্ষত আর কাহারো দেখিতে না হয় তজ্জন্য যাঁহার কাব্যে কোনো উৎকণ্ঠা বা প্রচেষ্টা দেখা গেল না, বিপ্লবী উৎকণ্ঠা বা বিপ্লবী প্রচেষ্টাহীন এই বিশুদ্ধ cynicism-এর উপর ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ যাঁহারা গড়িতে চাহেন তাঁহারা হয় নির্বোধ, না হয় প্রবঞ্চক। সাম্যবাদীগণ ইলিয়টী সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, Marxist সেন তাহাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'People say'।

ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি নহে, living, passionate ও sensitive মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে, আন্তরিকতার ঝঞ্ঝাঘাতে নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাস সেখানে মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একদা যখন রোমাঁ রোলাঁ গান্ধি-রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী ছিলেন তখনো তাঁহার সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য ছিল, প্রাক্-বলশেভিক গোর্কির সাহিত্যের বৈপ্লবিকতাকে বলশেভিকরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অহিংস টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের প্রশংসোচ্ছ্বাস তো বহুবিদিত। ভাবাদর্শের দিক হইতে দেখিলে D. H. Lawrence-এর সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত কিন্তু ভাবাদর্শ তো এখানে মুখ্য নহে। তাহার ভাববলিষ্ঠ জীবন্ত মন পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে যে রক্তসিক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার বিপ্লবীরূপকে অস্বীকার করিব কোন দুঃসাহসে? অপরপক্ষে অলডাস হাক্স্লির গান্ধিবাদে বিশ্বাস কি আন্তরিক? যিনি জীবনে ভালোমন্দ কিছুতেই কোনোদিন বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহার এই হঠাৎ-বিশ্বাসের পশ্চাতে কি বিরাট ফাঁকি নাই? মন যেখানে জাগ্রত ও জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রবহমান পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ সেখানে আন্তরিকতায় উদ্বেল এবং ক্রমবিবর্তনের বেদনাময় পথে সত্য-উপলব্ধির অভিমুখে গতিমান। এই সত্য-উপলব্ধির পথে পরিবর্তনশীল ভাবাদর্শের প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক বেদনায়,

উৎকণ্ঠায়, আর্তক্রন্দনে নিবিড়। Decadence-এর প্রতিটি বন্ধনরজ্জু ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাহার আর্ট হইতে যন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে। শেষরজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। এই অশান্তি, উদ্বেগ ও আর্তনাদ, মহাভুজঙ্গের নির্মোক-পরিহারের এই প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক—Revolutionary evolution towards a revolutionary ideology। ইহা নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কজীবীর বিলাপ-বিলাস নহে। ইহা decadent সমাজের progressive বুদ্ধিজীবীর প্রাক্-বিপ্লবী জীবনের বৈপ্লবিক পাথেয়। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রোলাঁ, বারবুস্ ও মালরোর শ্রেণীবিচ্যুতির পশ্চাতে এই প্রচণ্ড বেদনার ঐতিহ্য বর্তমান।

শ্রীযুত সেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসী অথচ বিপ্লবী। অতএব, স্বভাবতই আমরা তাঁহার কাব্যে ভাবাদর্শের বেদনাময় পরিণতির একটি পথরেখা আবিষ্কার করিব। কিন্তু কোথায় সে পরিণতি? ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কবি শ্রীযুত সমর সেনের সাম্যবাদী ভাবাদর্শ 'উর্বশীর মতো যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'। কবি ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া কাব্যও ক্ষয়িষ্ণু হইবে, কিন্তু ভাবাদর্শ হইল সমস্ত ক্ষয়, অপচয়ের ঊর্ধ্বে সুগঠিত, সুসম্পূর্ণ, সুসম্বন্ধ সাম্যবাদ। কোকেনের প্যাকেটে ঔষধের লেবেল মারিয়া দিবার মধ্যে যেটুকু বাহাদুরি আছে তাহা শ্রীযুত সেনেরই প্রাপ্য। একটি উদাহরণই দিই :

তবু জানি,—
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে
ততদিন
ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস

'তবু জানি'—কিন্তু তিনি জানিলেন কি উপায়ে? জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে, এ-জ্ঞান তাঁহার কোথা হইতে আসিল? বিপ্লবী-আন্দোলনের ভিত্তিমূল শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো তাঁহার নাই। অভিজ্ঞতার পরিধি তো একদিকে অশিব, অসত্য, অসুন্দর মধ্যবিত্তজীবন ও অন্যদিকে—

আবার নিঃশব্দ হিংস্র প্রান্তরে,
রক্ত-পতাকা আকাশে ওড়ে;

এই পর্যন্ত। তিনি তো Marxist—তিনি তো গান্ধির মতো inner voice কিম্বা সুভাষ বসু-র মতো intuition-এ বিশ্বাস করেন না। এ ভাবাদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও বেদনার সংঘাতে? বর্তমান decadent মধ্যবিত্ত সমাজে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর ভিড়ের মধ্যে Text Book Marxism-এর যে সহজ সিদ্ধির পথ শ্রীযুত সেন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৈষয়িক ধূর্ততার প্রশংসা না-করিয়া আমরা থাকিতে পারি

না। 'রোমাণ্টিসিজম'-ভীরু কবির ভাবাদর্শ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিচ্যুত হইয়া রোমাণ্টিক হইয়া উঠিয়াছে, কবির কি সে খেয়াল নাই।

কিষাণ-মজদুর, লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া উত্তেজক কাব্যরচনার হুকুম কেহ কোনোদিন শ্রীযুত সেনকে দিয়েছেন কিনা জানি না, বোধহয় এ-অভিযোগ শ্রীযুত সেনের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু কেহ যদি বিপ্লবী-কবিযশাকাঙ্ক্ষী কাহাকেও সমাজের অগ্রগামী বিপ্লবীশ্রেণীর জীবন বৈপ্লবিক-ভঙ্গীতে দেখাইবার অনুরোধ করেন, তবে কি তাঁহার অনুরোধ অযৌক্তিক হইবে? শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিম্বা কাব্যে নহে। Revolutionary training এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল। শ্রীযুত সেনের এ ফাঁকিকেও না হয় আমরা ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যে মধ্যবিত্ত জীবনের সহিত তাঁহার জন্মগত ও ঐতিহ্যগত প্রাত্যহিক পরিচয় তাহার গলিত, স্থবির ও নপুংসক রূপটিই তাঁহার চোখে পড়িল, অথচ ইস্পাত-কঠিন যে-অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিম্বা নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে বিপ্লবপ্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে তাহার কঠোর সুন্দর রূপ, তাহার শ্রেণীবিচ্যুতির বেদনা-ইতিহাস, তাহার বুদ্ধিবিদগ্ধ আশাবাদের কোনো আভাস শ্রীযুত সেনের কাব্যে মেলে না। শ্রীযুত সেন যে কাব্য-আন্দোলনের উত্তর-সাধনা করিতেছেন তাহা অতীতে মধ্যবিত্তপরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনকে উপেক্ষা করিয়াছে—অসহযোগ, আইন-অমান্য ও সন্ত্রাস-বাদের সহিত কোনো সম্পর্কই রাখে নাই, তাই আজ সাম্যবাদী আন্দোলনের সহিত তাহার এই ঐতিহ্যহীন একত্ববোধের পশ্চাতে যে বিরাট প্রবঞ্চনা রহিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, এইবার শ্রীযুত সেনের কাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে কিছু বলিয়া উপসংহার করিব। শ্রীযুত সেনের কবিতা সাধারণের বোধগম্য নহে—কেবলমাত্র 'chosen few'-এর উপভোগ্য। আমি যথেচ্ছ দুইটি স্থান উদ্ধার করিতেছি :

আকাশচরের শব্দ আকাশ ভরায়।
নীবিবন্ধে কূটগ্রন্থি,
শিবিরে আর নিবিড় মায়া নেই
তুষার পাহাড়ের শান্তি যদিচ শিশিরে ঝরে।

কিম্বা,

পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো,
ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।

এ-কবিতা 'Intellectual clique'-এর জন্য লেখা, আমার আপনার জন্য নহে। পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি এই সানুনাসিক অবহেলা, আপনার কাব্যকে সর্ব-সাধারণের উপভোগ হইতে বাঁচাইয়া দুর্বোধ্য করিবার এই গলদঘর্ম প্রয়াস, ইহা আর যাহাই হইক, বিপ্লবী মনোভাবের পরিচায়ক নহে। মসীকৌলীন্যের অভিমানে শ্রীযুত সেন আজ আর্টের প্রচাররূপ ও communicativeness-কে পরোক্ষভ বে অস্বীকার করিতেছেন। রচনার আবেদনের পরিধি সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া ক্রমে আত্মতৃপ্তিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এই শব্দবৃত্তিকে কি বিপ্লব-প্রচেষ্টা বলিব? ইহা বিপ্লবের নামে individual anarchy-র চরম অবস্থা মাত্র। সমুদ্রপারে subjective individualism-এর যে ঐতিহাসিক আন্দোলন একদা বিপ্লবরূপে উদ্ভূত হইয়া অবশেষে কালের কংকালপথে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, সাম্যবাদের ছকরূপে ইহা তাহারি অনুকরণহীণ অনুকরণ মাত্র।

কাব্যের বিষয়বস্তু, কাব্যের উৎসমুখ, কাব্যের দায়িত্বের প্রশ্নকে ছাপাইয়া আজ কাব্যের আঙ্গিকের প্রশ্ন বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের তাগিদে বল্কল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, খুশিমতো বল্কল পরিবর্তন করিলে সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পরিবর্তন হইবে ইহা মনে করা বাতুলতা। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও আভ্যন্তরীণ তাগিদেই আঙ্গিকের পরিবর্তন হইবে, ইহার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা নির্বোধ কালক্ষয় নতুবা সংগ্রাম এড়াইবার প্রচেষ্টা। Technique fetishism-এ ইহার অনিবার্য পরিণতি। ঘোড়া আসিলে চাবুকের জন্য ভাবিতে হইবে না। স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য যথাযথভাবে বলিবার সুযোগ মিলিল না, বারান্তরে এ-সম্বন্ধে আরো লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ইতিমধ্যে শুধু এই কথাটি পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি, ইণ্টেলেক্টুয়ালি কুসংসর্গ হইতে সাম্য-বাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।

পাঠকদের সুবিধার্থে সরোজ দত্তর সমালোচনাটি সমর সেনের লেখার পর রীতিভঙ্গ ক'রে বিন্যস্ত হ'ল। প্রথম প্রকাশ: অগ্রণী: ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৪১। প্রকাশক।

৬
অতি-আধুনিক বাংলা কবিতা

উপরোক্ত নামের একটি সমালোচনা 'অগ্রণী'-র এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে, কারণ সমালোচক বিনাকারণে শূন্যে ঘন ঘন ছোবল মেরেছেন, এবং আমার লেখা *In Defence of the Decadents* শীর্ষক যে-প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর আপত্তি, তার সারাংশ দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যের বিকৃতি অনেক জায়গায় করেছেন। *In Defence of*

the Decadents New Indian Literature-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাটি কাছে না থাকায় পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতে হয়েছে, ফলে দু-এক জায়গায় ভাষার অদলবদল থেকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে ভাবের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

হাওয়ার ছোবল মারার কথা এ-ক্ষেত্রে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমালোচকের কী কারণে জানি না দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' কবি বলে প্রচার করি, অথচ আসলে আমি নির্বোধ, কিম্বা প্রবঞ্চক, বিপ্লবী নই; এ নিদারুণ জুয়াচুরির জন্য তিনি মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত বোধ করেছেন। তাঁর এই মূল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করি নি, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধা-বাস্তব, আধা-রোমান্টিক ভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি। 'গ্রহণ'-এর নাম-কবিতায় যে-টাইপের জীবন এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষুশ্রেণীর প্রতীক, সেটা বোঝাবার জন্য একটি লাইনও উদ্ধৃত হয়েছিল: The waking have a common world, but the sleeping turn aside each into a world of his own. যদি লোকমুখে 'অগ্রণী'র সমালোচক 'বিপ্লবী' বিশেষণ আমার সম্বন্ধে শুনে থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমি নিরুপায়। আমার প্রবন্ধটি বাংলা কবিতা এবং সমালোচনার কয়েকটি ধারার বিষয়ে লিখিত, 'আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা···ব্যাখ্যা' করার কোনো উদ্দেশ্য তাতে ছিল না; বাংলা কবিতার আলোচনাকে নিজের কবিতার আচ্ছায় রূপান্তরিত করতে আমি সচেষ্ট হই নি। বরং তাছাড়া উপরোক্ত প্রবন্ধটির যে-ব্যাখ্যা সোজা বাংলায় তিনি করেছেন, তাতে আমার মতো বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর বিস্মিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি নম্বর করে প্রবন্ধটির সারাংশ (!) দিয়েছেন! সে-নম্বরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে প্রবন্ধের কয়েকটি অংশ পড়লে মন্তব্যের প্রয়োজন আশা করি বিশেষ হবে না।

"(২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ-সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।" (অগ্রণী, ২১০ পৃ.)

আমার প্রবন্ধের একটি অংশ: In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most···Perhapes that is because we have our roots deep in the demoralised petty-bourgeoisie and lack the vitality of a rising class."

"(৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি।"

"Consciousness of decadence is certainly a power." (*In 'Defence of the Decadents*) এখানে 'শক্তি'র কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বৈপ্লবিক বিশেষণটি সমালোচক যোগ করেছেন। উপরোক্ত পংক্তিতে সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে: 'Subjective initiative' আধুনিক কবিতায় অত্যন্ত প্রয়োজন সে কথা সমালোচক স্বীকার করেছেন। তাঁর অভিধানে সচেতনতার কি অর্থ সেটা আবার জানা নেই।

আর-একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন: "শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিম্বা কাব্যে নহে। Revolutionary training এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল।" এ প্রসঙ্গের প্রথম বক্তব্য যে, আমার প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতা কি আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে 'বিপ্লবী' বিশেষণ একবারও ব্যবহৃত হয় নি, শুধু বলা হয়েছে যে গত দশবছরের মধ্যে বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উন্নতি এবং বিপ্লব আশা করি এক কথা নয়। তাছাড়া গণ-আন্দোলনে যোগদানের সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধে এই কয়েকটি কথা শেষের দিকে ছিল: "Consciousness of decay is certainly power. But a critical situation arises where we find that at a certain stage this also is not enough……We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire re-construction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity…He who is bent on living in a little cell, all will be dying with a little patience."

[নিম্নরেখ অংশ মুদ্রিত প্রবন্ধে নেই, লেখকের বক্তব্য মনে রেখে অনুমান পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত। প্রকাশক]

এলিয়টের নাম উল্লেখ করে আমি সমালোচকের বিরাগভাজন হয়েছি। তিনি লিখেছেন: 'সাম্যবাদীগণ ইলিয়টী সাহিত্যিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, Marxist সেন তাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'people say'."

আমার প্রবন্ধে এলিয়টকে বিপ্লবী কবি বলা হয় নি, তবে এটা বলা হয়েছে যে আধুনিক প্রগতিক ইংরেজ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। অডেন প্রমুখাদি সাম্যবাদী কবিরা এলিয়টের প্রভাব এবং ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে কখনো কার্পণ্য করেন নি, এবং সাহিত্যে যে-অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এলিয়টী-সাহিত্যের মূল্যবিচার সম্ভব তার উপস্থিতি কডওয়েলের *Illusion and Reality* নামক পুস্তকে আছে। এবং আমার যতদূর জ্ঞান তাতে কডওয়েলকে সাম্যবাদী বলেই জানি। শক্তি থাকলে ধনতন্ত্রের অনেক গলিত

অংশ নিঙড়ে বিপ্লবের ফোঁটা সংগ্রহ করা যে সম্ভব সেটা আমাদের সাম্যবাদী সমালোচক জানেন না কিংবা মানেন না, কিন্তু এলিয়টের 'decadence' নিঙড়ে অনেকফোঁটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন (এ-প্রসঙ্গে Day Lewis-এর *A Hope for Poetry*, Spender-এর *The Destructive Element*, *The Arts To-day*-তে Macniece-এর প্রবন্ধ পঠিতব্য)।

আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু-কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। এর কারণ কি ? কারণ এদের অনেকে মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি এবং বহুমুখী ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন, এবং সত্য শিব সুন্দরের অবাস্তব মায়া কাটিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকাশভঙ্গীতে পরিবর্তন এনেছেন। নিপীড়িতশ্রেণীর আশা-ভরসা, কিম্বা সংগ্রামের সংযম এঁদের লেখায় আজ পর্যন্ত বিশেষ মেলে না, কারণ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে এঁরা সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন (মধ্যবিত্ত সমাজের 'ইস্পাতকঠিন যে-অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিম্বা নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে বিপ্লবপ্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে বা দিতেছে') তাঁরা এখন পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিসেবে নেওয়াই কর্তব্য। নেই মামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়। ভবিষ্যতে ইতিহাস অন্তত কানা-মামা হওয়ার জন্য এঁদের মূল্য দেবে, এবং যদি তাঁরা জীবন ও সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে অক্ষম হন, তাহলে বিদায় দেবে। কিন্তু সে সময় 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিশেষণ বোধহয় সাম্যবাদী সমালোচনা-সাহিত্যের অভিধানে পাওয়া যাবে। বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিষ্ফল আক্রোশ Marxist সমালোচনার নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস, কারণ বাংলাদেশের আজ যে-অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডাব্লকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে গালিগালাজ, যে-উগ্রবামপন্থী আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা পূর্বতন বাঙালী সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।

প্রথম প্রকাশ : অগ্রণী : ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৪০।

৭. সরোজকুমার দত্তর প্রত্যুত্তর

১৯৩৬ সালের এপ্রিল লক্ষ্ণৌ-এ নিখিল ভারত প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটিতে বলা হইয়াছে : 'We consider that collectively and individually we stand in the ranks of those who are striving to build up a new social order···'

উক্ত সঙ্ঘের যে দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই এই অংশের কোনো পরিবর্তন করা হয় না, উপরন্তু মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম্-বিরোধী পূর্বতন চারিটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, সংগ্রামাত্মক প্রস্তাবই গৃহীত হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণার্থ ভারত গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি স্বেচ্ছাচারী দমন আইন প্রণয়ন করিয়া ও অন্যান্য নানাভাবে প্রগতি চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করিতে যে অভিযান চালান, তৎসম্পর্কে প্রথম প্রস্তাবটির শেষাংশে বলা হয়, 'The conference considers these restrictions to be a serious attack on the free cultural development of the country and calls upon all Indian writers to organise countrywide protests against the Govt. policy and to support all other efforts to secure the repeal of these laws.' চতুর্থ প্রস্তাবে বলা হয়, 'This conference considers that it is necessary for free cultural development of the students that they should have freedom to express themselves on all social and political subjects. এই প্রস্তাবটিতেও পরোক্ষভাবে সংগ্রামের সংকল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস হইতে সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার যে সংকল্প এই অধিবেশনে গৃহীত হয় তাহাও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপেই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ, যে দেশে 'huge and vital section of our population illiterate', অর্থাৎ সংস্কৃতি বর্জিত, যে দেশে সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার এই huge and vital section-এর অশিক্ষা অসংস্কৃতির নগ্নরূপ, ইহার ও প্রতিকারের নির্দেশ, 'aesthetic medium' এর সাহায্যে সংগ্রামমূলক মনোভাব লইয়া প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বা মেঘনাদ সাহার গবেষণাবলী এই 'huge ও vital section'-এর আয়ত্তাধীনে আসিবার পথে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া সাহিত্য-সম্ভোগক্ষম পাঠক-সাধারণে রাজনৈতিক চেতনায় ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা।

এই স্বীকৃতি, এই ইস্তাহার ও এই প্রস্তাবাংশসমূহ হইতে আমার ধারণা

হইয়াছিল, প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, কারণ তাহার গৃহীত কার্যসূচী বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত। এই কার্যসূচী উক্ত সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখা কতদূর অনুসরণ করিয়াছে, সে প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভাল। তবে বঙ্গীয় শাখার একজন বিশিষ্ট ও উদ্যোগী সভ্য হিসাবেই শ্রীযুত সেনকে জানি। তাই ভাবিয়াছিলাম কোনো বিপ্লবী সঙ্ঘের সহিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে যিনি সংযুক্ত তিনি নিজেকে বিপ্লবী না বলিলেও বলেন বৈ কি? তাঁহাকে বিপ্লবীমনা ভাবিবার আরও কারণ আছে। প্রবন্ধকাররূপে যখন শ্রীযুত সেনের সাক্ষাৎ পাই, তখন দেখিতে পাই ভাবাদর্শে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ঢং আনিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের ১৩৪৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'বাংলা কবিতা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে লেখকের সাম্যবাদীমন্যতা সম্পর্কে পাঠকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

'পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা, মেনে নেওয়া স্বাধীনতার সূত্রপাত (Freedom is the recognition of necessity)।

'কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থান কাল পাত্রের মুখাপেক্ষী···

'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে কাব্যের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব···

'দাসদেশে বুর্জোয়া (?) সভ্যতার অগ্রগতি অল্পদিন পরেই দমিত হয়, কারণ বর্ধিষ্ণু দাসদেশ বুর্জোয়া প্রভুর স্বার্থবিরোধী।

'রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গী, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ।'

এই সকল বিপ্লবী মূলসূত্রের (Revolutionary principles of criticism) ভিত্তিতে যিনি সমালোচনা-সাহিত্য (Critical Literature) রচনা করেন এবং বলেন, 'জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা বা অন্য লেখায় আমি নিজেকে বিপ্লবী বলে প্রচার করি নি' তাঁহাকে বলিবার আমার কিছুই নাই। In defence of the 'Decadents' প্রবন্ধটির বেলায়ও ঐ কথাই প্রযোজ্য।

তাঁহাকে বিপ্লবীমন্য ভাবিবার তৃতীয় কারণ, 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একাধিকবার তাঁহাকে বিপ্লবী বা সাম্যবাদী বলা হইয়াছে, 'বিপ্লবী অঙ্গীকার সমর সেন ও বিষ্ণু দের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট।'—কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৮৭।

'সাম্যবাদীশিল্প যে নিছক বন্ধ্যাপ্রসূতি নয় তার উদাহরণ তো বিদেশে মাইকেল শোলোকভ, আপটন সিনক্লেয়ার, অডেন, ইশারউড ইত্যাদি। বাংলা কবিতাতেই বা সম্ভব হবে না কেন? সমর সেন বা বিষ্ণু দে তো এ ক্ষেত্রে কয়েক জায়গায় অপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন।'—কবিতা, আষাঢ়, ১৩৪৬, পৃ ৯০।

শ্রীযুত সেন 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের অন্যতম সম্পাদক, প্রত্যেক প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁহার সম্পাদকীয় দায়িত্ব রহিয়াছে।

এই সকল কারণে আমার ধারণা হইয়াছিল শ্রীযুত সেন নিজেকে বিপ্লবী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন, বিপ্লবী তো তিনি ননই, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধাবাস্তব, আধারোমাণ্টিকভাবেই তিনি তার নায়ককে বর্ণনা ও বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য, তাঁহার এই উক্তি যদি সত্য হয় (অর্থাৎ মহাত্মা ব্যক্তির বৈষ্ণব বিনয় না হয়) তবে এই উক্তিটি তাঁহার বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল, বিলম্বে সত্যভাষণ সত্যগোপনের নামান্তর মাত্র।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, 'আধাবাস্তব ও আধারোমাণ্টিক' কথাটি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সাম্প্রতিক আধা-সমাজতন্ত্র আধা-সাম্রাজ্যবাদের মতোই অর্থহীন ও কৌতুকাবহ। 'আধা-বাস্তব আধা-রোমাণ্টিক' না লিখিয়া শুধু রোমাণ্টিক লিখিলে শ্রীযুত সেন মানসিক সততার পরিচয় দিতেন। তৃতীয় বক্তব্য, এই স্বীকৃতি উপযুক্ত সময়ে করিলে আমার পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হইত।

ছোবল হয়ত শূন্যেই মারিয়াছি, কিন্তু বিষ বোধকরি যথাস্থানেই পৌঁছিয়াছে, নচেৎ অবিলম্বে এই তাগা বাঁধিবার প্রয়োজন হইত না। আত্ম-পরিক্রমাপথে 'মুমূর্ষুশ্রেণীর প্রতীকে'র যদি এই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, The waking have a common world but the sleeping turn aside each into his own, অর্থাৎ তিনি যদি নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নজগতের অবাস্তবতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মুমূর্ষুশ্রেণীর হইলেও তাঁহার স্বীয় শ্রেণীর 'প্রতীকত্ব' ঘুচিয়া গিয়াছে, তিনি declassed বা শ্রেণীবিচ্যুত হইয়াছেন, এবং তখনও যদি তাঁহার আত্মপরিক্রমা অবিশ্রাম চলিতে থাকে, তখন তাঁহাকে সুকৌশলী জ্ঞানপাপী ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে? In Defence of the 'Decadents' প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার অভিমতকে খণ্ডনোদ্দেশ্যে শ্রীযুত সেন বলিয়াছেন, 'আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা···ব্যাখ্যা' করার উদ্দেশ্য তাতে ছিল না। প্রবন্ধটির নাম In Defence of the 'Decadents' এবং তাঁহারই স্বীকৃতি অনুসারে তিনি নিজে একজন Decadent (অবশ্য সচেতন) এবং বর্তমান সমাজে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই যে এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রবন্ধকার যদি তাহা অস্বীকার করেন, তবে তিনি সত্যকে অস্বীকার করিবেন। এই সমাজ-বিপ্লবের যুগে (In these times of···wars···and revolutions—In Defence of the 'Decadents') সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বলিতে সমাজবিপ্লবের পরিপোষকতা—অর্থাৎ বৈপ্লবিকতাই বুঝিয়াছি, বোধ হয় ভুল বুঝি নাই। 'There is no middle position between Revolution and Reaction'—T. Cornford

শ্রীযুত সেনের তৃতীয় অভিযোগ, আমি তাঁহার মূল প্রবন্ধটির কয়েকটি অংশের অর্থ বিকৃত করিয়াছি। কি কারণে আমি প্রবন্ধটি হইতে আক্ষরিক উদ্ধৃতি করিতে পারি নাই, আমার সমালোচনায় তাহা পরিষ্কাররূপেই লিখিয়াছি। শ্রীযুত সেন লিখিতেছেন, 'In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and horror, rather than glory of life is our immediate reality. Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralized petty-bourgeoisie and lack the vitality of a rising class. It is best to admit this and write about the class you know well than to exult in the future glorious of a classless society,' (কে তাঁহাকে exult করিতে বলিয়াছে জানি না, তবে এই প্রফেসরীয়, একাডেমিক ও নিতান্ত শিশুসুলভ আশাবাদ তাঁহারই কবিতা পড়িতে গিয়া পাতায় পাতায় চোখে পড়িয়াছে, যথা, 'তবু জানি···আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে···) কারণ consciousness of decay is also a power অবশ্য এ conciousness honest (আন্তরিক) হওয়া চাই (If he tries to be honest ইত্যাদি, ২য় প্যারা In Defence of the 'Decadents'), অর্থাৎ নৈতিক শক্তিহীন পোটিবুর্জোয়া সমাজের প্রাণশক্তিহীন লেখকের রচনায় যদি নিষ্ক্রিয় সচেতনতার (লেখকের শ্রেণীরূপ নিষ্ক্রিয় হইতে বাধ্য) আভাস পাওয়া যায় (এই নিষ্ক্রিয় প্রাণশক্তিহীন ও consciousnesss-সর্বস্ব সাহিত্যকে আমি decadent সাহিত্য বলিয়াছি) তবে তাহা আন্তরিক, কারণ তাহা 'Eternal principles of art, truth and beauty'-তে বিশ্বাস করিয়া মানসিক অসাধুতার পরিচয় দেয় না। এই সচেতনতাই একটি শক্তি।

শ্রীযুত সেনের এই বক্তব্যকেই আমি আমার ভাষায় লিখিয়াছিলাম, 'ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রীসমাজ আজ decadent, অতএব এ সমাজে সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।' সমাজবিপ্লবের যুগে সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে চেতনা যদি শক্ত হয়, তবে সমাজে বা সমাজসাপেক্ষ সাহিত্যে তাহা বৈপ্লবিক শক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহা কি অর্থবিকৃতি? Consciousness of decadence is certainly a power' (In Defence of the 'Decadent's)। আমি ইহার অর্থ করিয়াছি, ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি। শ্রীযুত সেনের আপত্তি 'বৈপ্লবিক' বিশেষণটির ব্যবহারে। এ আপত্তির অযৌক্তিকতা আমি পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। Consciousness ও Subjective Initiative-এর অর্থ এক নহে। নিছক

নিষ্ক্রিয় চেতনার উদ্দেশ্যহীন অভিব্যক্তি ও সক্রিয় চেতনার উৎকণ্ঠা উদ্যম ও কর্মরূপের মধ্যে পরিবর্তন আছে বৈ কি ? কর্মভীরু জ্ঞান ও সজ্ঞান কর্ম এক বস্তু নহে। [নিম্নরেখ লেখকের। প্রকাশক]

শ্রীযুত সেন যখন স্বীকার করিয়াছেন তিনি বিপ্লবী কবি নন তখন তাঁহার পরবর্তী অনুযোগ সম্পর্কে উত্তর প্রদান করিয়া পূর্বতন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না। তিনি বলিতেছেন, 'গত দশবছরের [মধ্যে] বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে' এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতি দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, সারা প্রদেশময় শ্রমিক ও কিষাণ অশান্তি দিনে দিনে সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লবপ্রচেষ্টার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে বেকারের সংখ্যা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে অতিদ্রুত শ্রেণীবিচ্যুতি চলিয়াছে, গভর্ণমেণ্টের দমনমূর্তি রুক্ষ হইতে রুক্ষতর হইয়া উঠিয়াছে, চাষী ও দিনমজুরের দৈনন্দিন খণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক সংগ্রাম সংহত হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিম্নাংশ কিষাণ মজুরশ্রেণীর সহিত স্বার্থকাম্যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এবং রাজনীতি সাধারণের জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। অথচ এই দশ বছরের বাংলা কবিতায় স্থানীয় রাজনীতির ছায়ামাত্র পড়ে নাই, 'Sickening Sentimentalism' বলিয়া ভাবাবেগকে পরিহার করা হইয়াছেএবং সৌখীন সাম্যবাদের বাক্‌বিভূতি দিয়া নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাসের প্রবর্তন করা হইয়াছে। শিক্ষিত সাধারণের নিকট কবিতাকে ক্রমশ দুর্বোধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে, লেখক ও পাঠকের মধ্যেকার স্বাভাবিক ব্যবধানকে অস্বাভাবিক উপায়ে বহুবিস্তৃত করিয়া তোলা হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের কবি সত্যেন্দ্র দত্ত ও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের কবি কাজী নজরুলকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। টেকনিকের বহু পরিবর্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ একই কথা বহুবার বহুভাবে বলা হইয়াছে। গত দশ বছরে যখন মানুষের জীবনে রাজনীতি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের কাব্য হইতে নজরুল-সত্যেন দত্তীয় সামান্য রাজনৈতিক ঐতিহ্যটুকু পর্যন্ত মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, অবশেষে ১৯৪০ সালের মে মাসে সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট প্রগতিক কবি স্বীকার করিলেন, 'আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁরা অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নি, সেটা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন।' এই প্রভাব বিস্তারের একটু নমুনা দিতেছি ; 'The damning is thus complete. He then thinks of perhaps of a dozen or so of his admirers and continues to use a medium of expression whose beauties commend themselves to a dozen or so…' (In Defence of the

'Decadents') প্রভাব বিস্তারের নমুনাই বটে। ভয় হয়, পাছে এই সাংঘাতিক উন্নতি আমাদের কপালে না টেঁকে। বর্তমানে তাঁহাদের সামাজিক চেতনা যথেষ্ট উদগ্র হইয়াছে, সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে অনুভূতি সুতীব্রতম হইয়াছে, সাম্যবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রীত্বগ্রহণ মন্ত্রীত্ববর্জনে তাঁহাদের কাব্যের তুলাদণ্ড উঠানামা করিতেছে (It would have been easier with the congress out of office and an activer body in the anti-imperialist front—Ibid.) তথাপি এখনও রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিফলিত করিবার সময় তাঁহাদের আসে নাই, তবে ভয় নাই বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে, কারণ উপসংহারে শ্রীযুত সেন আমাদের বড় আশার বাণী শুনাইয়াছেন : 'But a critical situation arises when we find that this (consciousness) also is not enough even from the point of view of poetic integrity. We will reach that stage very soon and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity···He will perhaps then cease to soliloquise and will begin to be representative. Such a reconstruction of living is not an ensy job for the persent generation of Bengali poets, most of them settled in life and approaching the critical age of thirty' অর্থৎ এখনও তাঁহারা আলগোছে গণস্পর্শ বাঁচাইয়া, 'dozen or so' হাত ধরাধরি করিয়া কিছুকাল আত্মপরিক্রমায় অতিবাহিত করিবেন, তারপর গণআন্দোলন আরম্ভ হইলে (অর্থৎ এখনও হয় নাই, অতএব তাঁহাদের আপাতত কোনো কর্তব্য নাই) তাঁহারা রাতারাতি স্বগতোক্তি পরিত্যাগ করিয়া গণ-কবি হইয়া বসিবেন। রাতারাতি তখন তাঁহারা জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিবেন, কিন্তু মুস্কিল হইবে সেইসব কবিদের লইয়া যাহাদের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, এবং জীবনযাত্রা একরূপ পাকা হইয়া গিয়াছে। সাংঘাতিক 'প্রবলেম', ভাবিয়া কুলকিনারা পাইতেছি না। দশ বছরের প্রগতির কি এই পরিণাম ? কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন, 'To sacrifice all these in order to widen the appeal and rouse the people by direct propaganda will be a dangerous sacrifice।'

আমি 'গ্রহণ' পুস্তিকার সমালোচনায় বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি সরাসরি প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা গণ-জাগরণ আনয়নের জন্য কেহ তাঁহাকে বলে না, বলিবেও না ; কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের শ্রেণীবিচ্যুত দুর্গতগণের দুর্গতির বাস্তব ইতিহাস রচনা কিংবা শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর বাহিরে শ্রীযুত সেনের নিজের শ্রেণীর যে অংশ নানা কারণে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য aesthetic

medium-এর সাহায্যে 'Literature of exposure' (Lenin) রচনা, তাহাদিগকে গণআন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলা, এক কথায় যে সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের তাঁহারা উত্তরাধিকারী তাহার নিঃস্বার্থ সামাজিক সদ্ব্যবহার—তাঁহাদের আয়ত্তাধীন এইটুকুই যদি তাঁহারা করিতেন তবে নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদিগকে আমরা প্রগতিক ও বিপ্লবী বলিতাম। (আশা করি ইহা অগ্রগামী ব্লক বা তাহার অনুচরী দলের উগ্র বামপন্থী ভাবাদর্শ নহে)। কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন : 'With huge and vital sections of our population illiterate and dim in the background···We can at persent only soliloquise, we cannot address the real audience.' কিন্তু এই 'real audience' (গণ-সাধারণ কিম্বা Dozen or so নহে) address করিবার ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার তাঁহাদের আছে, অভাব subjective initiative-এর। এই অভাবকেই কি বলে 'To preserve one's per·onal integrity ?' ইহাই কি 'in the long run' 'progressive cause'-কে help করিবে ? করে তো ভালোই। শ্রীযুত সেনের সম্প্রদায় গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন তাঁরা এখনও পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করিতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিসাবে নেওয়াই ভালো। 'নেই মামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়' (আমার সমালোচনার উত্তরে শ্রীযুত সেনের উক্তি)। আমার বক্তব্য, কানামামা যখন জানেন তিনি কানা (অর্থাৎ, এ সম্পর্কে তাঁহার consciousness আছে) এবং ছানি কাটানো যখন তাঁহার আয়ত্তাধীন তখন অন্ধ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় বিলাপ-বিলাসে দিন যাপন করা বিপ্লবে বিশ্বাসী কানামামার পরোক্ষে বিপ্লব-বিরোধিতা। অতএব, ছানি না কাটিলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস ইহাকে মূল্য দেওয়া দূরের কথা, সমাজ-বিপ্লবের যুগে Demoralized petty-bourgeoisie-এর এই স্বার্থপর সংক্ষোভের প্রতি হয়ত কোনো মনোযোগই দিবে না। না হয় বড় জোর উহার কাপুরুষ পলায়ন প্রবৃত্তিকে ঘৃণার সহিত অঙ্কিত করিবে। এবং সে সময় 'নির্বোধ','প্রবঞ্চক' ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিশেষণ সাম্যবাদী সাহিত্যের অভিধানে পাওয়া যাইবে সত্য (এখনো যায়) কিন্তু ঐ দুইটি বিশেষণও থাকিবে। যদি সাম্যবাদ-অসহিষ্ণু অথচ honest কোনো বুদ্ধিজীবীর রচনার সমালোচনা আমাকে করিতে হইত, তবে আমাকে আরও objective আরও ব্যাপক ও আরও নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইত, কিন্তু, সাম্যবাদে বিশ্বাসী ও সাম্যবাদী আন্দোলনে সহানুভূতিশীল শ্রীযুত সেনের কাব্যের আলোচনায়, আমি কতকগুলি কাব্যের বিশেষণ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে Marxist সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও নিষ্ফল আক্রোশের অভিযোগ আনিয়া শ্রীযুত সেন ব্যবহারিক সুরুচি ও মানসিক শুচিতার পরিচয় দেন নাই। [নিম্নরেখ লেখকের। প্রকাশক]

গত দশ বছরের বাংলা কবিতায় প্রগতি (?) আলোচনা আমি পূর্বে

করিয়াছি এবং তৎসম্পর্কে 'To be able to preserve one's personal integrity'-র (Ibid) তাৎপর্যও দেখাইয়াছি। এই personol integtity সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্রীযুত সেন আধুনিক ইংরেজী কাব্য হইতে ইলিয়টকে নজীর টানিয়াছেন ও ইলিয়টী কাব্যের দুর্বোধ্যতা ও সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে সুতীব্র চেতনার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গত দশ বছরের বাংলা কাব্যধারার সহিত ইলিয়টের কাব্যধারায় সমান্তরালতা প্রদর্শনের ইঙ্গিত পাঠক-মাত্রের নিকট স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অবশ্য যাঁহারা ভারতীয় বা বঙ্গদেশীয় অবস্থা সম্পর্কে 'বুর্জোয়া যুগ' 'বুর্জোয়া সভ্যতা' 'বুর্জোয়া সমাজ' 'বুর্জোয়া কবি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহার বেশী আশা করাও অন্যায়; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যে বহু কমরেডকে ইতিহাস পাঠের পরিশ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে, একথা একদা ফ্রেডরিশ এঙ্গেল্‌স বহু দুঃখেই বলিয়াছিলেন। আমার বক্তব্য ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ইংল্যাণ্ডে বসিয়া সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্বন্ধে যে মনোভাব বা attitude লইয়া ইলিয়ট কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার surrealism ও anarchist রূপ ব্রিটেনের সমাজবিপ্লবের বিন্দুমাত্র সহায়ক নয়, বরঞ্চ তাহার ফ্যাসিস্ত ভাবাদর্শে পরিণতিই স্বাভাবিক বেশী। পরবর্তী সাম্যবাদী লেখক তাঁহার কাব্যের কতটুকু বৈপ্লবিক সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, স্পেংলার ও হাক্‌স্‌লির লেখা পড়িয়াও অনেক বিপ্লবীর উপকার হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে যে Decadence নিঙড়ায়, তাহার কপালে (অন্যের নয়) যে তাহা হইতে এক ফোঁটা বিপ্লবও জোটে না, বরঞ্চ ভয়াবহ ফ্যাসিস্ত ভাবাদর্শে তাহার পরিণতি হয়, যে বঙ্গীয় কবিগোষ্ঠী ইলিয়টী ঢং-এ কাব্য রচনা করিয়া ভবিষ্যৎ বিপ্লবী কাব্যের ভিৎ রচনা করিতে চাহিতেছেন, একথা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত; তাঁহারা যেন নিজের ভবিষ্যৎ আগে ভাবিতে বসেন। ইংল্যাণ্ডের সামাজিক পরিমণ্ডলীতে ইলিয়টের হয়ত কোনো সামাজিক উপযোগিতা আছে, বাংলাদেশে ইলিয়ট সম্পূর্ণ সমাজসম্পর্কহীন, তাঁহার অবস্থা কলিকাতার ছাদের টবে বিলাতী মৌসুমী ফুলের মতো। কাব্যে ঐতিহ্যবাদী ইলিয়টের সহিত বঙ্গীয় কাব্যের কোনো ঐতিহ্যগত সম্পর্ক নাই। তথাপি যদি ইঁহারা কাব্যে বিপ্লবের হাবিলদার সাজিবার জন্য বাংলাদেশের কাব্যবেদীতে ইলিয়টের প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তাঁহাদের প্রবঞ্চকই বলিব। এই নজীর প্রদর্শনের মধ্যে মমত্ববোধ ও একত্ববোধ যে পুরামাত্রাই রহিয়াছে তাহা যে-কোনো পাঠকের চোখে পড়িবে। কর্নফোর্ড, কডওয়েল ও হেণ্ডারসনের লেখায় কোথায় ইলিয়টকে বিপ্লবী-কাব্যের পুরোধা বলা হইয়াছে, জানাইলে সুখী হইব। কডওয়েলের 'Illusion and Reality' যদি সাম্যবাদী সমালোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড হয়, তবে অডেন, স্পেণ্ডার ও ডেলুইসকে সাম্যবাদী লেখক বলা চলে না,

অতএব উহাদের রচনা বিতর্কের মধ্যে না আনাই ভালো। ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক কাব্যের সমালোচনায় কর্নফোর্ডের কথাটা আবার স্মরণ করি: 'There is no middle position between Revolution and Reaction' এই মূলসূত্রই 'united front' আন্দোলনের ভিত্তি।

উপসংহারে শ্রীযুত সেন বলিয়াছেন, 'বাংলাদেশের আজ যা অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডাব্লকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে গালি-গালাজ, যে উগ্রপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা নানা কারণে অবশ্যম্ভাবী। সেটা পূর্বতন সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।'

কথাটা সাম্যবাদীগণও বলেন, শ্রীযুত সেনও বলেন, আমিও বলি। কিন্তু কথাটির সত্যতা নির্ভর করিতেছে context-এর উপর। কঠোর বিরুদ্ধ-সমালোচনাকারীকে কৌশলে সাম্যবাদ-বিরোধী দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিয়া শ্রীযুত সেন কি ভারতবর্ষের অফিসিয়াল সাম্যবাদের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে চাহেন? কারণ এই অতিসত্য উক্তিটি এত অবান্তর, এত অসঙ্গত ও এত অপ্রত্যাশিত যে ইহাকে অপকৌশলী ডিমাগগী ছাড়া আর কোনো আখ্যা দান সম্ভব নহে।

অগ্রণী, ২য় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, মে ১৯৪০।

বাবু বৃত্তান্ত

এক

ঘৃণ্য শূদ্র যত শতহস্ত দূরে রেখে
গৌরবে পড়েছি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত,
দুর্দান্ত যবনকালে ধরেছি উপনিষদ।
ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এলো ; স্বাগতম্ !
পড়েছে মুসলমান, বন্দেমাতরম্
ধ্বনি ওঠে ঘটিরাম ডিপুটির ঘরে,
যবন দুর্যোগশেষে, আহা মরি, শ্বেতাঙ্গ সকাল !
শতাব্দী কাটেনি হায়, পোড়া এ-কপাল,
ইতিমধ্যে হতবুদ্ধি নিষ্ফল আক্রোশে,
ইতিমধ্যে চোরের উপর নিদারুণ রোষে
পাঁকে ভাত খাই, মাটিতে শয়ন !
গণশক্তি গণযুদ্ধ প্রলাপ বচন
ওসবে দেবে না কান হিন্দুর নন্দন।
পীতশক্তি অনিবার্য শাস্ত্রের বচন।

দুই

বিধবা বধূরা কাঁদে, রাখাল বিলাপে
গুমোট প্রান্তর ভরে, শ্রাবণ সন্ধ্যায়
জ্বররোগ রাজযক্ষা কৃতান্ত দূতেরা
জটলা পাকায় বাটে, বিলোল জিহ্বায়,
স্থূল লালসায়।
আর্যনাসা বারবার কেটে অনার্যের
যাত্রাভঙ্গে সিদ্ধহস্ত হে ধূর্ত নায়ক !
ক্ষান্ত কর ছলাকলা। উৎকণ্ঠিত প্রাণ
উদ্‌ভ্রান্ত হিন্দুস্থান ! জরাতুর স্তব্ধতায়
মহাশূন্য নরক গহ্বরে
গুরুগুরু প্রতিধ্বনি ঘাতক যন্ত্রের !
মনে হয় আমোঘ 'অদৃষ্ট করাঘাত করে দ্বারে,
আশতাব্দী প্রতীক্ষায় ধৈর্যহীন,
ভিক্ষার গ্লানিতে ক্রুদ্ধ রুদ্র মহাদেব !

বিকলাঙ্গ মানসের গলিত প্রলাপ
বন্ধ রাখো। অন্নপূর্ণা পৃথিবী জননী
বাংলার গেরুয়া মাঠে ধূসর পিঙ্গল
কেশ, অনাথিনী বেশ! লম্পট দালাল
জোয়ান-বর্জিত গ্রামে কিষাণ কুটিরে
শিকার সন্ধানে ফেরে, ধূর্ত অবধূত!

পরিবর্ধিত দে'জ তৃতীয় সংস্করণে 'সংযোজন' অংশটিতে সমর সেনের এবং সরোজ দত্তের বিতর্ক ছাড়াও সুধীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-সমালোচনা ও মস্কো সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 'সংযোজন' অংশে স্থান দেওয়ার কারণ বলা আবশ্যক। যেহেতু লেখকের পরিকল্পনায় প্রবন্ধগুলি সংকলিত করবার চিন্তা ছিল না সুতরাং লেখকের প্রয়াণের পর মূল গ্রন্থে প্রকাশকেরও অধিকার নেই প্রবন্ধগুলি বিন্যস্ত করার। প্রকাশক হিসেবে পাঠকদের আগ্রহে 'সংযোজন' অংশে এই সংস্করণ নতুন ভাবে সাজানো হল। 'সংযোজন' অংশটি সংকলনে সাহায্য করেছেন সুবীর ভট্টাচার্য শ্রীসুলেখা সেনের অনুমতি নিয়ে।

সুধাংশুশেখর দে